স্বর্গের চাবি

স্বর্গের চাবি

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী



রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৪৯

পুনর্মুদ্রণ—বৈশাখ ১৩৫৩

মূল্য তিন টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১১.—২৫. ৪. ১৯৪৬

সাতাশ বছর আগে শ্রাবণের এক রাত্রিশেষে হঠাৎ যাকে হারিয়েছি—
সেই আমার শৈশবের সঙ্গী, কৈশোর-যৌবনের অভিন্নহৃদয়
বন্ধু অনুজ **জ্ঞানাঙ্কুরের** স্মরণে আমার জীবনের
এই সামান্য সঞ্চয় উৎসর্গ করলুম।

সূচী

জিজ্ঞাসা করলুম, কদিন হয়েছে?

নলিনী গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে বললে, দিন দুই থেকে ব্যথাটা উঠেছে। আজ একেবারে অসহ্য হওয়ায় তোমায় খবর পাঠিয়েছিলুম। ঘুষঘুষে জ্বরও একটু আছে, গা-বমি-বমিও করছে—সমারোহের কোন ত্রুটিই নেই।

রোগের বিবরণ শুনে দ'মে গেলুম। বছর তিনেক আগে লিভার পেকে একবার সে যায়-যায় হয়েছিল, নেহাত পরমায়ু ছিল ব'লে বেঁচে গিয়েছিল। হতভাগা আবার সেই ব্যামো বাধিয়ে বসল!

চুপ ক'রে আছি দেখে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, কি দাদা, কি রকম বুঝছ?

বললুম, যা বুঝছি সে কথা আর তোমার শুনে কাজ নেই। দেখি পেটটা।

পরীক্ষা ক'রে দেখলুম, লিভারটা বেশ টসটসে হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, আবার শুরু হয়েছে বুঝি?

নলিনী বললে, ওই শুরুই তো করেছি বন্ধু, শেষ করবার আর অবসর পাচ্ছি কই?

পেটটা আর একবার পরীক্ষা ক'রে বললুম, দেখ, আমার মনে হচ্ছে, একবার জুবার্ট সাহেবকে এনে দেখানো উচিত।

নলিনী বললে, যা করবার তাই তুমি কর, ও আর আমি কি বলব?

পরের দিন জুবার্ট সাহেবকে ডেকে আনা হ'ল। তিনি আধ ঘণ্টা পেট পরীক্ষা ক'রে রায় দিলেন, অস্ত্রোপচার অনিবার্য।

সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলুম, রুগীর অবস্থা কি রকম দেখলেন?

তিনি বললেন, বাঁচবার কোন সম্ভাবনাই নেই। অস্ত্র করলে বাঁচলেও বাঁচতে পারে, তবে না বাঁচারই সম্ভাবনা বেশি।

কেস হাতে নিয়ে আমি পড়লুম মহা মুশকিলে। নলিনী আমার বাল্যবন্ধু। কাছাকাছি বাড়ি ব'লে ছেলেবেলা থেকেই তাদের বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা। সংসারে এখন তার কেউ নেই, একমাত্র বড়-মানুষ বিধবা পিসী ছাড়া। ছেলেবেলা মা ম'রে যাওয়ায় এই পিসীর হাতেই সে মানুষ হয়েছে। নলিনীর এই অবস্থার কথা আমি এখন বলি কাকে? পিসীমাকে বললে তো তিনি কেঁদে-কেটে অনর্থ বাধাবেন। অথচ দু-এক দিনের মধ্যে অস্ত্র না করলে তখন অস্ত্র করা আর না-করা সমান হবে।

অনেক ভেবে-চিন্তে সেই দিনই সন্ধ্যেবেলায় পিসীমাকে নলিনীর অবস্থা খুলে বলা গেল।

কান্নাকাটির পালা শেষ ক'রে তিনি আমাকে বললেন, তবে বাবা, তুমি একবার ওর মামাকে খবর দাও। আমি মেয়েমানুষ, আমি আর কি করব? কতদিন ওকে বলেছি, ওই যাচ্ছেতাই জিনিসগুলো খাস নি, এখন দেখ, হতভাগা কি ক'রে বসে!

নলিনীর মামার কথা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম। তাঁর নাম রাধারমণবাবু, তিনি ব্রাহ্ম। শুধু ব্রাহ্ম নন, তিনি অত্যন্ত নীতি-পরায়ণ লোক ছিলেন। ভাগ্নেরা যে মামার পন্থা অনুসরণ করে—নলিনী তার জীবনে এ প্রবাদ-বাক্য প্রতি পদে ব্যর্থ করেছিল।

রাধারমণবাবুকে নলিনীর অবস্থা জানাতে বড় সঙ্কোচ হতে লাগল। কিন্তু তখন আর সঙ্কোচের সময় ছিল না, তাঁকে গিয়ে সব কথা খুলে জানাতে হ'ল।

নলিনীর অবস্থা শুনে রাধারমণবাবু একেবারে চমকে উঠলেন। তাঁর ভাগ্নে যে যাচ্ছেতাই সব জিনিস খায়, আর এমন খায় যে তার ধমকে লিভার পর্যন্ত পেকে ওঠে, এ কথা তিনি বিশ্বাসই করতে

চান না। শেষকালে সমস্ত শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, নলিনীকে তার অবস্থার কথা জানানো হয়েছে ?

আমি বললুম, না, সেটা ঠিক জানানো হয় নি, তবে কাল অস্ত্র হবে, সে কথা সে জানে।

রাধারমণবাবু বললেন, নলিনীকে তার অবস্থাটা জানানো দরকার। কি বল তুমি ?

বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা দরকার বইকি। আজ সন্ধ্যেবেলা আমি তার ওখানে যাব।

রাধারমণবাবু ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তখুনি ভাগ্নেকে দেখতে ছুটলেন। আমি ছুটলুম জুবার্ট সাহেবের কাছে, কালকের ব্যবস্থা করতে।

সন্ধ্যেবেলা নলিনীর ঘরে গিয়ে দেখি যে, ধুনোর ধোঁয়ায় ঘরখানা প্রায় অন্ধকার হয়ে উঠেছে। চারিদিকে ফুলের মালা ঝুলছে, মেঝেতে একখানা কার্পেট পাতা হয়েছে। তার মাঝে একটি জলচৌকি, তার ওপরে খানকতক বই।

নলিনীকে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি হে ? এসব আয়োজন কিসের ?

নলিনী বললে, এসব মামার কাণ্ড। মামা কি ক'রে টের পেয়েছেন যে, অনেক পাপের ফলে আমার এই ব্যারামটি হয়েছে। ওদিকে কাল যে আমার নিশ্চিত অপমৃত্যু হবে, সে সংবাদটিও কে তাঁকে দিয়ে এসেছে। তা মৃত্যুর পরে ভাগ্নের স্বর্গে যাবার পথটা যাতে পরিষ্কার থাকে, তাই আজ স্বর্গের একজিকিউটিভ অফিসারকে একটু ঘুষ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বলতে বলতে পিসীমা এসে উপস্থিত। তিনি ঠাকুরঘর থেকে কি একটা এনে নলিনীর কপালে ছুঁইয়ে দিয়ে চ'লে গেলেন।

নলিনীর ব্যারামের কথা তার জলচর বন্ধুমহলেও রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। দু-চারজন খবর পেয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল। সন্ধ্যার শেষে রাধারমণবাবু তাঁর কয়েকটি ধর্মবন্ধু নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

নলিনী পিঠে একটা মোটা তাকিয়া দিয়ে আধ বসা আধ-শোয়া গোছের হয়ে রইল। একটি গানের পর ব্রহ্মোপাসনা শুরু হ'ল।

একমাত্র ভাগ্নের হঠাৎ এই অবস্থার কথা শুনে রাধারমণবাবু সত্যিই আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি এমন মর্মস্পর্শী প্রার্থনা করলেন যে, প্রার্থনা শেষ হয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ আমরা কোন কথাই বলতে পারলুম না। কিছুক্ষণ এই রকম নিস্তব্ধতায় কাটবার পর নলিনীই বললে, মামা, পিসীমা, বন্ধুবান্ধবেরা—যারা এখানে উপস্থিত আছ, তোমাদের সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

রাধারমণবাবু উৎসুক হয়ে নলিনীর কাছে এগিয়ে এলেন। নলিনী বললে, দেখ মামা, তোমরা যাকে পাপ-কাজ বল, তা আমি অনেক করেছি। তাতে তোমাদের মতে আমার নিজের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু আমি তোমার কখনও কিছু ক্ষতি করেছি? ঠিক বলবে।

রাধারমণবাবু বললেন, এখন আর ওসব কথা কেন?

নলিনী বললে, না না, বল, তোমার কখনও কিছু ক্ষতি করেছি?

না বাবা, আমার কি ক্ষতি তুমি করেছ? কিছুই না।

নলিনী বললে, আচ্ছা, পিসীমা এবার বল। তুমি তো আমায় মানুষ করেছ, তোমার কোন ক্ষতি করেছি কখনও?

পিসীমা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তুমি তো আমার ভাল ছেলে বাবা, শুধু ওই যাচ্ছেতাই গুলো খেয়ে—

পিসীমাকে থামিয়ে দিয়ে নলিনী আমার দিকে ফিরে বললে, যাক, বন্ধুদের প্রতি যদি কোন অন্যায় কখনও ক'রে থাকি, তা হ'লে তোমরা মাপ ক'রো ভাই।'

নলিনী এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করলে যে, উপস্থিত সকলের চোখ ছলছল করতে লাগল। আমি বললুম, নলিনী, এখন কেন ভাই ওসব কথা তুলছ?

রাধারমণবাবুর যে ধর্মবন্ধুটি গান করেছিলেন, তাঁর চোখ দিয়ে টস-টস ক'রে জল পড়তে লাগল।

নলিনী বললে, কথাটা তুলছি, তার কারণ আছে। কাল তো আমার অপারেশন। মৃত্যুর সময় তোমাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, সেই অনুরোধটি তোমাদের রাখতে হবে।

কারুর মুখে কোন কথা নেই, সকলেই জানি যে, তার মৃত্যু অনিবার্য, তবুও মুমূর্ষুর সঙ্গে সে অপ্রীতিকর আলোচনা করতে প্রবৃত্তি কারুরই হচ্ছিল না।

নলিনী বললে, মৃত্যুর পরে আমার দেহটার একটা ব্যবস্থা আমি এখনই ক'রে যেতে চাই।

সঞ্জীব বললে, নলিনী ভাই, মারা যদি যাও, দেহের কি কোন ব্যবস্থা হবে না?

নলিনী বললে, দেহ পুড়িয়ে ফেলবে তো?

সঞ্জীব বললে, তুমিই যদি গেলে, দেহ আর রেখে কি হবে?

নলিনী বললে, না, ওইটিতে আমার আপত্তি আছে।

পিসীমা এতক্ষণ রুদ্ধ-নিশ্বাসে নলিনীর কথা শুনছিলেন। দেহ পোড়াতে আপত্তি আছে শুনে তিনি ব'লে উঠলেন, তবে—তবে তুই খ্রীষ্টান হয়েছিস নাকি?

নলিনী ব'লে উঠল, আঃ পিসীমা, তুমি চুপ কর। আজ বুঝতে পারলুম যে, ভাইপোটিকে তুমি এখনও চিনতে পার নি।

রাধারমণবাবু বললেন, তোমার কি ইচ্ছা প্রকাশ কর, আমরা তাই করব।

নলিনী বললে, আমার মৃত্যুর পর এই দেহটা যেন কোনও তান্ত্রিক শব-সাধকের জিম্মায় দিয়ে আসা হয়।

উপস্থিত সকলে একেবারে স্তম্ভিত। একটি নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত নেই।

সবাইকে সচকিত ক'রে নলিনী আবার শুরু করলে, শব-সাধকেরা শবের বুকের ওপরে ব'সে তার মুখে পাত্রের পর পাত্র কারণ দিয়ে সাধনা করে। আমার দেহ পেলে তার ও আমার উভয়েরই উপকার হবে। আমার মত শব খুব কম সাধকেই পেয়েছে। সাধন-পথে অগ্রসর হবার তার যেমন সুবিধে হবে, তেমনই তার প্রদত্ত কারণবারির গুণে পরকালের পথভ্রান্তি আমার ঘুচে যাবে।

রাধারমণবাবুর একটি ধর্মবন্ধু ব'লে উঠলেন, স্কাউণ্ড্রেল!

কারও মুখে কোনও কথা নেই। মিনিট পাঁচেক নীরবে ব'সে থেকে রাধারমণবাবু একটি অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে উঠে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চ'লে গেলেন। নলিনী চক্ষু বুজে শুয়ে রইল। বন্ধু-বান্ধবেরা একে একে উঠে গেল। শুধু পিসীমা খাটের একটি কোন ধ'রে পাষাণ-প্রতিমার মতন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

যা হোক, পরের দিন দুপুরবেলা নলিনীর অঙ্গে অস্ত্রোপচার হ'ল। সাহেব তার বুক পরীক্ষা ক'রে আমাকে গোপনে জানিয়ে গেলেন, সেই দিনই বিপদ হতে পারে।

কাজেই সন্ধ্যে অবধি তার কাছ থেকে নড়তে পারলুম না। নলিনীর

দুই মামাতো ভাই—স্থরেন আর দ্বিজেন তার সেবা করছিল, তাদের ব'লে এলুম, দরকার মনে হ'লেই আমাকে যেন টেলিফোন করা হয়।

রাত্রে কোন টেলিফোন এল না। সকালবেলা যথাসময়ে তাকে দেখতে গিয়ে দেখি যে, দিব্যি গল্পগুজব করছে। বেশি কথা বলতে বারণ ক'রে এলুম। পরদিন জুবার্ট সাহেব এসে দেখে বললেন, অনেকটা ভাল, তবে এখনও কিছু বলা যায় না।

কিন্তু সবার অনুমান ব্যর্থ ক'রে নলিনী দিন দিন সেরেই উঠতে লাগল। একটুখানি ঘা আর কিছুতেই শুকোয় না, এই রকম একটা সময়ে একদিন সন্ধ্যেবেলা তাদের বাড়িতে ঢুকেই পিসীমার কান্না শুনে চমকে উঠলুম। সন্তর্পণে বাড়ির মধ্যে ঢুকে শুনলুম, পিসীমা চীৎকার ক'রে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছেন আর বলছেন, ওরে, তোর বাপ-মা যে যাবার সময় আমার হাতে তোকে সঁপে দিয়ে গিয়েছিল রে—

ভেতরে ঢুকতে আর পা সরে না। মনে হ'ল, এইখান থেকেই চ'লে যাই। কিন্তু তাও পারলুম না। ধীরে ধীরে ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলুম, পিসীমা!

আমার ডাক কানে যেতেই পিসীমা একেবারে হাউমাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বাইরে এসে বললেন, কে বাবা? শচীন? দেখগে, হতভাগা আবার কি করছে!

কি করছে?

আবার সেই যাচ্ছেতাই জিনিস আনিয়ে গিলছে। বোতল খোলবার ইস্কুরুপটা আমি লুকিয়ে রেখেছিলুম। পোড়ারমুখো স্থরেনকে দিয়ে সেটাকে বার করিয়ে, রক্ষে-কবচের মতন গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে।

কথাটা শুনে নলিনীর ওপর সত্যিই ভারি রাগ হ'ল। মনে হ'ল, এ রকম ক'রে যে আত্মহত্যা করতে চায়, তাকে মরতে দেওয়াই ভাল।

রেগে তার ঘরের মধ্যে ঢুকেই বুঝতে পারলুম, ব্যাপারখানা কি। সুরার সুরভিতে ঘর একেবারে ভরপুর। নলিনীর কাছে গিয়ে বেশ একটু ঝাঁজালো সুরেই বললুম, এই অবস্থায় আবার কোন্ আক্কেলে—

নলিনী একটু হেসে বললে, আসতে না আসতেই পিসীমা কানে তুলেছেন বুঝি?

তারপর আমার মাথাটা টেনে নিয়ে কানে কানে বললে, আমি খাই নি। ওই সুরেন-দ্বিজেনের জন্যে একটু আনিয়েছি। বেচারারা এতদিন ধ'রে আমার সেবা করছে, তাই মর্ত্যেও যে স্বর্গসুখ উপভোগ করা যায়, তারই একটু হাতে-খড়ি ওদের দিয়ে দিলুম। ভবিষ্যতে ওরা বলতে পারবে, একটা লোকের মতন লোকের কাছে হাতে-খড়ি হয়েছিল।

তাই বল।

একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

নলিনী বললে, ডাক্তার, আজ তোমাকেও একটু খেতে হবে ভাই। তুমি তো রোজই সন্ধ্যেবেলায় খাও, আজ না হয় আমার এইখানেই হোক। দ্বিজেন, ডাক্তারকে একটা পাত্র দাও।

দু-একজন ক'রে বন্ধু-বান্ধব এসে জুটতে লাগল। যে আসে, নলিনী তাকেই পাত্র দিতে বলে। এক পাত্র দু পাত্র ক'রে সকলেই গলাধঃকরণ করে। নলিনী বলতে লাগল, তোমরা আমার শুভানুধ্যায়ী, তোমাদের খাওয়ালে আমার আত্মা তৃপ্ত হয়।

দেখতে দেখতে একটা বোতল শেষ হয়ে গেল। আর এক বোতলও প্রায় শেষ, ঘরের মধ্যে বেশ হট্টগোল শুরু হয়েছে, এমন সময় ঝি এসে বললে, ডাক্তারবাবুকে পিসীমা ডাকছেন।

আনন্দের উচ্ছ্বাস এক মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গেল। একজন বন্ধু বিস্মিত হয়ে বললে, পিসীমা ডাকছেন কথার অর্থ কি?

আমার তখন 'ধরণী দ্বিধা হও' অবস্থা। যে কঠিন মন নিয়ে নলিনীর ঘরে এসে ঢুকেছিলুম, উপর্যুপরি তিন-চার পাত্র তরল অনল সে কাঠিন্যকে গলিয়ে একেবারে জলবৎ ক'রে এনেছিল। তখন আমার মনের যা অবস্থা, তাতে নলিনীও যদি এক পাত্র চায় তো খুব জোরে আপত্তি করি না। এই সময়ে পিসীমার আহ্বানকে পরিপূর্ণ আনন্দের মাঝখানে অকস্মাৎ মৃত্যুর আহ্বানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নলিনীর দিকে একবার চেয়ে দেখি যে, সে চক্ষু বুজে নির্বিকার অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে। তাকে ধাক্কা দিয়ে বললুম, ওহে, পিসীমা ডাকছেন যে! দেখ দিকিন, তোমার জন্যে এই বিপদ!

নলিনী সেই রকম চোখ বুজেই বললে, বেশ ক'রে রুমালে খানিকটা ইউক্যালিপ্টাস ঢেলে নিয়ে যাও, বিপদ আবার কিসের?

এক শিশি তেল রুমালে ঢেলে দশ হাত দূর থেকে পিসীমাকে বলা গেল, কিছু ভয় নেই পিসীমা, নলিনী কিছু খায় নি। সে শুধু বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে একটু আনন্দের আয়োজন করেছে।

পিসীমা আমার আপাদমস্তক একবার ভাল ক'রে দেখে বললেন, ওই যাচ্ছেতাইগুলো না খেলে কি আর আনন্দ হয় না?

প্রশ্নটা যে ঠিক কার ওপরে বর্ষিত হ'ল, তা বোধগম্য না হওয়ায় পকেট থেকে রুমালটা বের ক'রে নাকে চেপে ধরলুম।

পিসীমা আবার বললেন, হতভাগার কাছ থেকে সেই বোতল খোলবার ইস্কুরুপটা কেড়ে নিয়েছ?

আমি বললুম, আচ্ছা, আমি সেটা কেড়ে নিয়ে আপনার কাছে দিয়ে যাব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বন্ধুরা আমার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ব'সে ছিল। ঘরে ঢোকামাত্র তারা জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার হে? চ্যাঁচামেচি কি বেশি হচ্ছে?

কারুর প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে নলিনীকে বললুম, নলিনী, তোমার কাছে একটা কর্ক-স্ক্রু আছে, সেটা দাও তো ভাই, পিসীমাকে দিয়ে আসি। ওটা যতক্ষণ তোমার কাছে থাকবে, ততক্ষণ পিসীমার সন্দেহ মিটবে না।

নলিনী বললে, পিসীমার সন্দেহ মেটাবার জন্যে আমি মোটেই ব্যস্ত নই। তুমি একটু ব'স তো। ওহে দ্বিজেন, ডাক্তার-দাকে একটা বড় ক'রে পাত্র দাও।

বলতে না বলতে দ্বিজেন পাত্র এনে হাজির। দেখলুম, রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে সেই কদিনেই নলিনী মামাতো ভাই দুটিকে এমন তালিম দিয়েছে যে, সংসার-মরুপথে জলকষ্ট তাদের কখনও ভোগ করতে হবে না।

পাত্রটি শেষ ক'রে নলিনীকে বললুম, এবার দাও তো কর্ক-স্ক্রুটা, ওটা পিসীমাকে দিয়ে আসি।

নলিনী এবার বললে, মাপ কর দাদা, ওটি আমার স্বপ্নাদ্য জিনিস, ওটি আমি হাতছাড়া করতে পারব না।

সবাই চমকে উঠলুম, সে আবার কি হে?

নলিনী বললে, হ্যাঁ, ওটার সঙ্গে একটা ইতিহাস জড়িত আছে. চুপ ক'রে ব'স, শোন তো বলি।

সবাই নিজের নিজের চেয়ার নলিনীর খাটের চারপাশে নিয়ে গিয়ে তাকে ঘিরে বসা গেল। সে বলতে আরম্ভ করলে—

সেবারে কি একটা কাজে না অকাজে পাঞ্জাবে যেতে হয়েছিল। পাঞ্জাব মানে মীরাট নয়, সেখানকার মাঝামাঝি একটা জায়গায়। বৈশাখ মাস, দারুণ গরম। সে গরম যে কি, তা যারা বৈশাখ মাসে সেখানে না গিয়েছে, তারা বুঝতে পারবে না।

এই ধর, চাল বা চিঁড়ে ভাজতে হ'লে রান্নাঘরে না গিয়ে ছাতে উঠলেই চলে। সেইখানে অভাবনীয়রূপে এক রাজার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। রাজা তো রাজা, একেবারে রাজা। যেমন তার দশাশয়ী চেহারা, ছ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, তেমনই তার চৌগোঁপ্পা গোঁফ-দাড়ি, তেমনই তার দিলদরিয়া মেজাজ। রাজসিক গুণের তার কোন অভাবই নেই, একমাত্র যা অভাব, সেটি হচ্ছে রাজ্যের। কারণ তখনও নাবালক, রাজ্যটি হাতে আসতে তখনও বছর দেড়েক দেরি।

রাজার পিতামহ ছিলেন পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের একজন বড় কর্মচারী। তাঁর অধীনে ছিল মস্ত এক পরগণা। ইংরেজরা যখন রণজিৎ সিংহের রাজ্য আক্রমণ করলে, তখন আমাদের রাজার পিতামহ যুদ্ধের উদ্যোগ না ক'রে হিসেব করতে বসলেন। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, যার অর্থ—মহাজনদের চিন্তার ধারা একই সুরে বাঁধা। আমাদের রাজার পিতামহটিও ছিলেন মহাপুরুষ। তাই তাঁর হিসেবের ফল ও তাঁর প্রভু-মহাপুরুষের হিসেবের ফল একেবারে হুবহু মিলে গেল। অর্থাৎ কিনা, সব লাল হো যায়েগা।

সবই যদি লাল হো যায়েগা, তা হ'লে আর যুদ্ধ ক'রে কি হবে? অতএব তিনি নিজের কেল্লার দরজা খুলে ইংরেজদের নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এলেন। এই বিচার-বুদ্ধিটুকুর অভাব ঘটেছিল ব'লেই রণজিৎ সিংহের বংশধরের আজ কোন উদ্দেশ নেই, আর সেটুকুর অভাব হয় নি ব'লেই তাঁর কর্মচারীর বংশধর সেই দারুণ গ্রীষ্মে আমাদের তৃষিত আত্মায় প্রেমবারি সিঞ্চন ক'রে অক্ষয় স্বর্গের ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

গ্রীষ্ম কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। শেষকালে বিনা আগুনে চাল-ভাজা থেকে যখন মাংস-ভাজাও চলতে পারে এমন অবস্থায় দাঁড়াল,

তখন আমরা একদিন রাজাকে বললুম, এইবার ছুটি দিতে অনুমতি হয়। গরম যদি আরও বাড়ে, তা হ'লে এইখানেই ইহলীলা শেষ করতে হবে।

রাজা বললেন, এই কথা! চল, দিন কয়েক আমরা বাগানে কাটিয়ে আসি। সেখানে গরম ঢের কম।

তখুনি ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেল। শহর ছেড়ে দিন কয়েকের জন্যে যাওয়া হবে বাগান-বাড়িতে। স্থানটি শহর থেকে ষাট-সত্তর মাইল দূরে। সমস্ত দিন ধ'রে মোটর-লরিতে ক'রে ঠাণ্ডা হবার সরঞ্জাম সব সেখানে চালান হতে লাগল। পরদিন বেলা দশটার সময় তিনখানা বড় মোটর বোঝাই হয়ে আমরা রওনা হলুম।

যাত্রী ছিলুম আমরা তিনটি বাঙালী, আর একটি পার্সীর ছেলে, নাম তার জিমি। আসল নাম তার জামসেদজী, সেটি এখন জিমিতে পরিণত হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন দুটি কঙ্কণী ব্রাহ্মণ। তার মধ্যে যোশী দিন পনরো থেকে গরমের ঠেলায় অত্যন্ত কাতর। পেটে যা পড়ে, তাই বমি হয়ে উঠে যায়। মদ্য মাংস সেবন করা তার শাস্ত্রে বারণ, তবে আমাদের পাল্লায় প'ড়ে মাঝে মাঝে সন্ধ্যের সময় এক-আধ বোতল বীয়ার পান করে।

সপ্তম ব্যক্তি হচ্ছেন দেওয়ান স্বরূপ সিং। দেওয়ানজীর একটু ইতিহাস আছে। আমাদের রাজা-সাহেবের পিতামহের মতন তাঁর পিতামহও রণজিৎ সিংহের রাজত্বের এক প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তবে দেওয়ানের পিতামহ হিসাব-পত্রে দেওয়ানের মতন অমন পাকা ছিলেন না। ইংরেজরা তাঁর রাজত্ব আক্রমণ করামাত্র তিনিও 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে আসরে নেমে পড়েছিলেন। তার ফলে দেওয়ানজী এখন ইংরেজ-সরকারের কাছ থেকে মাসিক কয়েক শো টাকা বৃত্তি পান। শহর

গাল হেসে আসরের মধ্যে ব'সেই বললেন, আমি প্রস্তাব করছি, সোডার বদলে বীয়ার দিয়ে একটা বড় পাত্র পান করা যাক।

চারিদিক থেকে সম্মতিসূচক প্রশংসাধ্বনি উঠল, বা জী দেওয়ান, বহুৎখুব।

হুইস্কিতে বীয়ার ঢেলে পাত্র বিতরণ করা হ'ল। আমার পাত্রটায় তখনও একটি চুমুকও দিই নি, এমন সময় জিমি কানে কানে বললে, আমায় একটু বীয়ার দিতে পার?

পাত্রটি তুলে জিমির হাতে দেওয়ামাত্র একটি চুমুকে সে সেটি শেষ ক'রে ফেললে।

দেওয়ানকে গালাগালি দেওয়ার জন্যে রাজার মনে বোধ হয় তখনও অনুতাপ হচ্ছিল। তিনি ব'লে উঠলেন, দেওয়ানকে বোধ হয় তোমরা চেন না। ও রাজার ছেলে, আজ দেখ ওর দুর্দশা!

দেওয়ান বললেন, এক বৃন্তে দুটি ফুল ফোটে, তার একটি হয়তো কোন প্রেমিক যুবক তুলে নিয়ে গিয়ে তার প্রিয়তমাকে উপহার দেয়, অন্যটি আর একজন তুলে নিয়ে গিয়ে কবরের ওপরে ফেলে দিয়ে আসে। মহারাজ, আমরা একই বৃন্তের দুটি ফুল। শুধু স্থান-মাহাত্ম্যে আপনি রাজা, আর আমি— আমি কিছুই না।

রাজা বললেন, সাবাস দেওয়ান, সাবাস! বড় খুশি করেছ। এবার একটু গান হোক।

যোশী ভাল গাইতে পারত। রাজা বললেন, যোশীজী, একটা গান গাও।

যোশীজীর বীয়ারের মাত্রা বোধ হয় একটু বেশি হয়ে পড়েছিল। দেখা গেল যে, সে একটা মোটা তাকিয়া হেলান দিয়ে ব'সে ব'সেই নিদ্রা দিচ্ছে। রাজা বললেন, আহা, ওকে ঘুমোতে দাও। বেচারার শরীরটা খারাপ আছে। জিমি, একটা গান গাও।

হুইস্কি-মেশানো বীয়ারের পাত্র পেটে প'ড়েই জিমির কি রকম একটা হেঁচকি উঠছিল। সে সেই রকম হেঁচকি তুলতে তুলতেই বললে, আমি একটা নাটকের গান জানি।

আমরা বললুম, বহুৎ আচ্ছা, নাটকেরই গান গাও।

জিমি আস্তে আস্তে গান ধরলে—

এ—এ—
ব্যসগম্‌মে পিয়ারী—হেউ—এ—এ—
ব্যসগম্‌মে পিয়ারী—ওয়া—হেউ—

ব্যাপার দেখে দেওয়ান এসে টপ ক'রে জিমির হাত ধ'রে আসর থেকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দূর থেকে ওয়াক, হেউ, ইয়া প্রভৃতি অত্যন্ত শ্রুতিকটু আওয়াজ কানে ভেসে আসত লাগল।

কিছুক্ষণ পরে দেওয়ান ফিরে এসে বললেন, বেচারী একটু ইয়ে হয়ে পড়েছে। ওকে একেবারে শুইয়ে রেখে এলুম।

রাজা বললেন, তোমরা কেউ গাইতে পারলে না তো? আচ্ছা, দেওয়ান, সব ঠিক আছে?

দেওয়ান উত্তর দিলেন, হুজুর, সব ঠিক।

রাজা হুকুম দিলেন, আচ্ছা, নিয়ে এস।

হুকুম পেয়েই দেওয়ান বেরিয়ে গেলেন। দেওয়ান কোথায় গেলেন, কি করতে গেলেন, তাই আন্দাজ করছি, এমন সময় দেওয়ানী-আমের এক দিককার একটা দরজা খুলে গেল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন প্রথমে দেওয়ান ও তাঁর পেছনে গুটি আষ্টেক বিদ্যাধরী। লাল, নীল, গোলাপী, ফিরোজা, ধোপিয়া রঙের চাদর তাদের অঙ্গে, পরনে পা-দেখা-যায়-না এমন ঢোলা রেশমের পাজামা, রঙিন রেশমের হাঁটু-অবধি-ঝোলা পাঞ্জাবি।

হঠাৎ এই দৃশ্য দেখে একেবারে চমকে উঠলুম। আমার মনে হতে লাগল, মেরুর অরোরা যেন নতুন রূপ ধ'রে মরুতে এসে নামল।

রাজা সবার পরিচয় দিলেন—আমিরা, নাদিরা, হাস্‌নু ইত্যাদি।

নাচগান শুরু হ'ল। আকাশে চাঁদের আলো, আশপাশে সৌন্দর্যের বিদ্যুৎ, সাদা পাথরের দেওয়ালে কাচের ফানুসে মোড়া বিজলীর আলো, আর পেটের মধ্যে তরল বিদ্যুৎ। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল একাকার। এই তুরীয় আনন্দে ডুবে আছি, এমন সময় রাজা আমার কানে কানে বললেন, জিমি বেচারাকে ডেকে নিয়ে এস। বীয়ারের নেশা এতক্ষণে নিশ্চয়ই কেটে গিয়েছে।

দেওয়ানী-আমের একতলার একটা খোলা ছাতে জিমিকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। টলতে টলতে সেখানে গিয়ে তাকে ধাক্কা দিতেই কি একটা ব'লে পাশ ফিরলে। তাকে আবার ধাক্কা দিলুম। সে শুয়ে শুয়েই বললে, মাপ কর দাদা।

তার সেই কাতর অনুনয় শুনে আমি সুর ক'রে বললুম—

আমারে ক্ষমিয়ো আমারে ক্ষমিয়ো
আমারে ক্ষমিয়ো করুণানিধি
হরিণীর মত ছুটে চ'লে এনু
শরমের শর মর্মে বিঁধি।

আমার সুর শুনে জিমির বোধ হয় অনুপ্রেরণা এল। সে তারস্বরে চীৎকার ক'রে গান শুরু করলে—

ম্যয় খাটিয়া পর রোতি
কাঁহা গয়ী মেরী মোতি
মোতি বিনা নেই শোতি
হো ব্যসগময়ে—হো ব্যসগময়ে—

বললুম, ওঠ বৎস। দেখবে চল, ওদিকে মোতির বাজার ব'সে গেছে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! জিমি আবার সেই রকম চীৎকার শুরু করলে, ম্যয় খাটিয়া পর রোতি—

শেষকালে সে সত্যিই চীৎকার ক'রে মড়াকান্না জুড়ে দিলে। তার কান্না শুনে রাজা ও তাঁর সঙ্গে আমিরা-নাদিরার দল আসর থেকে সেখানে ছুটে এল। জিমিকে তাদের হাতে সমর্পণ ক'রে আমি ছাতের এক কোণে স'রে গেলুম। সেখানে দাঁড়িয়ে জিমির কেরামতি দেখছি, এমন সময় দেওয়ানজীর গলা কানে যেতেই নীচের দিকে চেয়ে দেখি যে, সেখানে তিন-চারজন মিলে কি একটা গণ্ডগোল করছে। আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, দেওয়ানজী, কি হয়েছে?

আমাকে দেখেই দেওয়ানজী চীৎকার ক'রে বললেন, ভাই-সাহেব, শিগগির নেমে এস, ভয়ানক কাণ্ড বেধেছে।

তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখি, আমাদের গোপালকে দেওয়ানজী জাপটে ধ'রে আছেন, আর একজন পাঠান চাকর লাল সিংকে ধ'রে রয়েছে।

ব্যাপার কি?

দেওয়ানজী বললেন, গোপালবাবু আর এই লাল সিং সবার অগোচরে আসর থেকে উঠে এসে এইখানে ব'সে ছিল। এইখান দিয়ে উমর খাঁ যাচ্ছিল, এরা তাকে ধ'রে বলে যে, ওরা এখান থেকে লাফিয়ে পড়বে আর উমর খাঁকে তাই দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। ভাগ্যিস আমি এসে পড়েছিলুম!

ইচ্ছে হ'ল, গোপালের গালে ঠেসে একটি চড় কষাই। কিন্তু সে ইচ্ছাকে সম্বরণ ক'রে তাকে বললুম, এ কি ছ্যাবলামি হচ্ছে! চল ওখানে।

নেশার চোটে গোপালের কথা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। তবুও সে এড়িয়ে এড়িয়ে বললে, তুমি জান না, আজকাল "কাওয়ার্ড" ব'লে বাঙালীর ভারি একটা দুর্নাম হয়েছে। সেই দুর্নাম ঘুচিয়ে তবে এখান থেকে নড়ব।

তাকে বললুম; রাস্কেল, এই ষাট ফুট ওপর থেকে লাফালে যদি বা কাওয়ার্ড নাম ঘোচে, তবু লোকে বলবে "ফুল"। সেটা কাওয়র্ডের চেয়ে কম দুর্নাম নয়।

গোপাল আবার বললে, তুমি জান না, বাজি হয়েছে যে, লাল সিং আগে লাফাবে।

আমার হাতে গোপালকে জিম্মা ক'রে দিয়ে দেওয়ান ছুটে গিয়ে রাজাকে ডেকে নিয়ে এলেন। তাদের লাফিয়ে পড়ার কথা শুনে রাজা তো একেবারে শিউরে উঠলেন। কয়েক মিনিট চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, ভাই-সাহেব, চল, আমরা বারা-দুয়ারীতে যাই। সেখানে গিয়ে বাচ খেলা যাক।

রাজার কথা শুনে গোপাল তাঁর পিঠ চাপড়ে ব'লে উঠল, বহুৎ আচ্ছা, এই না হ'লে রাজা। চল, এবার ওপরে যাওয়া যাক।

সবাই মিলে ওপরে উঠে আসা গেল। রাজা দেওয়ানকে বললেন, বারা-দুয়ারীতে গিয়ে আটখানা কিস্তিতে বিছানা কর। আমরা ষোলজন যাব, জলদি।

দেওয়ান 'যো হুকুম' ব'লে তখনই ছুটলেন; আমরা আবার দেওয়ানী-আমে এসে বসলুম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব্যসাচী দেওয়ান ফিরে এসে সংবাদ দিলেন, হুজুর, সব তৈরি, দয়া ক'রে উঠলেই হয়।

আটজন পুরুষ ও আটজন বিদ্যাধরী গাড়িতে বোঝাই হয়ে ওঠা

গেল। একটা গাড়ি হুইস্কি ও বরফ বোঝাই হয়ে আমাদের সঙ্গে চলল।

প্রায় চারশো বছর আগে মোগলদের এক শৌখিন রাজপুত্র এখানে তাঁর গ্রীষ্মাবাস তৈরি করিয়েছিলেন। প্রকাণ্ড বাঁধানো দীঘি, এপার ওপার নজর চলে না। এই দীঘির মাঝখানে বারো-দরজার খিলানের উপর এক প্রাসাদ। আমাদের রাজার পিতামহের আমল থেকে এই প্রাসাদ এঁদেরই অধীনে আছে। জায়গাটি দুর্গ থেকে মাইল তিনেক দূরে।

মিনিট পনরোর মধ্যেই আমরা সেই দীঘির ধারে এসে উপস্থিত হলুম। সেখানে অনেকগুলি চওড়া নৌকোতে সাদা ধবধবে বিছানা পাতা হয়েছে। রাজা এক-একটি নৌকোতে একটি ক'রে হুইস্কির পাঁইট, একটি গেলাস, একটি পুরুষ ও একটি মেয়েকে চড়িয়ে ঠেলে এক এক দিকে সরিয়ে দিয়ে, নিজেও একটি নৌকোতে সওয়ার হলেন।

রাজা তাঁর নৌকোতে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে বললেন, ভাই সব, একটু দাঁড় টেনে সব দূরে দূরে চ'লে যাও। যদি দরকার কিছু হয়, তা হ'লে বারা-দুয়ারীর কাছে এসে দেওয়ানকে ডাক দিলেই সাড়া পাবে।

আমার সঙ্গে যে সুন্দরী এসেছিল, সে বললে, চল, আমরা নৌকো ওই পুলের তলা দিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে ওদিকের কিনারায় চ'লে যাই।

নৌকো বেয়ে একেবারে এক কোণের দিকে গিয়ে বিছানায় ঢ'লে পড়া গেল। আমার অবস্থা দেখে সঙ্গিনী বললে, ঘুমুলে নাকি?

না, ঘুমুই নি, নৌকো বেয়ে হাঁপিয়ে পড়েছি। তুমি একটা গান গাও।

সুন্দরী আস্তে আস্তে কি একটা পাঞ্জাবী গান গাইলে, তার একটি কথাও বোধগম্য হ'ল না।

জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার বাড়ি কোথায়?

সে বললে, বাড়ি আমার এই গাঁয়ে, শহরে থাকি।

তা শহর থেকে তোমাদের আগমন হয়েছে বুঝি ?

সে বললে, হ্যাঁ, শহর থেকে রাজা-সাহেব যখন অতিথিদের নিয়ে এখানে আসেন, তখন আমাদের ওপর পরোয়ানা হয়। আমরা বিশ-পঁচিশ ঘর আছি। যাদের ওপর রাজার হুকুম হয়, তাদের আসতে হয়।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমরা কি রাজার চাকর ?

সে বললে, ঠিক চাকর নয়। তবে হ্যাঁ, চাকর বইকি।

সে আবার কি ?

সুন্দরী বললে, এই রাজার বাবা ছিলেন ভারি শৌখিন লোক। তিনি নানা জায়গা থেকে বিশ-পঁচিশ ঘর বাইজী এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। তারা এখনও বিনা খাজনায় জমি ভোগ করে, তার বদলে মাঝে মাঝে আমাদের এখানে এসে রাজা ও তাঁর বন্ধুদের খুশি করতে হয়।

একটু থেমে সে বললে, কেন, এ রকম কি তোমাদের দেশে হয় না ?

আমি বললুম, না সুন্দরী, এ রকম নিয়ম আমাদের দেশে নেই। তবে আমি যদি কখনও জমিদার হই, তা হ'লে নিশ্চয় সেখানে এই নিয়ম করব।

চিত হয়ে বুকে হাত দিয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে ভবিষ্যতে জমিদারি পাবার কোন আশা আছে কি না ভাবছিলুম, হঠাৎ আমার সঙ্গিনী আমার মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে অত্যন্ত মিঠা সুরে বললে, দেখ, একটা কথা বলব, রাগ করবে না ?

কি কথা, বল ?

রাজাকে বলবে না ?

না।

আমার সঙ্গে একটা লোক দেখা করতে আসবে। আমায় যেতে দেবে?

এই রাত-দুপুরে এখানে তোমার সঙ্গে কে দেখা করতে আসবে?

সে বললে, সে একজন। আমি এখানে এসেছি জানতে পেরে সে কেল্লায় খবর পাঠিয়েছিল। আমি তাকে রাত্রে আসতে বলেছিলুম। সে নিশ্চয় কেল্লায় যাবে, সেখান থেকে খবর নিয়ে এখানে আসবে।

বললুম, বেশ তো, তোমার লোক যদি কেউ এখানে আসে তো আমাকে ব'লো। আমি তোমায় ধারে নামিয়ে দেব।

সুন্দরী হঠাৎ খুশি হয়ে আমার ডান হাতখানা তার হাতের মধ্যে নিয়ে আদর করতে শুরু ক'রে দিলে। নেশায় চোখ জুড়ে আসছিল, তার ওপর সুন্দরীর সেই আদরের আবেশে দুই চোখ মুদে এল।

হঠাৎ হাতে একটা ঝাঁকুনি লাগতেই চোখ দুটো একটু ফাঁক ক'রে দেখি যে, সুন্দরী আমার হাতখানা তুলে ধ'রে একদৃষ্টে আংটিটা দেখছে।

আমি বললুম, কি দেখছ?

সুন্দরী জিজ্ঞাসা করলে, এটা কি ফিরোজা?

ফিরোজা ব'লেই তো মনে হয়।

আংটিটা আমায় দিতে হবে।

ব'লেই সে আঙুলটা ধ'রে টানাটানি আরম্ভ ক'রে দিলে।

তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললুম, আংটিটা আমার নয়।

তোমার নয়? তবে কার, তোমার আশনাইয়ের?

চুপ ক'রে আছি দেখে সে ধাক্কা দিয়ে বললে, বল না।

বললুম, আংটিটা আশনাইয়েরই বটে। আজ রাতে তোমার সঙ্গে যেমন আশনাই হয়েছে না? তেমনই বছর পাঁচেক আগে আর এক

রাত্রে আর একজনের সঙ্গে এই রকম আশনাইয়ের ফলে, চাঁদের আলোতে বালির ওপরে প'ড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিলুম। যেখানে ওই ফিরোজার আংটি দেখছ, সেদিন রাতে ওইখানে ছিল একটা হীরের আংটি, সকালবেলা উঠে দেখি, আশনাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে হীরের আংটিটাও অন্তর্ধান হয়েছে। তার বদলে ওইখানে ওই ফিরোজার আংটিটা রয়েছে।

কাহিনীটা শুনে সুন্দরী দস্তুরমতন উৎসাহিত হয়ে উঠল। সে বললে, তবে—আচ্ছা, আমিও আমার হাতের একটা আংটি তোমায় দিচ্ছি।

মনে হতে লাগল, এর চাইতে, এখানে না এসে কেল্লায় দাঁড়িয়ে গোপাল আর লাল সিংয়ের লম্ফক্রীড়া দেখা যে ঢের ভাল ছিল।

সুন্দরী তার গলায় একটুখানি অশ্রুর আমেজ দিয়ে বললে, কোথাকার কে এসে হীরের আংটিটা নিয়ে গেল, আর আমি ফিরোজাটা চাইছি—

যুক্তির মতন যুক্তি বটে। বললুম, সুন্দরী, সেদিন আমার এক পাশে ছিল সমুদ্র; সে তার অবিশ্রান্ত উদাসী ঝঙ্কার তুলে আমাকে ডাকছিল, মাথার ওপরে ছিল সুধা ও কলঙ্কে ভরা অতন্দ্র শশী, আর এক পাশে ছিল তারই মতন সৌন্দর্য সুধা ও কালিমায় ভরা তোমারই মতন আর একজন। আজও মাথার ওপরে সেই চাঁদ, পাশে সেই সুন্দরী, তবে সেদিন সমুদ্রের ধারে প'ড়ে থাকলেও জলে পড়ি নি, আর আজ তো স্বেচ্ছায় এই পারাবারে নৌকো ভাসিয়েছি। নাও সুন্দরী, ফিরোজাটা টেনে নাও, ওটা তোমার জন্যেই এতদিন ছিল, ওটা তোমারই প্রাপ্য।

সুন্দরী ফিরোজাটা খুলে নিয়ে আমার আঙুলে তার একটা আংটি পরিয়ে দিলে। চাঁদের আলোতেও বেশ বুঝতে পারলুম যে, সেটা আনা দুই দামের মুলতানী সাদা পাথরের আংটি।

আংটিটা নিজের আঙুলে প'রে নিয়ে সে বললে, এবার আমাকে কিনারায় নামিয়ে দাও। সে এসেছে ব'লে মনে হচ্ছে।

বিছানার ওপরে উঠে বসলুম। দূরে যেন একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ব'লে মনে হতে লাগল। সুন্দরী সেই দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বললে, ওই দেখ, বেচারা অনেকক্ষণ থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

আস্তে আস্তে নৌকোখানাকে তীরের দিকে বেয়ে নিয়ে চললুম। এবার সে আমার পাশে এসে বললে, আমাকে কি বকশিশ দেবে দাও।

মহা মুশকিলে পড়া গেল। এই শেষরাত্রে জলের ওপরে বকশিশ এখন পাই কোথায়? তাকে বললুম, সঙ্গে তো কিছু আনি নি, কাল দোব।

সে বললে, কাল কি ক'রে হবে? কাল তো তোমরা চ'লে যাবে।

আমি বললুম, পাগল, এখানে অন্তত দশ-পনরো দিন থাকব।

কিন্তু আমি তো কাল চ'লে যাব। কাল আবার নতুন দল আসবে, আমায় যা দেবার এখুনি দাও।

আমি বললুম, এখুনি দিই কোথা থেকে? কাছে যে কিছুই নেই। আচ্ছা, শহরে ফিরে তোমার বাড়িতে গিয়ে একদিন দেখা করব, তখন বকশিশ দোব।

ওরকম সবাই বলে। আমি এখুনি বকশিশ আদায় ক'রে তবে ছাড়ব।

বড় ফ্যাসাদেই পড়লুম দেখছি। যা হোক, আর কথা না বাড়িয়ে নৌকোখানাকে আস্তে আস্তে ধারে নিয়ে যাওয়া গেল। মেয়েটি টপ ক'রে নেমে নৌকোটা ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল। সে যায় না দেখে আমি বললুম, বকশিশ আজ নয়, এখন যাও। ওই দেখ, তোমার সেই লোক এদিকে আসছে।

লোকটা, সত্যিই দেখলুম, দীঘির দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়েটা বললে, ও এদিকে আসছে বকশিশের জন্যে।

কথাটা শুনে চমকে উঠলুম। মনে হ'ল, এই নির্জন জায়গায় কি ধ'রে মারধোর দেবে নাকি? সুপ্ত স্মৃতি থেকে দু-একটা পূর্ব-অভিজ্ঞতার ছবিও চোখের সামনে ছিনিমিনি খেলে গেল। তাড়াতাড়ি ব'লে ফেললুম, দেখ, বেশি চালাকি যদি কর, তা হ'লে এখান থেকে আমি দেওয়ানকে হাঁক দেব। সে এসে ভাল ক'রে বকশিশ দেবে 'খন।

কথাগুলো শুনেই সে নৌকোটা ছেড়ে দিলে। তার পরে মিনিট-খানেক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, আচ্ছা, যাই। কিছু মনে ক'রো না।

যাবার সময় নৌকোখানা জলের মধ্যে ঠেলে দিয়ে ধীরে ধীরে সে মাঠে চ'লে গেল। জ্যোৎস্নায় মাঠ ভেসে যাচ্ছিল, দেখতে দেখতে তার দেহটা চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল।

নৌকোর বিছানায় আবার চিত হয়ে শুয়ে পড়লুম। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। মনে হতে লাগল, আহা, বেচারী বড় ক্ষুণ্ণ হয়ে গেল। ভাবতে লাগলুম, শহরে ফিরে গিয়ে ওকে খুশি ক'রে দোব। কিন্তু তখুনি মনে হ'ল, খুশি করবার মতন আমার কি আছে? যদি আমার রাজার মতন অর্থ থাকত, তা হ'লে নিশ্চয় ওকে খুশি করতে পারতুম। আমি শুনেছিলুম, এককালে আমাদের বিষয়-আশয় যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আমার ঠাকুরদাদা এই ভাবে বিদ্যাধরীদের খুশি ক'রে ক'রে যৌবনেই বিষয়টি ফাঁক ক'রে দিয়ে মারা গিয়েছিলেন। মনে হতে লাগল, ঠাকুরদার সেই বিষয় যদি আজ আমার থাকত! কিন্তু হায়, যা গিয়েছে তা আর কিছুতেই ফিরবে না।

দুঃখে ক্ষোভে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। ঠাকুরদাকে কখনও দেখি নি, কিন্তু তাঁর ওপরে দারুণ অভিমানে বুকের ভেতরটা মোচড় দিতে আরম্ভ করলে।

একমনে ভাবতে ভাবতে, বোধ হয়, ঘুমিয়েই পড়লুম। কতক্ষণ পরে জানি না, কে যেন মধুর কণ্ঠে আমায় ডাকলে, দাদু!

সেই কণ্ঠস্বরে কি মেশানো ছিল জানি না। আমার সমস্ত ক্ষোভ নিমেষে মিটে গেল। দেখলুম, এক গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় পুরুষ আমার পাশে ব'সে বলছেন, বিষয়টি আমি উড়িয়ে দিয়েছি ব'লে দুঃখ হচ্ছে দাদু?

বুঝতে পারলুম, আমার স্বনামধন্য পরলোকগত ঠাকুরদাদা, তাঁর নাতির দুঃখে বিচলিত হয়ে পরলোক থেকে নেমে এসেছেন। মনের মধ্যে আবার অভিমানের মেঘ জমা হয়ে উঠতে আরম্ভ করল। ঠাকুরদা আবার বললেন, কি দাদু, কথা কইবে না?

এবার আমি বললুম, দাদু, বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে গিয়ে তুমি বড় খারাপ কাজ করেছ। দেখ, তোমার নাতির কি দুর্দশা!

ঠাকুরদা বললেন, হিসেবে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল ভাই। আমি ভেবেছিলুম, আমাদের বংশে আমিই বুঝি শেষ মহাপুরুষ। তুমি যে আসছ, সেটা তখন খেয়ালই হয় নি। যাক, দুঃখু ক'রো না, যা গিয়েছে তা তো আর ফিরবে না।

আমি বললুম, দুঃখ তো এতদিন কখনও হয় নি। আজ একটা কারণে মনে বড় আঘাত পেয়েছি। যাকগে, আমার দুঃখের কথা ছেড়ে দাও। তোমাকে কখনও দেখি নি, তোমার কথা বল। কেমন আছ তুমি?

বেশ আছি ভাই।

কোথায় আছ?

স্বর্গে। কেন বল তো?

বললুম, আমার বিশ্বাস ছিল যে, তুমি নরকে গিয়েছ।

ঠাকুরদা বললেন, দাদু, যতদিন পৃথিবীতে ছিলুম, ততদিন নরকে যাবার কল্পনাও কখনও মনে আসে নি। যতদিন বেঁচে ছিলুম, ততদিন সেখানে মনের মত স্বর্গরাজ্য তৈরি ক'রে তার মধ্যে বাস করেছি। মৃত্যুর সময় স্বর্গের কথা ভাবতে ভাবতেই মরেছি, আর মরবার পর সোজা স্বর্গে ই চ'লে গিয়েছি।

ঠাকুরদার কথা শুনে মনে বড় ভয় হ'ল। তাঁকে বললুম, দাদু, ঠিক তোমার মতন না পারলেও, ওরই মধ্যে সাধ্যমত আমিও নিজের একটা স্বর্গরাজ্য তৈরি ক'রে বাস করছি। কিন্তু মনের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, ইহলোকে স্বর্গভোগের মাত্রা যতই বাড়ছে, পরলোকে নরক-ভোগটা ততই কায়েমী হচ্ছে। ঠিক জানি, স্বর্গের দরজার কাছে গিয়ে দেখব, সেখানে চাবি লাগিয়ে প্রহরীরা স'রে পড়েছে। একটা কিছু বিহিত করতে পার দাদু?

দাদু বললেন, এর জন্যে এত ভাবনা? আচ্ছা, মৃত্যুর পর সেখানে গিয়ে স্বর্গের দরজা যদি বন্ধ দেখ তো, এই চাবি তোমায় দিয়ে যাচ্ছি, এইটে দিয়ে সে দরজা খুলে নিও।

হাত বাড়াতেই স্বর্গের চাবিটা আমার হাতে দিয়েই দাদু অদৃশ্য হলেন।

নৌকোর বিছানায় ঘুম ভেঙে যখন উঠে বসলুম, তখন আকাশের চত্বরে উষা ও অরুণের শাশ্বত লুকোচুরি-খেলা সবে আরম্ভ হয়েছে। হাতের মুঠো খুলে দেখি, আমার দাদুর দেওয়া স্বর্গের চাবি—এই কর্ক-স্ক্রুটা রয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নলিনী বললে, এটাকে পিসীমার জিম্মায় দিলে আমার আর কি থাকে ভাই?



পূর্বজন্মের প্রিয়া—

উপরি-উপরি তিন বছরে হাজার পঞ্চাশেক টাকা লোকসান দিয়ে হরিদাস আবার আমাদের আড্ডায় খাতায় নতুন ক'রে নাম লেখালে। বছর দশেক আগে সিন্ধবাদের বণিকপুত্রের মত হঠাৎ একদিন সে ব্যবসা-সমুদ্রে তরণী ভাসিয়ে দিয়েছিল। তারপরে লাভের পণ্য বোঝাই ক'রে ফেরবার মুখে মাঝ-সমুদ্রে নৌকো বানচাল হয়ে প্রায় ডুবুডুবু অবস্থায় বন্দরে ফিরে লক্ষ্মীর পায়ে গড় ক'রে একদিন বেলা দশটার সময় সে আড্ডার দরজায় এসে দেখা দিলে।

আমাদের আড্ডার অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং। কেবল দুটো-তিনটে অত্যন্ত পরিচিত স্থানের গুটিকয়েক লোক স'রে গিয়েছে মাত্র। হরিদাস অদৃশ্য হবার পর আমাদের মধ্যে আরও দু-চারজন লক্ষ্মীর দরজায় কিছুদিন ক'রে ধন্না দিয়েছিল ; কিন্তু দেবীর সেদিকে কোন রকম আকর্ষণ না থাকায়, দিন থাকতে থাকতেই ফিরে এসে, তারা সুবোধ বালকের মতন আড্ডার পরমানন্দে তুরীয়ভাবে জীবনযাপন করছিল।

অনেকদিন পরে হরিদাস ফিরে আসায় আমাদের আড্ডার মধ্যে একটা সাড়া প'ড়ে গেল। আর একটু কারণও ছিল। লাভ-লোকসানের জমা-খরচে তার লাভের অঙ্কটাই ছিল বেশি। অবশ্য অঙ্কটির সঠিক সন্ধান আমরা কেউ জানতুম না ; অঙ্কশাস্ত্রের তিন লাইনের সেই রহস্যময় অক্ষরটার মত সেটাও আমাদের কাছে রহস্যই থেকে গিয়েছিল।

যাক, হরিদাসের সিন্দুকের সন্ধান না পেলেও আমাদের দুঃখ ছিল না। মাথার ওপরকার অসীম নীল রহস্যের কোন সংবাদ না রাখলেও বৃষ্টিধারা দিয়ে সে যেমন ধরণীকে তার পরিচয় দিয়ে যায়, আমাদের দারুণ

াবৃষ্টির সময় হরিদাসের সিন্দুকও মাঝে মাঝে তার পরিচয় দিয়ে যেত। ত আমরা খুশিই ছিলুম।

একদিন বেলা তখন প্রায় তিনটে। আড্ডাধারীরা যে যার আহার্য াহের চেষ্টায় বেরিয়েছে, শুধু আমি আর পঙ্কজ ব'সে আছি। পঙ্কজ র ছ মাস দেশে ছিল। সম্প্রতি ফিরে এসে কাজকর্মের চেষ্টা ছিল। সেদিন দুপুরবেলা তাকে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে গালে ১ দিয়ে ব'সে থাকতে দেখে আমি বললুম, ওহে, অত ভেবো না, ভেবে হবে?

পঙ্কজ বললে, না, ভাবনা কিসের! তবে মনটা বড় খারাপ হয়ে ছে।

হঠাৎ মন-খারাপের কারণ জিজ্ঞাসা করায় পঙ্কজ যা বললে, তার পর্য এই—সম্প্রতি তার বহুকালের পুরাতন পোষ-মানা পত্নীটি কেদিন ধ'রে শাসিয়ে শাসিয়ে কোন রকম অবসর না দিয়ে দেহপিঞ্জর ড় পলায়ন করেছেন। এরই কিছুদিন পরে তিন পুরুষ ধ'রে দুধ-কলা । পোষা একটি বাস্তু সাপ তার একমাত্র ভাইটিকে নিখরচায় খেয়া-রর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, সর্পজাতির এতবড় াসঘাতকতা এমন আকস্মিকভাবে তার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ায় ৷ বেচারী একেবারে মর্মাহত হয়ে পড়েছে। আরও বললে যে, একটিমাত্র পিতৃমাতৃহীন ভাগ্নে, যাকে তার স্ত্রী নিজের ছেলের মতন ন করেছে, সেটিও প্রায় যায়-যায়।

কাহিনী শেষ ক'রে পঙ্কজ বললে, সময়টা একটু খারাপ যাচ্ছে।

আমাদের বিলাসকুমার দিন-কতকের জন্যে সন্ন্যাসী হয়েছিল। সে -টাত শুনতে পারত। পঙ্কজের কথা শুনে আমি তাকে বললুম, মার সময়টা সত্যিই খারাপ যাচ্ছে দেখছি; বিলাসকে একবার

হাতটা দেখিও তো। আর কদিন সময় খারাপ আছে সে ব'লে দিতে পারবে।

পঙ্কজ বললে, বিলাস-দাকে হাত দেখিয়েছিলুম। তার থিওরি হচ্ছে —চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ। অর্থাৎ একটা ক'রে খারাপ সময়ের পরেই একটা সুখের সময় আসে। সে ব'লে দিয়েছে, স্ত্রী ভাই মারা গিয়েছে, এবার ভাগ্নেটা মারা গেলেই তোমার সুখের সদর-রাস্তা একেবারে সাফ হয়ে যাবে, কিছু ভাবনা নেই।

পঙ্কজের মনটা খারাপ আছে দেখে মৃত্যু সম্বন্ধে নানা রকম দার্শনিক তত্ত্ব আওড়াতে শুরু করা গেল। শেষে বললুম, বাড়িতে কেউ মারা যাবার আগে জানতে পারলে প্রস্তুত হয়ে থাকা যায়।

দেখলুম, পঙ্কজ এ বিষয়ে আমার চেয়ে অনেক উঁচুদরের দার্শনিক। সে বললে, হ্যাঁ, তা হ'লে ঘাট-খরচটা যোগাড় ক'রে রাখতে পারা যায়। না হ'লে সে সময় তাড়াতাড়িতে টাকা ধার পাওয়াও মুশকিল।

পঙ্কজ একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, কিন্তু ভাই, আমার এ বিষয়ে অভিযোগ করবার কিছু নেই। আমার স্ত্রী ও ভাই যে মারা যাবে, সে কথা আমি অনেক আগেই জানতে পেরেছিলুম।

ব'সে ব'সে আমার একটু ঘুম ধরেছিল, কিন্তু পঙ্কজের কথা শুনে চটকা ভেঙে গেল। ব'লে উঠলুম, বল কি! স্বপ্নে নাকি?

সে বললে, স্বপ্নে নয়, একজন আমায় গুনে ব'লে দিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, কে বল দিকিন? বিলাস-দা নাকি?

পঙ্কজ বললে, না, বিলাস-দা নয়, তবে তার নাম করলে তুমি তাকে চিনতে পারবে; সে আমাদের মধ্যেই একজন।

পঙ্কজ অবাক করলে! আমাদেরই মধ্যে এতবড় একজন গুণী

আত্মগোপন ক'রে ব'সে আছে, কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস হ'ল না। লোকটির নাম জানবার জন্যে জেদ করতে লাগলুম। শেষে আমার কাছ থেকে নানা রকমের দিব্যি আদায় ক'রে নিয়ে সে বললে, প্রায় মাস ছয়েক আগে হরিদাস তার হাত দেখে সব ব'লে দিয়েছিল।

হরিটা ভেতরে·ভেতরে এতবড় একজন গুণী হয়েছে শুনে বিশ্বাস হ'ল না। পঙ্কজ তার ভবিষ্যদ্বাণীর আরও দুটো চারটে প্রমাণ দিয়ে বললে, হরিদাসকে কিছু ব'লো না দাদা, তা হ'লে সে আমায় খেয়ে ফেলবে।

পঙ্কজের কাছে প্রতিজ্ঞা করলুম, হরিকে কিছু বলব না।

প্রতিজ্ঞা-রক্ষার সনাতন রীতি অনুসারে প্রথম দিন কয়েক চুপচাপ থেকে একদিন নির্জন পেয়ে হরিদাসকে ব'লে ফেললুম, দাদা, আমার অদৃষ্টটা একটু হাতড়ে দেখতে হবে, আর তো পারি না।

মুখের ওপর কপট বিস্ময় এনে সে এমন অজ্ঞতার ভান করলে যে, আমার মনে হ'ল, পঙ্কজ নিশ্চয় আমায় বোকা বানিয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করবার বিদ্যায় পরিপক্ক হ'লেও অভিনয়-বিদ্যায় হরিদাস ছিল অত্যন্ত কাঁচা। একটু চাপাচুপি করতেই তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল। সে কাগজ পেড়ে তাতে রাশিচক্র ফেলে বিচার ক'রে আমায় ব'লে দিলে, সময়টা তোমার এখন ভারি খারাপ। তুলা লগ্নের ওপর শনি ও মঙ্গল এই দুই গ্রহ এখন ঘোড়দৌড়-খেলা খেলছে; মাঝে মাঝে দু-একটা চাট এসে লাগতে পারে। মোটের ওপরে, অবস্থাটি বিশেষ সুবিধের নয়।

অবস্থা কোনও কালে বিশেষ সুবিধের ছিল ব'লে মনে না পড়লেও হরির কথা শুনে সেদিন মনে হয়েছিল, যেন পাহাড়ের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি, সামনে শনি ও মঙ্গল ঘোড়ায় চ'ড়ে ছুটে আসছে, পালাতে

গেলে খাদের মধ্যে পড়তে হবে, আর দাঁড়িয়ে থাকলে মাথার খুলি ছাতু হবে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কি করা যায় বল দিকিন ?

সে বললে, যেমন ক'রে পার হাতে একটা নীলা, গলায় একটা পলা আর ডান পায়ের কড়ে-আঙুলে একটা লোহার আংটি ধারণ কর।

হরিদাসের ব্যবস্থা অনুসারে কয়েকদিন বাদে সেই রত্ন-আভরণে সজ্জিত হয়ে আড্ডায় উপস্থিত হওয়ামাত্র চতুর্দিক থেকে প্রশ্নবৃষ্টি হতে লাগল, ব্যাপার কি ?

অনন্যোপায় হয়ে হরির গুণের কথা সবার সমক্ষে প্রকাশ করতে হ'ল। আমার কথা শুনে ভূপতি বললে, আরে ছি ছি, শেষকালে তোমার এই অবনতি !

কিন্তু ভূপতির অনাস্থা থাকলেও, দেখলুম, আড্ডার আর সকলেই নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ক্রমেই সতর্ক হয়ে উঠতে আরম্ভ করলে। সবার অবস্থা দেখে হরিরও উৎসাহ লেগে গেল। ব্যবসালব্ধ যে কটা টাকা তখনও সিন্দুকে অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়ে মোটা মোটা পুঁথি কেনা হতে লাগল। আড্ডায় দিবারাত্র আর কোনও কথা নেই। কেবল মকর, বৃশ্চিক, কর্কট ইত্যাদি জলে স্থলে যত রকম সাংঘাতিক জীব আছে তাদের নাম আর তারই সঙ্গে বৃহস্পতি, রাহু, মঙ্গল, কেতু, বুধ, সোম, শনি সব গ্রহের ধরন-ধারণ। স্বাতী বা অনুরাধার অমাবস্যার অন্ধকারেও অভিসারে বেরুবার জো নেই, সব আমাদের কাছে ধরা পড়তে হবে। অতবড় বিশাল নভোমণ্ডল একেবারে নখদর্পণে এনে ফেলা গেল।

একে একে আড্ডাধারীদের হাত পা গলা গোমেদ, জামিরা, চুনি প্রভৃতি রত্নে শোভিত হতে লাগল। একদিন ভূপতির পকেট থেকে

মস্ত একটা লোহার পুরনো গঞ্জাল পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল। জেরায় জানা গেল যে, হরি সম্প্রতি একখানা একশো বছরের পুরনো ভাউলে কিনেছে। সে বলে যে, একশো বছরের জোয়ার-ভাঁটা-খাওয়া এই লোহা, জীবন-যাত্রায় পাকা মাঝির কাজ তো করেই, এমন কি মৃত্যুর পর বৈতরণীও বিনা মাশুলে পেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা ক'রে দেয়।

সেদিন সর্ববাদিসম্মতিক্রমে আড্ডা থেকে হরিদাসকে 'লগ্নাচার্য' উপাধি দেওয়া হ'ল।

দিনগুলো নিজেদের মধ্যেই বেশ হুল্লোড়ে কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু সুকার্যের দীপ্তি চাপা কখনও থাকে না। হরির এই অসামান্য গুণের কথা কেমন ক'রে আড্ডার চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল। তারপরে সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর হরির আর বিরাম নেই। দলে দলে লোক দিনরাত তাকে ঘিরে ব'সে আছে। সকলেরই সময়টা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। হরিদাস মহা উৎসাহে মঙ্গলে পলা, শুক্রে হীরা, রাহুতে গোমেদ প্রভৃতি ব্যবস্থা দিতে লাগল। ক্রমে একশো বছরের পুরনো ভাউলের গঞ্জাল পর্যন্তও দুর্লভ হয়ে উঠল।

কিছুদিন যেতে না যেতে আমাদের আড্ডাটি রীতিমত জ্যোতিষের টোল হয়ে দাঁড়াল। কোষ্ঠীবিচারের জন্যে বাইরে থেকে মহা মহা দিগ্গজ পণ্ডিত আমদানি হ'তে লাগল। কেউ মুখ দেখেই ব'লে দেন, এখনও দেরি আছে। কারুকে বা প্রশ্ন করলে একটা নদী কিংবা ফুলের নাম করতে বলেন। কেউ বা প্রশ্ন শুনে নাকের তলায় হাত দিয়ে দেখেন, ইড়া বইছে কি পিঙ্গলা বইছে। সেসব পণ্ডিতদের হাল-চালই আলাদা। কেউ বা ভৃগুর শিষ্য, কেউ বা অষ্টোত্তরী, কেউ বা বিংশোত্তরী। এই নিয়ে দিনরাত তর্ক, ঝগড়া, গোলমাল। পুরাতন আড্ডাধারীরা পালাই পালাই ডাক ছাড়লে।

সেদিন তিথি ছিল অমাবস্যা। দুপুরবেলা আড্ডাঘরে একলা ব'সে আছি। সন্ধ্যেবেলা একটা কোষ্ঠী নিয়ে বিচারসভা বসবার কথা আছে, এমন সময় আমাদের নন্দনন্দন জ্যোতিষার্ণব মশায় এসে উপস্থিত হ'ল। এ পণ্ডিতটি আমাদের আড্ডায় নবাগত। সে ভৃগুসংহিতা অনুসারে বিচার করে। সেদিন তাকে একলা পেয়ে খোলসাভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা পণ্ডিতজী, সত্যি ক'রে বল তো, আমার আর কত দেরি আছে?

পণ্ডিত কৌটো থেকে এক টিপ নস্যি নাকে টেনে নিয়ে বললে, দেরি আছে। আপনি পূর্বজন্মে একটি মহাপাপ করেছিলেন, এ জন্মে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।

কি পাপ করেছিলুম দাদা?

পুনরায় আর এক টিপ নস্য গ্রহণ, তৎপরে কিছুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন ক'রে পণ্ডিত বললে, গত জন্মে আপনার যখন নব্বই বৎসর বয়স, সেই সময় একটি এক বৎসরের ব্রাহ্মণকন্যার পাণিপীড়ন করেছিলেন। এই বিবাহের কয়েক মাস পরেই আপনার মৃত্যু হয়। কন্যাটির এই বৈধব্যের কারণ আপনি। সেই পাপের এখন প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।

পণ্ডিতেরা প্রায়ই এই ধরনের কথাবার্তা বলতেন বটে, কিন্তু সেগুলো আমার মোটেই হজম হ'ত না। আমি স্পষ্টই ব'লে ফেললুম, ওসব কথায় আমার বিশ্বাস হয় না। যদি—

পণ্ডিত ইতিমধ্যে আর এক টিপ নস্যি নাকের মধ্যে গুঁজে দিয়েছিল। আমার বক্তব্যটা শেষ করতে না দিয়েই সে নস্যির মতন গর্জন ক'রে বললে, কি! ভৃগুর কথা অবিশ্বাস! আপনার পত্নী এখনও জীবিত। তাঁর বয়স এই আপনার চাইতে বছর দুয়েকের বেশি হবে।

অবস্থা-বিপর্যয়ে যদিও বড় বড় রুই কাতলা ময়দার টোপও গিলে থাকে, তবুও পূর্বজন্মের প্রিয়ার এই টোপটা আমি গিলেও গিলতে পারলুম না, বেধে গেল।

কথাটা তেমন আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ না করায় পণ্ডিতজী বললে, কি, তোমার বিশ্বাস হ'ল না বুঝি?

অতি বিনীতভাবেই বললুম, এতবড় একটা সংবাদ সাদা চোখে কি ক'রে বিশ্বাস করি দাদা?

পণ্ডিত উত্তেজিত হয়ে বললে, ভৃগুর গণনা কখনও মিথ্যে হবে না। আমি বলছি, তিনি এখনও জীবিত আছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় আছেন?

পণ্ডিত বললে, তা বলতে পারি না, সেটা গুনে দেখতে হবে। তবে এটা বলতে পারি যে, তিনি এখনও জীবিত এবং বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী।

পণ্ডিত অনেককাল জ্যোতিষশাস্ত্র নাড়াচাড়া করছে, মানবচরিত্র তার নখদর্পণে। এই শেষ চালটিতে সে আমায় একেবারে মাত করলে। কিন্তু সেদিন তার সঙ্গে এই কথা নিয়ে আর আলোচনা হ'ল না। লোকজন এসে পড়ায় অন্য কথা শুরু হ'ল।

তারপরে তিন দিন ধ'রে শয়নে স্বপনে আমার পূর্বজন্মের প্রথম প্রিয়ার চিন্তা আমায় একেবারে পাগল ক'রে তুলল। ঘুমের ঘোরে সে আমার কানে কানে এসে বলে, আর কত ঘুমুবে? আমি যে আর থাকতে পারি না, এবার আমার যাবার সময় হ'ল।

স্বপ্নে দেখি, আমি যেন আমার পূর্বজন্মের প্রিয়ার সন্ধানে বেরিয়েছি। খুঁজতে খুঁজতে চ'লে গেছি ভারতের অন্য এক প্রান্তে। প্রিয়ার সঙ্গে দেখা হ'ল। আমার প্রাসাদের সোপানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমি

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর রূপরাশি দেখছি। শিপ্রা নদীর জল-কল্লোল বাতাসে ভেসে আমার কানে এসে লাগছে, তার মধ্যে কত শত বিস্মৃত কাহিনীর ইতিহাস। প্রিয়ার হাতে বিজয়মালা, মরণযজ্ঞের অগ্নিপরীক্ষা পার হয়ে এসে আমি তার সম্মুখে জানু পেতে বসেছি। প্রিয়া হাসিমুখে আমার গলায় জয়মালা পরিয়ে দিলেন। হঠাৎ আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে জ্যোতিষার্ণবের হাঁচি আমার স্বপ্নের জাল ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে চ'লে যায়। ক্ষোভে বুক ফেটে দীর্ঘনিশ্বাস বইতে থাকে।

একদিন নন্দনন্দনকে চেপে ধরলুম, দাদা, আমার প্রথম প্রিয়ার ঠিকানাটা শুনে ব'লে দাও, মনটা বড় উচাটন হয়েছে।

পণ্ডিত কোন জবাব দিলে না, চুপ ক'রে রইল। আমি আবার বললুম, সে ধনী, তার অর্থে আমারও অধিকার আছে। পূর্বজন্মের হ'লেও সে তো আমারই অর্থ।

পণ্ডিত এবার নাকে নস্যি ঠেসে বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়ই। তোমার পরধনপ্রাপ্তি যোগ আছে। তার ওপরে তোমার কেন্দ্রে বৃহস্পতি, তোমার টাকা মারে কে?

ব'লেই সে শ্লোক আওড়ালে—

কিং কুর্বন্তি গ্রহাসর্বে কেন্দ্রী যত্র বৃহস্পতি
মত্ত কুঞ্জর নাশয়েৎ কেশরী যথা—

বাস্! ধনপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সংস্কৃত সাক্ষী রয়েছে দেখে আমার যেটুকু সন্দেহ ছিল, তা চ'লে গেল। পণ্ডিতকে বললুম, ঠিকানাটা দাও দাদা, তোমার দুঃসময়ে আমি এ উপকারের কথা ভুলব না।

পণ্ডিত একটু গম্ভীরভাবে থেকে বললে, ঠিকানা জানতে হ'লে এখন কুলকুণ্ডলিনী যাগ করতে হবে। কিছু খরচ আছে।

কত খরচ?

পণ্ডিত ভেবে-চিন্তে বললে, পঞ্চাশটি টাকার কম হবে না।

ধনপ্রাপ্তির আগেই এতখানি ধনক্ষয়ের চিন্তা আমার উৎসাহকে কটু খর্ব ক'রে দিলে। কিন্তু আশাই শেষকালে জয়লাভ করলে। ঞ্চাশটি টাকা যোগাড় ক'রে পণ্ডিতকে দিয়ে বললুম, যা থাকে কপালে, াগাও তুমি কুলকুণ্ডলিনী।

যজ্ঞের কথা যাতে গোপন থাকে, সে বিষয়ে পণ্ডিতকে প্রস্তাব রতেই বুঝতে পারলুম যে, এ সম্বন্ধে আমার চাইতে তার আগ্রহ নেক বেশি।

। হোক, অমাবস্যা দেখে যাগ হ'ল। যজ্ঞক্ষেত্রে আমায় যেতে হয় ।, পণ্ডিত নিজের দেশেই যজ্ঞ করতে লাগল। তার আশাপথ চেয়ে 'সে থাকা ছাড়া এ যজ্ঞে আমার আর অন্য কাজ রইল না।

দিন দুয়েক পরে নন্দনন্দন ফিরে এসে বললে, বাস্, সব ঠিক। ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে, আর কোন চিন্তা নেই।

আগ্রহে আমার তালু শুকিয়ে উঠেছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, কাথায়? এই শহরেই তো?

পণ্ডিতজী এবার হাসতে হাসতে বললে, তা বলছি না, আগে বল, র্থপ্রাপ্তি হ'লে আমায় কত দেবে?

চার আনা, বারো আনা। যা পাব, তার চার ভাগের এক ভাগ তামার।

পণ্ডিত উৎসাহিতভাবে বললে, রাজি, রাজি, খুব রাজি।

আমি বললুম, তা হ'লে কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে বে।

পণ্ডিত তাতেও বিশেষ অমত করলে না। যাত্রার সব আয়োজন তে লাগল। প্রথমে শহর থেকে ত্রিশ মাইল উত্তরে যেতে হবে।

সেখানে শতাধিক বৎসরের পুরাতন এক স্থাপিত বটগাছ আছে, সেই গাছকে দক্ষিণে রেখে প্রায় মাইল পাঁচেক পশ্চিমে গিয়ে আবার মাইল ছুয়েক উত্তরে গেলেই আমার পূর্বজন্মের জন্মভূমিতে পদার্পণ করা যাবে। সেইখানে আমারই বাড়িতে আমার পূর্বজন্মের প্রিয়া সমারোহে বাস করছেন।

পণ্ডিত ঠিক করলে, আমাদের সন্ন্যাসীর বেশে বেরুতে হবে। উপলক্ষ্য নিয়ে হাঙ্গামা ক'রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল, তাই পণ্ডিতের সব কথাতেই তখন আমি রাজি। যাত্রা সম্বন্ধে কিছুকাল গোপনে পরামর্শ চলবার পর একদিন অমাবস্যার অন্ধকারে অর্ধদেহ গৈরিক বসনে আবৃত ক'রে ছুজনে বেরিয়ে পড়া গেল।

পণ্ডিতজীর আদেশ অনুসারে আমি হলুম গুরু, আর সে হ'ল শিষ্য। সারারাত্রি চলি, দিনের বেলায় গ্রামে ডেরাডাণ্ডা ফেলে বসি। কাছে সামান্য কিছু অর্থ ছিল, তা ছাড়া পণ্ডিতের সংস্কৃত শ্লোকের বন্যায় গৃহস্থের ভাণ্ডার থেকে চাল, ডাল, ঘি ভেসে এসে আমাদের চরণমূলে আশ্রয়লাভ করতে লাগল। যাত্রা শুভই ছিল।

পণ্ডিত গণনা অনুসারে পথ চিনে চলতে লাগল। প্রায় আট-দশ দিন পরে একদিন গভীর রাতে এক গ্রামে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়িয়ে সে অঙ্ক ক'ষে দেখলে যে, ঠিক স্থানে আমরা পৌঁছেছি, এইখানেই আমাদের আস্তানা করতে হবে।

নন্দনন্দন আমায় উপদেশ দিলে, সমস্ত দিন ধুনির সামনে চোখ বুজে আসন-পিঁড়ি হয়ে ব'সে থাকতে হবে; বাকি যা কাজ, সে করবে এখন। রাতারাতি এদিক সেদিক থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ ক'রে সে ধুনি জ্বালিয়ে দিলে। ভোর হতে না হতে আমি আগুনের সামনে আসন নিয়ে ব'সে পড়লুম।

সকালবেলা গ্রামের মেয়েরা পুকুরে নাইতে এসে সন্ন্যাসী দেখে অবাক। তারা এসে আমার চারিদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ বা স্নান ক'রে ফেরবার সময় আমায় নমস্কার করতে লাগল। একবার চোখ খুলে ব্যাপার দেখেই প্রাণপণে চোখ দুটোকে চেপে বন্ধ ক'রে রাখলুম। থেকে থেকে পণ্ডিত ভীষণ চীৎকার করতে থাকে, তারা—তারা। সে চীৎকার শুনে আমারই বুকের মধ্যে গুরগুর করতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক এই ভাবে কাটবার পর পণ্ডিত তাক বুঝে একটি মেয়েকে ব'লে ফেললে, মা, তোর স্বামীর বড় অসুখ, না ?

মেয়েটি তখুনি সজলকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ বাবা, স্বামীর আমার বড় ব্যারাম। পিত্তশূল আছে, কদিন বুকের ব্যথায় উঠতে পারছে না।

পণ্ডিত তাকে আর কোন কথা না ব'লে একটা বিকট চীৎকার করলে, তারা।

চোখ বোজা থাকলেও সেবারের চীৎকার শুনে বেশ বুঝতে পারলুম যে, সেটা অব্যর্থ শর-সন্ধানীর উল্লাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

উত্তরের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রমণী আবার জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ বাবা, কি হবে ? সে কি আর ভাল হবে না ?

পণ্ডিত অত্যন্ত উদাসীনভাবে বললে, যা বেটী, যা, ঘরে ফিরে যা। জীবন-মৃত্যু এ তো সংসারের নিত্য খেলা।

চোখ বুজেই বুঝতে পারলুম যে, রমণী কাঁদতে কাঁদতে বললে, বাবা, সংসারে আমার কেউ নেই, আবার স্বামীকে বাঁচিয়ে দাও বাবা।

পণ্ডিত বললে, গুরুর কৃপা থাকলে বেঁচে যাবে। আমি কে, আমি ওঁর দাস মাত্র।

তা বাবা, তুমি যদি—

রাত্রি বারোটার সময় ওঁর ধ্যান ভঙ্গ হবে। সে সময় আসিস, ওষুধ মিললেও মিলতে পারে।

এই সময় আরও কয়েকটি রমণীকণ্ঠের অস্ফুটধ্বনি আমার কানে ভেসে এল। বুঝলুম, পণ্ডিত দিব্যি আসর জমিয়েছে।

পূর্বোক্ত রমণীটি আবার কাতরস্বরে বললে, দিনের বেলায় ওষুধ পাওয়া যায় না বাবা?

পণ্ডিত 'ওঃ বাবা' ব'লে শিউরে চীৎকার ক'রে উঠল।

সাপ-টাপ কিছু বেরিয়েছে মনে ক'রে তাড়াতাড়ি চোখ খুলে ফেললুম। কিন্তু পণ্ডিত তখুনি ব'লে ফেললে, গুরুর ধ্যান ভেঙে কি কোটি কল্পকাল নরকগামী হব? কিছু বুঝতে পারিস না বেটী?

বড্ড রক্ষা পেয়েছি মনে ক'রে চোখ দুটোকে চেপে বন্ধ ক'রে শির-দাঁড়া সোজা ক'রে আবার ধ্যানস্থ হওয়া গেল।

মেয়েটি বললে, আচ্ছা বাবা, তাই আসব।

তারপরে সমস্ত দিন ধ'রে গ্রামের নরনারী একে একে আমার চারপাশ ঘুরে গেল। কেউ বললে, ব্যাটা পাকা ভণ্ড। কেউ বা বললে, না হে, কার মধ্যে যে কি গুণ আছে, কিছু বলা যায় না। বর্ষীয়সীরা বললে, বাবাজীর বয়সটা বড় কাঁচা।

সন্ধ্যের পর যখন ভিড় স'রে গেল, তখন আমার প্রায় মূর্চ্ছা যাবার অবস্থা। সমস্ত দিন ব'সে ব'সে শিরদাঁড়া আর সোজা রাখতে পারলুম না, সেইখানেই দেহযষ্টি বিছিয়ে দিলুম। পণ্ডিত প্রায় দু ঘণ্টা ধরে সর্বাঙ্গে তেল মালিশ ক'রে দিয়ে আমায় চাঙ্গা ক'রে তুলে বললে, ওরকম করলে চলবে না, একটু শক্ত হতে হবে। আজ রাত্রে একজন চরণামৃত নিতে আসবে, তার স্বামীর আরোগ্যের জন্যে। এইটে যদি লেগে যায় তো বাস্, আর দেখতে হবে না।

প্রায় সমস্ত দিন ও অর্ধেক রাত্রির পর পণ্ডিতের হাতের তৈরি ুড়ি খেয়ে একটু আরাম ক'রে বসলুম। পণ্ডিতের কিন্তু আর বিরাম নই। সে খেয়ে উঠেই আসন-পিঁড়ি হ'য়ে ব'সে চীৎকার ক'রে মোহ-ার আওড়াতে লাগল, কা তব কান্তা—

এমন সময় সেই অভাগ্যের কান্তা আরও দু-তিনটি রমণীকে সঙ্গে নয়ে এসে আমাকে প্রণাম ক'রে একটু দূরে গিয়ে বসল।

পণ্ডিতের শিক্ষামত আমি শিষ্যের উদ্দেশ্যে বললুম, মা লক্ষ্মীরা বড় ভক্তিমতী। এই রাতে সাধুদর্শন করতে এসেছে।

পণ্ডিত বললে, বাবা, এর স্বামীর বড় অসুখ, একটু চরণামৃত দিতে হবে।

একটু হেসে বললুম, আমি আশীর্বাদ করছি, সেরে যাবে।

পণ্ডিত হাতজোড় ক'রে বললে, না বাবা, ওকে দয়া করুন। একটু চরণামৃত দিন।

অত্যন্ত অবহেলাভরে আবার বলা গেল, যার পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে, তাকে আমি কি ক'রে বাঁচাব? আমি অতি সামান্য লোক।

বলা বাহুল্য, সব কথাই পণ্ডিতজী আমায় আগেই শিখিয়ে রেখেছিল। আমি কিছুতেই দোব না, সেও কিছুতেই ছাড়বে না। শেষকালে শিষ্যের আগ্রহে চরণামৃত দিতেই হ'ল। মেয়েরা সবাই প্রণাম ক'রে ঘরে ফিরে গেল।

গ্রহ সুপ্রসন্ন ছিল, কি অপ্রসন্ন ছিল, বলতে পারি না। দু দিন পরে সেই মেয়েটি আবার এসে প্রণাম ক'রে জানালে যে, চরণামৃতের গুণে তার স্বামীর অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে, ভয়ের আর কোন কারণ নেই। আর একটু অমৃত পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় পণ্ডিত তাকে ব'লে দিলে, সেই বাটি ধুয়ে জল খাওয়াও, তা হ'লেই চলবে।

যেদিন সেই মেয়েটির স্বামী পথ্য পেলে, সেদিন আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। সকালবেলা স্নান ক'রে সে আমাদের গোড়শো-পচারে সিধে দিয়ে গেল। তারপর গ্রামের প্রায় সমস্ত নরনারী আমার সামনে এসে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, বাবা, রক্ষে কর।

ধ্যানস্থ হয়ে থাকা আর চলল না। চোখ খুলে সবাইকে হাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগলুম। পণ্ডিত সবাইকে প্রশ্ন করতে লাগল। কেউ বললে, ছেলের কালাজ্বর, তাকে সারিয়ে দিতে হবে। কারুর বা মাম মরলে কিছু পাবার আশা আছে, তারই একটা সুরাহা করতে হবে। কারুর বা মাদুলি চাই। কেউ বা হাত দেখাবে। সবারই চোখে উৎকণ্ঠা আর মুখে বুলি, বাবা, রক্ষে কর।

এতবড় সাংঘাতিক বিপদ মাথায় নিয়ে লোকগুলো এতদিন বি ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে ছিল, তা ভেবে আশ্চর্য হতে লাগলুম। সকাল থেকে ভিড় আর ভাঙে না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পণ্ডিতের অমন যে বৃষ বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর, তাও ভেঙে গেল।

সন্ধ্যেবেলা জলযোগ ক'রে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি, এমন সম একটি লোক এসে বললে, রাণীমা আপনাদের প্রণাম দিয়েছেন, একবা যেতে হবে।

পণ্ডিত গম্ভীরভাবে তাকে বললে, আমরা কোন গৃহস্থের আশ্রমে যাই না। রাণীমার প্রয়োজন থাকে, তাঁকে এখানে আসতে বল।

লোকটি বললে, রাণীমা একটু নির্জনে বাবার সঙ্গে কথা বলতে চান।

পণ্ডিত বললে, বেশ, রাত্রি বারোটার পর আসতে ব'লো, তখ লোকজন থাকে না।

লোকটি চ'লে যেতে নন্দনন্দন আমায় বললে, এইবার, এইবা

্যামার পূর্বজন্মের পত্নী আসবে। তুমি দেখলেই চিনতে পারবে। াড়াতাড়িতে কি কিছু হয়? শনৈঃ পন্থা—

উৎসাহের আবেগে সে প্রায় এক মুঠো নস্যি নাকে ঠেসে দিলে।

রাত্রি বারোটা বেজে গেছে। আমি ব'সে ব'সে প্রিয়তমার কথা 'বছি। পণ্ডিত বলেছে, দর্শনমাত্রেই তাকে চিনতে পারব। মনের ধ্যে নানা প্রশ্নের উদয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে, একতরফা চিনলে তো বে না, সে আমাকে চিনতে পারবে কি না! এই চেনাশোনার ল্পনায় মশগুল হয়ে গিয়েছি, এমন সময় পাঁচ-ছয়টি মেয়ে এসে আমাকে ে একে প্রণাম করলে। তাদের সঙ্গে একজন দরোয়ান লণ্ঠন নিয়ে সেছিল, সে দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলে, রাণীমা এসেছ?

রমণীদের মধ্যে একজন বললে, হ্যাঁ বাবা, এই এসেছি আমি।

পণ্ডিত বললে, এস মা লক্ষ্মী, এগিয়ে এস, গুরুদেবকে নিঃসঙ্কোচে শ্ন কর।

াণী এগিয়ে এসে আমায় প্রণাম ক'রে সামনে বসল। পণ্ডিতজী রোয়ানের হাত থেকে উজ্জ্বল লণ্ঠনটা নিয়ে আমাদের দুজনের সামনে রখে দিলে।

আমার বুকের স্পন্দন তখন মিনিটে প্রায় দুশোর কাছাকাছি াড়িয়েছে। বেশিক্ষণ চোখ চেয়ে থাকতে পারলুম না। চোখ বুজে ্মৃতিসাগরে ডুব দিলুম, যদি এ মুখের সাক্ষাৎ কোথাও পাওয়া যায়। হায় ায়! কোথাও তার দর্শন পেলুম না। স্বপ্নে যে দেবী আমায় দেখা দিয়ে াজ এই দুঃসাহসে ব্রতী করিয়েছে, তার মুখ স্মরণ করবার চেষ্টা রতে লাগলুম, কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও বিস্মরণের সে কঠিন যবনিকা লল না।

আমার সেই সমাধিস্থ অবস্থা দেখে রাণী বললে, আমি আপনার কাছে কিছু উপদেশ শুনতে চাই। আমি বড় দুঃখী।

চোখ বুজে থাকা আর চলে না। নন্দনন্দনের শিক্ষামত বলতে হ'ল, জানি, আমি সব জানি।

রাণী যেন চমকে উঠল। বললে, আপনি জানেন! আপনি—

জ্যোতিষার্ণব তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, কিছু সঙ্কোচ ক'রো না। ওঁকে জীবনের সব কথা খুলে বল, ওঁর কৃপা হ'লে তোমার সমস্ত সন্তাপ চ'লে যাবে।

রাণী আর একবার নিজেকে বেশ ক'রে গুছিয়ে নিয়ে ব'সে বললে, এ দুঃখিনীর জীবন-কাহিনী বড় রহস্যময়, আপনি কি দয়া ক'রে শুনবেন ?

আমি বললুম, শুনব বইকি। বল তুমি।

রাণী একবার এদিক ওদিক চেয়ে বললে, আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলুম। কিন্তু দরিদ্র হ'লেও তিন ছেলের পর মেয়ে হওয়ায় আমার বাবা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র জানতেন। নিজের কোষ্ঠী বিচার ক'রে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, মেয়ে থেকে তাঁর অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু তাঁর এ আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হ'ল না। কারণ, আমার কোষ্ঠী বিচার ক'রে তিনি জানতে পারলেন যে, আমার অদৃষ্টে আছে চিরবৈধব্য। অদৃষ্টের এই লিখনকে ফাঁকি দেবার জন্যে তিনি চিন্তা ক'রে আমার বৈধব্যযোগ খণ্ডাবার এক উপায় আবিষ্কার করলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা ও তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়া-কলাপের জন্যে তাঁর অনেক ধনী শিষ্য ছিল। এই শিষ্যদের মধ্যে একজন অতিবৃদ্ধের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে গোপনে তার সঙ্গে আমার বিবাহ দিলেন। তখন আমার বয়স মাত্র এক বৎসর। সেই সময়ে বিয়ে

দবার উদ্দেশ্য এই যে, বৃদ্ধ মারা গেলেই আমি বিধবা হ'লে, সঙ্গে সঙ্গে বধব্যযোগ যা ছিল তা কেটে যাবে, পরে বয়স হ'লে অন্য লোকের সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন।

কিন্তু ভবিতব্য ছিল অন্য রকমের। যে বৃদ্ধের সঙ্গে আমার বিয়ে য়েছিল, মরবার সময় কি মনে ক'রে সে আমার বাবাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আরও পাঁচজন সাক্ষীর সামনে তার বিশাল জমিদারি আমায় দিয়ে গেল। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে এ প্রলোভন ত্যাগ করা সম্ভব হ'ল না। তিনি নিজ গ্রামের বসবাস তুলে সপরিবারের আমার স্বামীর বাড়িতে এসে বাস করতে লাগলেন। তারপরে আমার যখন বাইশ বছর বয়েস, তখন আমার বৈধব্যের বিনিময়ে পাওয়া এই সম্পত্তি আমায় বুঝিয়ে দিয়ে বাবা ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন।

রাণী এই অবধি ব'লে চুপ করলে। তার কথা শুনে বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। উঃ! নন্দনন্দনের কি অদ্ভুত জ্যোতিষ-জ্ঞান! তখুনি তার পায়ে মাথা লুটিয়ে দিতুম, কিন্তু তখনকার মতন সে ইচ্ছা সম্বরণ ক'রে বললুম, আশ্চর্য তোমার জীবন-কাহিনী!

রাণী বললে, ইহকাল তো গিয়েছে, এখন পরকালের জন্যে কিছু সংগ্রহ করতে চাই। আপনি আমায় দীক্ষা দিন।

আমি বললুম, দীক্ষা নেবার আগে কিছুকাল তোমাকে ধর্ম-উপদেশ শুনতে হবে। সময় হয়েছে বুঝলে আমি নিজেই দীক্ষা দোব।

রাণী বললে, কবে থেকে আমায় উপদেশ দেবেন?

আমি বললুম, যেদিন থেকে তোমার ইচ্ছে। কাল থেকেই এস। তবে এই রকম রাত্রে আসবে, নির্জন না হ'লে অসুবিধে হবে।

রাণী আবার পায়ের ধূলো নিয়ে সে রাত্রের মত উঠে চ'লে গেল।

তারপর থেকে রাণী রোজ রাত্রে আমার কাছে উপদেশ শুনতে আসতে লাগল। রোজ রাত্রে অনেকখানি রাস্তা হেঁটে আসতে তার অসুবিধে হয় ব'লে সে তাদের বাড়ির পেছন-দিককার বাগানের এক কোণে আমাদের জন্যে সুন্দর একটি কুটীর তৈরি করিয়ে দিলে। সেখানে তার দরোয়ানদের তাড়ায় বাইরের লোকজন বেশি আসতে পেত না। রাণী প্রায় সকল সময়ই আমাদের কুটীরে আসত যেত। সকালে আমি যোগস্থ থাকতুম ব'লে সে আমার শিষ্য নন্দনন্দনের সঙ্গে কথাবার্তা বলত, আর রাত্রিবেলা ঘণ্টা দুয়েক ধ'রে আমি তাকে শাস্ত্র শোনাতুম। শাস্ত্র মানে চাণক্য-শ্লোক, তার বেশি শাস্ত্র আমার জানা ছিল না।

পণ্ডিতজীর ঘর ছিল আমার ঘরের পাশেই। একই চালার মাঝে দেওয়াল দিয়ে দুটো ঘর করা হয়েছিল। সে যা বলত, তা আমি প্রায় সবই শুনতে পেতুম। একদিন শুনলুম, পণ্ডিত রাণীকে বলছে, রাণীমা, তোমার স্বামী আবার জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁকে দেখতে ইচ্ছা হয়?

স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তার সঙ্গে ইতিপূর্বে রাণীর এ সম্বন্ধে আরও কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। পণ্ডিতের প্রশ্ন শুনে রাণী বললেন, কোথায় আছেন তিনি, একবার দেখাও বাবা।

নন্দনন্দন মুখে একবার চকচক আওয়াজ ক'রে যেন আপনার মনেই বললে, বেটী, এখনও চিনতে পারলি না! যাক, সময়ে সবই চিনবি।

চাণক্য-শ্লোক শেষ হয়ে গেল। হিতোপদেশের গোটাকতক শ্লোক তখনও মুখস্থ ছিল; তাই আওড়াতে লাগলুম। শ্লোকগুলোর মধ্যে বেদান্তদর্শনের এমন গূঢ় অর্থ গোপন রয়েছে দেখে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যেতে লাগলুম। সংস্কৃত শ্লোক আওড়াবার ধরন-ধারণ দেখে আমার প্রতি রাণীর ভক্তির মাত্রা দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল। ওদিকে

জ্যোতিষার্ণব প্রত্যহ সকালে দু ঘণ্টা তার গুরুর গুণবর্ণনা ক'রে রাণীর মনটা আমার ব্যাখ্যা উপলব্ধি করবার মতন তৈরি ক'রে রাখে, এই রকমে দিন কাটছে, এমন সময়ে একদিন পণ্ডিতকে বললুম, ওহে, আসল কাজের কি হ'ল? এ অবস্থায় আর কতদিন কাটাতে হবে?

পণ্ডিত বললে, আর কটা দিন সবুর কর। এখন ব্যস্ত হ'য়ো না, তীরে এসে তরী ডুবিও না।

আরও কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একদিন নন্দনন্দনের শিক্ষামত রাণীকে বললুম, দেখ, তুমি কাশীতে একটি বাবার ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা কর। উপযুক্ত সেবায়েত নিযুক্ত কর। তোমার পরকালে সদ্গতি হবে।

রাণী যেন আমার মুখে এই পরামর্শটি পাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল, বললে, আপনি যদি সেবার ভার নেন, তা হ'লে আমি টাকা দিতে পারি। আমি আর কাকেই বা চিনি, বিশ্বাসই বা করি কাকে?

আমি বললুম, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আজ এখানে আছি তো কাল সেখানে। ওসব টাকাকড়ির ভার আমি নিতে পারব না।

রাণী বললে, টাকাকড়ির হিসেব আপনার শিষ্য দেখবে, আপনি খালি তাদের খাটাবেন আর বাবা-মার সেবা করবেন।

আমি এ দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে পারব না ব'লে তখনকার মতন রাণীকে বিদায় করলুম, কিন্তু শেষকালে সে কিছুতেই ছাড়লে না। হ্যাঁ-না করতে করতে নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বে রাজি হতে হ'ল।

পরদিন থেকে আমরা তিনজনে মিলে মন্দিরনির্মাণের খরচ ও অন্যান্য বিষয়ের হিসেবপত্র শুরু করলুম। অনেক পরামর্শের পর স্থির হ'ল, মন্দির তৈরির জন্যে লক্ষ টাকা খরচ হবে। রাণী এই লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আমার নামে লিখে দেবে। আমি টাকা নিয়ে কাশীতে গিয়ে

মন্দির স্থাপন করব। তারপর ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে তাদের খরচের জন্যে সে একখানা তালুক লিখে দেবে।

সেদিন রাত্রে আনন্দের আতিশয্যে আমাদের ঘুমই হ'ল না। ঠিক হ'ল, মন্দির তৈরির টাকা থেকে বেশ দু-পয়সা থাকবে, তার ওপর সেবায়েতের টাকা আছে। যাক, ভবিষ্যৎ জীবনটা নিরুদ্বেগে কাটবার এতদিনে একটা সুবিধে হ'ল।

পরদিন রাণী এসে বললে, মন্দির প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের কথা শুনে তার ভাইয়েরা ভয়ানক খাপ্পা হয়ে উঠেছে।

কথাটা শুনে একেবারে দশ হাত মাটির নীচে ব'সে গেলুম।

পণ্ডিত প্রশ্ন করলে, বিষয়-আশয় কি ভাইদের নামে লিখে দিয়েছ নাকি?

রাণী বললে, না, তা দিই নি, কিন্তু তারা সব দেখা-শোনা করে; টাকাটা তারাই তুলবে কিনা।

আমাদের মুখের ভাব দেখে রাণী আশ্বাস দেবার জন্যে বললে, কিন্তু তা হ'লেও আমি টাকা দোবই।

টাকা হাতে এসে ফসকে যায় দেখে দ'মে গেলুম। পণ্ডিত বললে, টাকা আসবেই আসবে। দেখ না, এমন একটা ক্রিয়া করব যে, ভাইয়েরা এক লাখের জায়গায় দু লাখ এনে হাজির করবে।

পণ্ডিত এক অমাবস্যা দেখে খুব সমারোহ ক'রে কি একটা যজ্ঞ করলে। কিন্তু সেবার সে নিশ্চয় গুনতে ভুল করেছিল, কারণ সে ক্রিয়া রাণীর ভাইদের মনে কোন ক্রিয়াই করতে পারলে না।

রাণীও ক্রমে নিরাশ হয়ে পড়তে লাগল। সে বললে, আমি বিষয়ের মালিক হ'লেও ভাইয়েরা সব দেখে-শোনে ব'লে প্রায় গ্রামসুদ্ধ লোক তাদের অনুগত। গ্রামের সবাই নাকি রাণীর এই সৎকার্যে বাধা দিচ্ছে।

রাণী আরও বললে, ভাইয়েরা বলেছে যে, যদি তাদের অমতে টাকা দেওয়া হয়, তবে সন্ন্যাসীকে তারা দেখে নেবে।

সেইদিন রাত্তেই পণ্ডিতকে বললুম, আর নয় দাদা, এই বেলা স'রে পড়ি, এস। নইলে বরাতে দুঃখু আছে। এ বয়েসে অনাহার যদি বা দু-একদিন সয়, লাঠি সহ্য হবে না, সে কথা আগে থাকতে ব'লে রাখছি।

পণ্ডিত হুঙ্কার ছেড়ে বললে, কি, আমাদের মারবে! দেখি না কত বড় মারণবাজ তারা, বাণ মেরে সব ঠাণ্ডা ক'রে দোব না!

নন্দনন্দন আমার কথা না শুনে রাণীকে সৎকাজে উৎসাহ দিয়ে যেতে লাগল। শেষে রাণী একদিন আমাকে বললে, শিগগির একটা তালুক থেকে হাজার তিরিশ টাকা আসবার কথা আছে। টাকার সিন্দুকের চাবি থাকে আমার কাছে, সেই টাকা আপনাকে এনে দোব। এমনই ক'রে দু-তিন বারে লাখ টাকা পুরিয়ে দোব।

পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক হ'ল, লাখ টাকা যখন পাওয়া গেল না, তখন আপাতত তিরিশ হাজারেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সে বললে, এই টাকা নিয়ে তুমি কাশী গিয়ে জমি কেনবার ব্যবস্থা কর, আমি এখানে থেকে বাকি টাকার তাগাদা করি।

সে আমাকে ভরসা দিয়ে বললে, তোমার কোন ভয় নেই। আমি আছি, টাকা না নিয়ে এক পা নড়ছি না।

সেই সাব্যস্ত হ'ল। পণ্ডিত থাকবে আর আমি যাব। সে রোজই রাণীকে তাগাদা দিতে লাগল, কই গো মা লক্ষ্মী, টাকার কতদূর কি হ'ল?

রাণী রোজই আশ্বাস দেয়, এইবারে আসবে বাবা।

সেদিন সন্ধ্যের সময় আমার ঘরের মধ্যে তখনও প্রদীপ জ্বালানো

হয় নি। আমি ও পণ্ডিত অন্ধকারে ব'সে ভবিষ্যতের পরামর্শ করছি, এমন সময়ে ধীরে ধীরে রাণী সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল।

পণ্ডিত উঠে বাতি জ্বালাতে গেল। আমি বললুম, এস রাণী, আজ সমস্ত দিন বড় ব্যস্ত ছিলে বুঝি?

রাণী আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে একেবারে পা দুটো জড়িয়ে ধরলে। আমি তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললুম, কি হয়েছে, এত কান্না কিসের?

রাণী কাঁদতে কাঁদতে যা বললে তার অর্থ এই যে, আমেদপুরের নায়েব ত্রিশ হাজার টাকা খাজনা পাঠিয়েছিল, পথে ডাকাতেরা সে টাকা লুঠে নিয়েছে। সে স্পষ্টই বললে, ডাকাত-টাকাত সব মিথ্যে কথা, এ নিশ্চয় আমার ভাইদের কাজ।

রাণী আবার আমার পায়ে মাথা গুঁজে পড়ল। সে বললে, আমার ইহকাল তো গিয়েছেই, ঠাকুরকে মানত ক'রে দিতে পারলুম না, আমার পরকালও গেল।

রাণীর অবস্থা দেখে আমার সত্যই দুঃখ হ'ল। নিজের দোষের কথা আর মনে পড়ল না, যত রাগ হতে লাগল নন্দনন্দনের ওপরে। সেই তো যত নষ্টের গোড়া। ভদ্রলোকের মেয়ে সুখে ভাইদের নিয়ে সংসার করছিল, কোথা থেকে আমরা জুটে তার মনের শান্তি তো নষ্ট করলুমই, সংসারের শান্তিও গেল। আমি তাকে বুঝিয়ে বললুম, রাণী, ঠাকুরের কাছে মানত করেছ ব'লে যে আজই দিতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। তোমার যখন সুবিধে হবে, তখন দিও। তার ওপরে বিশেষ একটা কাজে এখান থেকে আমায় চ'লে যেতে হচ্ছে। এখন টাকা পেলেও কাজের সুবিধে হবে না।

রাণী আমার কথা শুনে কান্না শুরু করলে। সে বললে, না না,

আপনি কোথাও যাবেন না। এখানকার সবাই আমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, একমাত্র আপনারাই আমার বন্ধু। কাশীতে আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে এই পাপ-পুরী ছেড়ে আমিও আপনাদের সঙ্গে চ'লে যাব। আপনি আমায় চরণে ঠেলবেন না।

এই কথা ব'লে রাণী আবার আমার পায়ে মাথা গুঁজলে। নন্দনন্দন রে ব'সে ছিল, একবার চেয়ে দেখলুম যে, মুখখানা তার বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠেছে। আমার মুখে সান্ত্বনার ভাষা যোগাচ্ছিল না, ধীরে ীরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম।

• এই ভাবে কতক্ষণ কেটেছিল বলতে পারি না, হঠাৎ একটা বিরাট গোলমালে চমক ভাঙল। রাণী আমার পা থেকে মাথা তুলতেই ঘরের মধ্যে একেবারে দশ-বারোজন লোক চেঁচাতে চেঁচাতে ঢুকে পড়ল। আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালুম, ব্যাপার কি ?

রাণীর এক ভাই চেঁচাতে লাগল, ব্যাটা বদমাইস, ভদ্রলোকের কুল মজিয়ে বেড়াও!

আর এক ভাই ব'লে উঠল, যবে থেকে ঢুকেছে, সংসারটা একেবারে লণ্ডভণ্ড ক'রে খাচ্ছে!

বাইরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা চীৎকার করতে লাগল, মারো, মারো—

আমি যে কি করব, তা ঠিক করতে পারলুম না। ততক্ষণে আমায় ঘিরে কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। রাণী আমার কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, আমার দিকে কিছুক্ষণ মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সে ঘুরে মাটিতে প'ড়ে গেল।

রাণীকে ওই ভাবে মূর্ছিত হয়ে পড়তে দেখে লোকগুলো যেন আরও

ক্ষেপে উঠল। চারিদিকে ভীষণ চেঁচামেচি শুরু হ'ল, জল নিয়ে এস, হাওয়া কর, জায়গা ছাড়—

আমি যে কি করব, কিছু ঠিক করতে না পেরে সেই অবসরে চিমটেটা মাটি থেকে তুলে নিলুম।

একজন চেঁচিয়ে উঠল, আগে চ্যালা ব্যাটাকে মারো, সেইটেই আসল বদমাইস।

সবাই মিলে চ্যালার অনুসন্ধান করতে লাগল। কিন্তু কোথায় সে? চ্যালা যে গুরুর চেয়ে কত বেশি ওস্তাদ, সে খবর তো আর তারা জানে না! পণ্ডিতকে না পেয়ে তারা আবার আমাকে আক্রমণ করলে। এতক্ষণ তারা আমায় কিছু বলে নি, কিন্তু এবার তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হতে লাগল, দু-এক ঘা না দিয়ে বোধ হয় ছাড়বে না। সাবধান হতে না হতে একগাছা লাঠি পেছন থেকে হাঁ ক'রে আমার বাঁ কাঁধে এসে পড়ল। বাল্যকাল থেকে লাঠির সঙ্গে সম্পর্কটা আমার খুব ঘনিষ্ঠ হ'লেও, সেদিন সে আমায় কর্তব্য নির্ধারণের পথ যত সহজে চিনিয়ে দিলে, এমন আর কোনও দিন দেয় নি। কোনও চিন্তা না ক'রে চিমটে ঘোরাতে ঘোরাতে সামনের দরজা দিয়ে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়লুম। দু-চারজন লোক তেড়ে এসেছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে চিমটের তামাচায় একজন ধরাশায়ী হতেই তারা দাঁড়িয়ে গেল। তারপরে আঁদাড় পাঁদাড় পগার ডোবা পেরিয়ে, কাঁটানটে শেয়ালকাঁটা বাবলাকাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ক'রে নিরাপদ স্থানে গিয়ে আত্মরক্ষা করা গেল।

তারপরে প্রায় দশ-বারো দিন পদব্রজে ঘুরে ঘুরে শহরে ফিরে এলুম। পূর্বজন্মের প্রিয়ার বরাতে নেহাত দ্বিতীয় বার বৈধব্যযোগ ছিল না, তাই কোন রকমে প্রাণটা নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলুম।

আড্ডায় ফিরে আসতেই সবাই চেঁচিয়ে উঠল, আরে, এস এস, কোথায় ছিলে এতকাল ?

গম্ভীরভাবে বললুম, বোম্বাই ঘুরে আসা গেল, পাস পেয়েছিলুম কিনা।

আবার একদিন নির্জন পেয়ে হরিদাসকে সব কথা খুলে বললুম। সে বললে, সর্বনাশ! করেছিলে কি? এখন তোমার রন্ধ্রগত শনি, এখন এসব করতে আছে ?

সে বললে, পণ্ডিত কোথায় ?

আমি বললুম, সে বেচারীর সেই থেকে আর দেখা পাই নি। আমার জন্যে সে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। টাকাও পেলে না, কষ্টেরও একশেষ।

হরিদাস হেসে বললে, ক্ষেপেছ তুমি! সে নিশ্চয় তার চার আনা অংশ আদায় ক'রে নিয়ে গেছে, পণ্ডিতে আর মূর্খে তফাত ওইখানে।

উড়ো চিঠি

আমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দলের কেউ কারও পুরো নাম ধ'রে ডাকত না। নামগুলোকে দুমড়ে-দামড়ে নিংড়ে রস না বার করলে যেন ডেকে সুখ হ'ত না। এর মধ্যে বয়সের কোন খাতির ছিল না। কিন্তু জগদীশের বেলায় আড্ডার এই সনাতন নিয়মটির ব্যতিক্রম হয়েছিল। দলের সবাই তার পুরো নামের পেছনে আবার একটা "দা" যোগ ক'রে তার লম্বা নামকে আরও লম্বা ক'রে দিয়েছিল। জগদীশের চেহারায় বাক্যে ও ব্যবহারে এমন একটা দাদাত্ব মাখানো ছিল যে, প্রথম দর্শনের দিনেই আমরা আমাদের অজ্ঞাতেই তাকে দাদার সম্মান দিয়ে ফেলেছিলুম।

সেদিন আড্ডায় নারীর ভোটের অধিকার নিয়ে আলোচনা চলছিল। বিলাসকুমার মেয়েদের স্বাধীনতার বিরোধী মত প্রকাশ করছিল, আর মেয়েদের পক্ষ নিয়ে তর্ক করছিল জগদীশ। বিলাস—নামে বিলাস হ'লেও, জাতে ছিল সে সন্ন্যাসী। তা ছাড়া, তর্কে তার বুদ্ধি মাড়োয়ারীদের জুয়ার বুদ্ধির চেয়েও ঢের প্রখর ছিল। আমরা কেউ তার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠতুম না। বিলাস যে দলে থাকত, সে দল যুক্তিতে হেরে গেলেও শেষকালে গলাবাজিতে বাজি মাত করত।

রোজ-তারিখের মত সেদিনও আমরা নিঃস্বার্থভাবেই তর্ক ক'রে চলেছিলুম, কিন্তু সেদিন জগদীশের যুক্তির কাছে বিলাসের যুক্তি, এমন কি, তার গলাবাজি পর্যন্ত থেমে গেল। বিলাসকে সেদিনকার মত রণে ভঙ্গ দিতে হ'ল। তর্কের শেষে সখীচাঁদ বললে, জগদীশদা, নারীর অধিকার সম্বন্ধে তুমি একদিন বক্তৃতা দাও, আমরা বন্দোবস্ত করি।

বক্তৃতার কথা শুনে জগদীশ একেবারে লাফিয়ে উঠে বললে, না না, ওসব হাঙ্গামা যদি কর, তা হ'লে আড্ডায় আমার আসা বন্ধ হবে। সভা-সমিতি, বক্তৃতা সেসব অনেকদিন চুকে গিয়েছে, আর নয়।

আমরা ওকে ধ'রে বসলুম, কেন চুকে গিয়েছে?

জগদীশ বলতে লাগল—

নারীর উন্নতি ও নারীর কল্যাণসাধনাকে একদিন জীবনের প্রধান ব্রত করেছিলুম। সভা-সমিতিতে আমার বক্তৃতা, মাসিকে সাপ্তাহিকে আমার প্রবন্ধ দেশের সনাতনপন্থীদের ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। আমাদের বংশ অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল। আমার মা, খুড়ী, পিসী, ঠাকুমা এঁরা সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখতে পেতেন না। পাল্কি ডুবিয়ে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে আমার বাবার এক পিসীর সদ্য সদ্য গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছিল। ছেলেবেলায় খুড়োদের এই নিয়ে গর্ব করতে শুনেছি। এমনই পবিত্র পরিবারের একমাত্র বংশধর আমি যখন আমার স্ত্রীকে নিয়ে সভা-সমিতিতে যেতে আরম্ভ করলুম, বন্ধুসমাজে স্ত্রীকে অবাধে মিশতে দিলুম, তখন সমাজে একটা বিপুল আন্দোলনের ঢেউ উঠল। দু-একখানা বাংলা খবরের কাগজে ব্যঙ্গচিত্রও ছাপানো হয়েছিল। কিন্তু এসব বাধা উপচে আমার উৎসাহের স্রোত গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাসের আকারে ছুটতে লাগল। উভয় পক্ষে তুমুল মসীযুদ্ধ, সভা-সমিতিতে বাক্‌যুদ্ধ, দু-এক জায়গায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ পর্যন্ত হয়ে গেল। কয়েক বছর এই রকম অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর বিপক্ষদলের উৎসাহে যেন ভাঁটা প'ড়ে এল। আমার দলে তখন অনেক লোক; বিপক্ষদলের অনেকেও কেউ সোজা ভাষায় কেউ বা ভাবে আমাদের মত সমর্থন করতে আরম্ভ করেছে, কোনও রকম বাধা না থাকায় আমাদের কাজ ধাঁ-ধাঁ ক'রে এগিয়ে চলেছে, স্ত্রীশিক্ষার দুটো তিনটে প্রতিষ্ঠানও খোলা হয়েছে, এই

রকমে জয়ের নেশায় মন যখন আমার ভরপুর, ঠিক সেই সময় উড়ো চিঠি একখানা কানে কানে এসে ব'লে গেল—নির্মলের সঙ্গে তোমার স্ত্রীর ব্যবহারটা একটু সন্দেহের চোখে দেখো। এখন থেকে সাবধান না হ'লে ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে। ইতি তোমার বন্ধু।

আমি তখন টেবিলে ব'সে কি একটা কাজ করছিলুম। কাজ-টাজ সব চুলোয় গেল। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। নির্মল! সংসারে সবচেয়ে বড় বন্ধু আমার সে। সে আমায় এতবড় আঘাত দেবে?

নির্মল, আমি ও শান্তি আমরা একই গ্রামের ছেলেমেয়ে। আমরা একসঙ্গে মানুষ হয়েছি বললেও চলে। আমি ও নির্মল একসঙ্গে স্কুল ও কলেজে পড়েছি; কলেজ থেকে বেরিয়ে আমরা দুজনে হাত-ধরাধরি ক'রে সংসারের কর্মক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছি। সে আমার সমস্ত কাজের সর্বপ্রধান সহায়, সেই নির্মল! আমার মাথার ভেতর ঝিঁ-ঝিঁ বাজতে লাগল, টেবিলে মাথা দিয়ে ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে রইলুম। বুকের মধ্যে একটা চাপা যন্ত্রণা হতে লাগল, আর সে রকম ব'সে থাকতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। বেরোবার সময় শান্তি বললে, এখন বেরোচ্ছ যে? অপেরা-হাউসে যাবে না, সীট বুক করা হয়ে গিয়েছে যে! আমি বললুম, তুমি যেও, বিশেষ একটা কাজে আমার যাওয়া হ'ল না।

শান্তি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি আর কথা না ব'লে তরতর ক'রে সিড়ি দিয়ে নেমে বাইরে চ'লে গেলুম।

রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মনের মধ্যে নির্মল ও শান্তির ব্যবহারটা ভাল ক'রে আলোচনা করতে লাগলুম। নির্মল সর্বদাই আমার বাড়িতে আসে। আমার অনেক বন্ধুই আমার বাড়িতে আসা-যাওয়া করত, কিন্তু নির্মলের মত ঘনিষ্ঠতা আর কারও সঙ্গে ছিল না। নির্মলের

প্রতি শাস্তিরও বিশেষ পক্ষপাতিতা দেখা যেত। অন্য বন্ধুদের চাইতে নির্মলের সঙ্গ তাকে বেশি আনন্দ দিত। অনেক সময় রাত্রে বাড়িতে গিয়ে দেখেছি, সে আর শাস্তি ব'সে গল্প করছে। শাস্তি আমাকে না জানিয়ে তাকে দিয়ে অনেক জিনিস কিনিয়ে আনত; আমি জানতে পারলে সে বলত, তোমার এত কাজ—

ওঃ, এতদিন যেসব ঘটনাকে অতি তুচ্ছ ব'লে মনের কোণেও স্থান দিই নি, আজ সেই সব ঘটনা এক-একটা রহস্যের ভাণ্ডার ব'লে মনে হতে লাগল।

কিন্তু শাস্তি! তার প্রবৃত্তি কি এত নীচ হবে? তাই যদি হয়, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আপনার ব'লে যাদের বুকে জড়িয়ে ধরেছি, সকলের চেয়ে বড় বেদনা যদি তাদের কাছ থেকেই পাই, তবে আর বিশ্বাস করব কাকে? নির্মল আমার জীবনবন্ধু, আর শাস্তি আমার প্রিয়তমা।

সংসারের ওপর একটা দারুণ ঘৃণা আমার মনের সমস্ত কোমল বৃত্তিগুলোকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে লাগল। বার বার মনে হতে লাগল, এই নারী! এরই কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি? ধিক আমাকে।

রাত্রি দশটা অবধি দম-দেওয়া পুতুলের মত শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন দেহ ও মন আমার অবসাদে ভ'রে গিয়েছে। শাস্তি তখনও থিয়েটার দেখে ফেরে নি। খেতে আর প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, জুতোজোড়া খুলে ফেলে আমি শুয়ে পড়লুম। বুকের পকেটে সেই উড়ো চিঠিখানা ছিল, তারই মারাত্মক স্পর্শ আমার সর্বাঙ্গে বিষের দাহন ছড়িয়ে দিচ্ছিল; তবু সেখানাকে অন্য কোথাও রেখে শুতে পারলুম না। বিছানায় প'ড়ে ছটফট করতে লাগলুম।

রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। দরজায় মোটর দাঁড়াবার শব্দ হ'ল, বুঝলুম, শান্তি এসেছে। সে সিঁড়ি বেয়ে খটখট ক'রে উঠে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল, আমি চোখ বুজে প'ড়ে রইলুম। শান্তি কাপড় ছাড়ছে, এমন সময় নির্মল নীচে থেকে চেঁচিয়ে বললে, জগদীশ এসেছে? না, আমি একটু বসব?

শান্তি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, উনি এসেছেন। নির্মল বোধ হয় চ'লে গেল।

আধ ঘণ্টা পরে শান্তি আমায় ঠেলে তুলে জিজ্ঞাসা করলে, খাও নি কেন?

শরীরটা ভাল নেই।—ব'লে আবার পাশ ফিরলুম। আমার ব্যবহারে শান্তি বোধ হয় আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। সে চুপ ক'রে কিছুক্ষণ খাটের ধারে ব'সে রইল, তারপর আলো নিবিয়ে দিয়ে পাশে এসে শুয়ে পড়ল।

আমার চোখে নিদ্রা নেই। নানা রকম অদ্ভুত চিন্তা তালগোল পাকিয়ে মাথার ভেতর নাচন শুরু করেছিল। থেকে থেকে শান্তির উত্তপ্ত নিশ্বাস আমার মুখে চোখে কানে এসে লাগছিল, মুমূর্ষু রোগীর কানের কাছে শ্যালিকার পরিহাসের মত। এক-একবার মনে হতে লাগল যে, শান্তিকে জিজ্ঞাসা করি, কিসের জন্যে সে আমাকে ছেড়ে নির্মলের প্রতি আসক্ত হয়েছে? নির্মল, সে আমার চেয়ে কিসে বড়, কোন্ বিষয়ে উন্নত? জিজ্ঞাসা করি, আমার এই বুক-ভরা ভালবাসার কি এমনই ক'রেই প্রতিদান দিতে হয়? কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করা হ'ল না, আমার সমস্ত পৌরুষ উদ্যত হয়ে সে প্রলোভনের সা দাঁড়িয়ে বাধা দিতে লাগল।

হঠাৎ শান্তির একখানা হাত আমার গলার ওপর এসে পড়ল।

তার সেই হাতে কি মাখানো ছিল, জানি না, সেই হাতের স্পর্শ পাবামাত্র আমার দগ্ধ অন্তর যেন জুড়িয়ে গেল। আমি দু হাতে তার হাতখানাকে চেপে ধ'রে বুকের ওপর রাখলুম। এই শান্তিকে আমি অবিশ্বাস করেছি! ছি ছি, আমার মত পাষণ্ড আর নেই। কে কোথায় নিজের মনের বিষ উদ্গার ক'রে চিঠি লিখেছে, আর আমি সেই চিঠিতে বিশ্বাস ক'রে নিজের স্ত্রীকে অবিশ্বাস করছি! কি নির্বোধ আমি! শান্তির স্পর্শ আমার দেহ ও মনে ঘুমের পরশ বুলিয়ে দিতে লাগল। তার হাতখানা বুকের ওপর রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। যখন উঠলুম, তখন বেলা প্রায় নটা।

ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার মনের অবসাদ একেবারে কেটে গিয়েছে। আমার জন্যে নির্মল ব'সে ছিল। সেদিন বিকেলে এক সভায় আমার বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। নির্মল সেই সম্বন্ধে কি বলতে এসেছিল। সভার কথা ওঠবামাত্র শান্তি বললে, না না, উনি আজ সভায় যাবেন না, ওঁর শরীর খারাপ।

তারপর সে আমার দিকে ফিরে বললে, তুমি দিনকয়েক এই সব হুল্লোড় ছেড়ে দাও। দিনে দিনে শরীরের অবস্থা কি হচ্ছে. একবার দেখেছ? শরীর গেলে নারীর উন্নতি যা হবে তা বুঝতেই পারছি, মাঝ থেকে ঘরের নারীটির প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হবে।

শান্তির কথা শুনে নির্মল হো-হো ক'রে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল। তারপর সে বললে, এ কথাটা বেশ বলেছ বউদি, কিন্তু ভাই, আজকের মতন জগদীশকে ছেড়ে দিতে হবে। আমি তাদের কথা দিয়ে এসেছি, না হ'লে আমার মাথা কাটা যাবে।

সকালবেলাটা হাসি-ঠাট্টায় মন আমার একেবারে হাল্কা হয়ে গিয়েছিল, গত রাত্রির চিন্তার জন্যে নিজের মনে অনুতাপ হতে লাগল।

নিজের মনকে বার্ বার ধিক্কার দিয়ে বললুম, শান্তিকে কি ব'লে অবিশ্বাস করেছিলুম? আর নির্মল, সে যে আমার ভাইয়ের চেয়েও বেশি। তার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু সে যা ছেলে, আমার কথা শুনলে পাছে একটা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলে, এই ভয়ে কাউকে কোন কথা না ব'লে সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে চেপে গেলুম। বিকেল নাগাদ সেই উড়ো চিঠির কথা আর মনেই রইল না।

২

শান্তি যা আশঙ্কা করেছিল, ঠিক তাই হ'ল। কয়েক মাস অবিশ্রান্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে সাংঘাতিক রোগে আমাকে শয্যাশায়ী হতে হ'ল। এই রোগে প্রায় পাঁচ মাস আমাকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। রোগের প্রথম অবস্থায় কে আমার সেবা করছে, কে আমার চিকিৎসা করছে, তার কোনও জ্ঞানই আমার ছিল না। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে আমার মস্তিষ্কের গোল হয়ে গিয়েছিল। সংসারে আমার নিকট-আত্মীয় কেউ ছিল না, কিন্তু আমার যা সহায় ছিল, তা আত্মীয়ের চেয়ে ঢের বেশি। আমার অর্থ ছিল, আমার স্ত্রী ছিল, আর ছিল আমার বন্ধু নির্মল। এদের সেবা ও শুভ ইচ্ছা আমার রোগে সঞ্জীবনী সুধার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করেছিল।

রোগের মধ্যে প্রথম যেদিন আমার জ্ঞান হ'ল, সেদিনকার কথা কখনও ভুলব না। তখনও আমার অজ্ঞানের কুয়াশা ভাল ক'রে কাটে নি; সব কথা আমি ভাল ক'রে গুছিয়ে ভাবতে পারছিলুম না। চোখ চেয়ে দেখলুম, ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। শান্তি আমার

বিছানায় আমার পাশে ব'সে ছিল। অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকেও তাকে চিনতে পারলুম না। খালি মনে হতে লাগল যে, এই শীর্ণ-ম্লানা নারীটি কে আমার পাশে ব'সে রয়েছে? আমার সেবার জন্যে কি নার্স আনা হয়েছে? আমাকে তার কাছে রেখে শান্তি স্নান করতে গেছে মনে ক'রে আবার চোখ বুজলুম। কিন্তু চুপ ক'রে প'ড়ে থাকতে আমার কষ্ট হতে লাগল, শান্তিকে দেখবার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল। আমি চোখ চেয়ে বললুম, শান্তি কোথায়, একবার তাকে ডেকে দিন না।

শান্তি আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি যে শান্তি।

তুমি শান্তি! তোমার এই দুর্দশা হয়েছে!

আমি আর তার দিকে চেয়ে থাকতে পারলুম না, চোখ বন্ধ ক'রে ফেললুম।

শান্তি আস্তে আস্তে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

রোগশয্যা ছেড়ে উঠলুম। দিনে দিনে আমার শরীর সুস্থ হতে লাগল বটে; কিন্তু আমার দেহের সমস্ত রোগ আমার মনটাকে আঁকড়ে ধ'রে রইল। দেহ সুস্থ অথচ মন অসুস্থ, এ অবস্থা যার না হয়েছে, সে তা কল্পনা করতে পারবে না। যুক্তি-তর্ক-মন দিয়ে নিজের বুদ্ধিকে আমি টেনে রাখতে চেষ্টা করছি, অন্য দিকে একটা বিরাট শক্তি আমার বুদ্ধিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বিস্মৃতির অন্ধকারে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। মনের মধ্যে দিবারাত্রি এই দুই শক্তিতে টানাটানি চলতে চলতে কখনও কখনও আমি যুক্তি হারিয়ে ফেলতুম। সে সময় আমার আর জ্ঞান থাকত না, আমি যা-তা কাণ্ড ক'রে ফেলতুম। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দু-একটা এমন কাণ্ড ক'রে ফেললুম যে, তারা বিরক্ত হয়ে আমার বাড়িতে আসা বন্ধ ক'রে দিলে। শান্তিকে যখন তখন যা-তা বলতুম,

সে কখনও রাগ করত, কখনও বা একলা ব'সে কাঁদতে থাকত। আমার মনের খোঁজ কেউ করত না। মনের খোঁজ করবে কি, আমার মাথার অবস্থা তখনও কেউ ভাল ক'রে বুঝতেই পারে নি। নির্মল কিন্তু তখনও আমার বাড়িতে আসত, সে যে ছিল আমার জীবনবন্ধু।

আমি দেখতুম, মাঝে মাঝে শান্তি ও নির্মল কি পরামর্শ করে। তাদের কথাবার্তার মাঝখানে যদি কখনও গিয়ে পড়েছি, বেশ বুঝতে পারতুম যে, তারা আগের কথা থামিয়ে দিয়ে অন্য কথা শুরু ক দিয়েছে।

আবার সেই উড়ো চিঠি উড়ে এসে আমার কানে বিষ ঢেলে দিয়ে যেতে লাগল। আমার অসুস্থ মন তখন আর কোন যুক্তি-তর্ক মানতে চাইত না। চিন্তার ধারা একবার বইতে আরম্ভ করলে উধাও হয়ে ছুটে চলত, তাকে কিছুতেই রোধ করতে পারতুম না।

মধ্যে মধ্যে আমার মনে হ'ত, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? এই কথা মনের মধ্যে উদয় হবামাত্র আমি অস্থির হয়ে পড়তু নিজেকে সামলাতে পারতুম না, একটুখানি আশ্রয় পাবার জন্যে ছুটে শান্তির কাছে পালিয়ে যেতুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখতুম, নির্মল ব'সে আছে। হতাশায় মাথা ঘুরতে থাকত, টলতে টলতে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের ঘরের চৌকিতে শুয়ে পড়তুম।

তখন আমার মাথা ও মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই সময় একদিন বিকেলে আমি ছাতের ওপর আলসের ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছি; রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, কি জানি কেন, মনে হ'ল যে, এখান থেকে প'ড়ে গেলে আর কিছু থাকে না। আগেই বলেছি যে, চিন্তা একবার শুরু হ'লে তাকে অন্য পথে ফেরানো আমার অসাধ্য হয়ে উঠেছিল। সে কথা ভাবতে ভাবতে কে যেন আমাকে ছাতের ওপর

:থকে নীচে লাফিয়ে পড়বার প্রলোভন দেখাতে লাগল। আর একটু হ'লেই আমি সেদিন নীচে লাফিয়ে পড়েছিলুম আর কি! আলসের কানায় আমার ধুতিখানা কি ক'রে বেধে গিয়ে টান পড়তেই আমার চমক ভাঙল। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন চড়াক ক'রে টা তড়িৎ-তরঙ্গ খেলে গেল; আমি ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে একটা ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে দেখি, শান্তি আর নির্মল ব'সে গল্প করছে। সেদিন আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না, মুখে যা এল, তাই ব'লে তুজনকে গালাগালি দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

নির্মল মুখটি চুন ক'রে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর শান্তি কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে আমার হাত ধ'রে ঘরের মধ্যে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমায় বাতাস করতে লাগল। শান্তি আমায় একটি কথাও বললে না, আমিও আর তাকে কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে প'ড়ে রইলুম।

সকালবেলা আমাকে দেখবার জন্যে একজন নতুন ডাক্তার এলেন, সঙ্গে নির্মল। ডাক্তার আমাকে বায়ু-পরিবর্তনের উপদেশ দিলেন।

বায়ু-পরিবর্তনের কথা শুনে আমি প্রস্তাব করলুম যে, দেশে যাওয়া যাক। দেশে আমাদের পুরনো বাড়ি ভেঙে আমি নতুন ধরনের বাড়ি তৈরি করেছিলুম। আমার বাগান দেখবার জন্যে গ্রামান্তর থেকে লোক আসত। আমাদের দেশ তখন বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা ছিল। আমার প্রস্তাবে শান্তিরও অমত হ'ল না। আমরা দেশে গিয়ে বাস করতে লাগলুম।

দেশে ফিরে এসে নতুন আবহাওয়ার মধ্যে প'ড়ে আমার স্বাস্থ্যের একটু একটু ক'রে উন্নতি হতে লাগল, মাথার অসুখটাও অনেক ক'মে গেল। আমি আমার আগের স্বাস্থ্য প্রায় ফিরে পেলুম।

মনের অবস্থা একটু ভাল হতে না হতেই আমি আবার কাজে মন দিলুম। একখানা উপন্যাস অর্ধেক লেখা হয়ে প'ড়ে ছিল, দিনরাত ব'সে সেখানা শেষ করতে লাগলুম। দেশে সভা-সমিতির হাঙ্গামা কিছুই ছিল না, ভাববার সময়ও যথেষ্ট, কাজে একটু একটু ক'রে উৎসাহও লাগছিল। ভাবলুম, দেশে এখন কিছুদিনের জন্যে থাকব।

ওদিকে শান্তি শহরে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। অবশ্য, মুখে কিছু বলত না, কিন্তু আমি বুঝতে পারতুম যে, শহরের কর্ম-কোলাহল, সভা-সমিতির উন্মাদনা ছেড়ে দিয়ে গ্রামে ব'সে একঘেয়ে রোগীর সেবা করা তার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। শহরে থাকতে আমি সব সময় শান্তিকে নিয়ে ঘুরতে পারতুম না, নির্মল অনেক সময় তাকে এখানে সেখানে নিয়ে যেত। এখানে নির্মল নেই, সে কলকাতায় ব্যবসা করে ; সেসব ছেড়ে দিয়ে গ্রামে এসে আমার মতন চুপচাপ ক'রে ব'সে থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবুও সে প্রায়ই এসে গ্রামে দিন কতক ক'রে থেকে যেতে লাগল। নির্মল যে কটা দিন থাকত, বেশ বুঝতে পারতুম যে, সে দিনগুলো শান্তির বেশ আনন্দেই কাটছে। শান্তি নির্মলের সঙ্গে অবাধে মিশত ব'লে গ্রামের লোকেরা অনেক কথা বলতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কিন্তু সেসব কথা আমি গ্রাহ্যই করতুম না। তবুও আমার মন বুঝতে পারছিল যে, আমার সঙ্গ শান্তিকে আর তেমন আনন্দ দিতে পারছে না। আমি মনে মনে স্থির করলুম যে, উপন্যাসখানা শেষ ক'রে কলকাতায় যাব, তারপর যে দিকে চোখ যায়, সেই দিকে বেরিয়ে পড়ব। শান্তি যদি আবার কোনও দিন আমার অভাব অনুভব করে, তবেই ফিরে এসে আবার কাজে মন দোব, নচেৎ এই শেষ।

শান্তিকে ছেড়ে চ'লে যাব—এ চিন্তা আমার কাছে দুঃসহ হয়ে

ঠেল। কিন্তু তবুও যেতে হবে, উপায় নেই। সমস্ত ব্যাপারটা আমি শান্তির দিক দিয়ে বিচার করতে লাগলুম। শান্তি আমায় ভালবাসত, আমি তাকে যেমন ভালবাসি, সে আমাকে তার চেয়ে কিছু কম ভালবাসত না। কিন্তু একজন নারী অথবা একজন পুরুষ যদি সারা জীবন ধ'রে একজনকেই ভালবাসতে না পারে? সকলের পক্ষে তা সম্ভব নাও হতে পারে। জীবনধারণ তো ওষুধ গেলা নয় যে, কোন রকমে সেটা ঢোক ক'রে গলা দিয়ে নামিয়ে দিলেই হবে। এই রকম ভাবতে ভাবতে আমি পাগলের মত হয়ে উঠতুম, এক-একবার মনে হ'ত, শান্তিকে খুন ক'রে নিজে আত্মহত্যা করি; কিন্তু তখনই আবার মনে হয়েছে, শান্তিকে কি ক'রে খুন করব?—না না, তা পারব না। তবে?—তবে আমাকেই বিদায় নিতে হবে। তার সুখের পথে কাঁটা হয়ে আমি থাকব না। সে থাক্, সুখে থাক্, আমি চ'লে যাব—এই আমার ভালবাসার পুরস্কার।

আমি ঠিক ক'রে ফেললুম যে, উপন্যাসখানা শেষ ক'রেই একদিন নিঃশব্দে কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়ব। বিশাল এই সংসারের বুকের ওপর দিয়ে কাজ ও অকাজের যে স্রোত ব'য়ে চলেছে, তারই মুখে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ভেসে চ'লে যাব, দিনের শেষে সে আমায় যে ঘাটে তুলে দিয়ে যায় যাবে, কোনও চেষ্টা করব না, কোনও দিকে ফিরে চাইব না। শান্তিকে ছাড়তে আমার কষ্ট হবে, কিন্তু আমি চ'লে গেলে সে সুখে থাকবে। আমি বাড়িতে থাকতে থাকতেই তাকে ভুলতে চেষ্টা করতে লাগলুম। তাকে দেখলে দূরে স'রে স'রে যেতুম, কথা কইতে এলে কাজের অছিলা ক'রে অন্যত্র চ'লে যেতুম। উপন্যাস লেখবার নাম ক'রে লেখবার ঘরেই শুয়ে কাটাতুম। এমনই ক'রে আমার দিনরাত্রি কাটতে লাগল।

৩

তারপর সেই রাত্রি, শান্তির সঙ্গে যেদিন আমার শেষ দেখা। রাত্রি প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছে। আমি টেবিলে ব'সে একমনে মাথা হেঁট ক'রে লিখছি, এমন সময় শান্তি এসে আমার পাশে দাঁড়াল। আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছিলুম যে, নির্মল আর আমাদের বাড়ি আসছে না। শান্তির বোধ হয় একা মন-কেমন করছিল। ইদানীং আমি তার সঙ্গে কথা বলা এক রকম বন্ধ ক'রেই দিয়েছিলুম। শান্তি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পেরেও আমি মুখ তুললুম না। একটু পরেই সে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললে, চল, শুতে যাই, আর লিখো না। আমি বললুম, তুমি যাও, শোও গে, আমি এইখানেই শোব।

কথাগুলো আমার নিজের কানেই কর্কশ শোনাল। আমি অনুভব করছিলুম, শান্তির হাতখানা কাঁপতে কাঁপতে আমার কাঁধের ওপর থেকে ক্রমেই শিথিল হয়ে যাচ্ছে। তারপর সে হঠাৎ হাতখানা কাঁধ থেকে তুলে নিয়ে ঝড়ের মতন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে চ'লে গেল।

পরদিন সকালবেলা উঠে শুনলুম, শান্তি নেই।

আমাদের বিয়ের সময় শান্তিদের বাড়ি থেকে তার সঙ্গে এক ঝি এসেছিল। সে আমাদের বাড়িতেই থাকত, সে এসে আমায় সংবাদ দিলে যে, কাল রাত্রি থেকে তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

তাকে ব'লে দিলুম, শান্তির নাম যেন আমার বাড়িতে আর কেউ মুখে না আনে।

শান্তির এই পলায়ন আমি যতই হাল্কাভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করতে লাগলুম, আমার ভেতরের মানুষটা যেন ততই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগল। ভেতর থেকে বার বার কে বলতে লাগল, তোমার দোষেই

আজ তুমি শান্তিকে হারালে। যদি আগে থাকতে একটু সাবধান হতে!

মনে পড়ল সেই উড়ো চিঠির কথা। অজ্ঞাত বন্ধু আমার, তখন যদি তোমার কথা শুনে সাবধান হতুম!

শান্তির পলায়নের কথা সন্ধ্যার আগেই গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। তার নামে নানান কুৎসা আমার কানে ভেসে আসতে লাগল। অনেকে এমন কথাও বললে যে, তারা নির্মল ও শান্তিকে নৌকো ক'রে যেতে দেখেছে। আমার মনের তখন কি রকম অবস্থা, তা বোধ হয় বুঝতে পারছ। একে আমার অসুস্থ মন নানা চিন্তায় অধীর, তার ওপর গ্রামের লোকদের নিন্দায় গৃহ আমার নরক হয়ে উঠল। একটুখানি সহানুভূতি পাবার আশায় আমি ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগলুম। কিন্তু কে আমায় সহানুভূতি জানাবে! গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এমন কি ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আমায় দেখতে আসতে লাগল, যেন আমি একটা অদ্ভুত জীবে পরিণত হয়েছি। সবার মুখেই এক কথা, জগদীশের বউ পালিয়ে গিয়েছে।

সাত দিন যেতে না যেতে আমি আমার কর্মচারীদের ওপর বাড়ি ও বিষয়ের ভার দিয়ে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম।

বহুকাল দেশে-বিদেশে পাগলের মতন ঘুরে বেড়ালুম, কিন্তু শান্তি তো পেলুম না! নারীর স্বাধীনতা, নারীর শিক্ষা ও নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলুম, সেই নারীই আমাকে সকলের চেয়ে বড় বেদনা দিলে; যে বন্ধুর উপকারের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলুম, সেই বন্ধু আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে। শুধু আমার নয়, আমি দেখলুম, আমার চারিদিকেই মানুষ এই ভাবে মানুষের বুকে, বন্ধু এই ভাবে বন্ধুর বুকে, স্বামী স্ত্রীর বুকে, স্ত্রী স্বামীর বুকে

অবিশ্বাসের ছুরি হেনে চলেছে। তবে কি সমাজ, ধর্ম, স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া, যা কিছু শুনতে পাই, সব মিথ্যে? মানুষ তার আসল চেহারাটা এই সব রঙিন খোলস দিয়ে ঢেকে রেখেছে! সবাই সমান, শুধু সুযোগের অভাব! অবসর ও সুযোগ হ'লেই আপনা থেকেই তাঁর এই খোলস ঝ'রে প'ড়ে গিয়ে তার স্বরূপমূর্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে! অনেকদিন চিন্তার পর আমি স্থির করলুম, আমাদের সমাজ নারীর জন্যে যে ব্যবস্থা করেছে, তা ঠিকই করেছে। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণরা যে বিদ্যা ও বুদ্ধির দস্যুতা ক'রে অন্য সবাইকে পায়ের নীচে চেপে রেখেছিল, তা ঠিকই করেছিল। নিজে বাঁচতে হ'লে তা না ক'রে আর উপায় নেই। ব্রাহ্মণ যতদিন অন্য সবাইকে পায়ের নীচে রাখতে পেরেছিল, ততদিনই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ছিল। আমি নতুনপন্থীদের গালাগালি দিয়ে আমাদের দেশের সনাতন ব্যবস্থার স্বপক্ষে এক প্রবন্ধ লিখে ছদ্মনামে এক মাসিকে ছাপিয়ে বিপক্ষবাদীদের দ্বন্দ্বে আহ্বান করলুম।

আমার প্রবন্ধ প্রকাশ হবার পর আট-দশটা মাসিকে তার প্রতিবাদ প্রকাশিত হ'ল। সকলের প্রতিবাদের জবাব দিয়ে আবার আমি প্রবন্ধ লিখলুম। এই রকম ক'রে দুই পক্ষে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হ'ল। আমার শেষ প্রবন্ধের জবাব যিনি দিয়েছিলেন, তিনি একজন শক্তিশালী লেখক। তাঁর লেখা পড়ে মনে হ'ল, এতদিনে একজন প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছি। এই প্রবন্ধের জবাব দিতে আমাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আমি স্থির করেছিলুম, এর পরে আর লিখব না। আমার সমস্ত বুদ্ধিকে নিংড়ে এই প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। লেখা প'ড়ে নিজেরই মনে হতে লাগল, এর আর উত্তর হতে পারে না। নারীর প্রতি মমতার শেষ স্মৃতিটুকু মনে থেকে মুছে ফেলবার আগে, কি জানি কেন, একবার দেশে গিয়ে আমার বাড়িখানা দেখে আসবার ইচ্ছে

হ'ল। যেখানে আমার শৈশব কেটেছে, যে ঘরে আমি আমার প্রেয়সীকে নিয়ে এসে সুখের নীড় বাঁধবার আয়োজন করেছিলুম, ইহজীবনের সর্বোত্তম সুখ ও দুঃখ আমি যেখানে ব'সে পেয়েছি, আমার সেই খেলাঘরের ইটকাঠগুলো আমাকে তাদের কোলে আহ্বান করতে লাগল। আমি স্থির করলুম, দেশে গিয়ে একবার বাড়িটা দেখে এসে এই প্রবন্ধ ছাপতে দিয়ে সন্ন্যাস নোব।

৪

ঠিক পনরো বছর পরে।

পনরো বছর পরে আবার একদিন সন্ধ্যের সময় আমি আমাদের গ্রামের বাইরে এসে দাঁড়ালুম। ঠিক করেছিলুম যে, অন্ধকার হ'লে তারপর গ্রামের ভেতরে ঢুকব, তাই মাঠের মধ্যে দিয়ে যে লাল মাটির পথ এঁকে-বেঁকে দূরে বনের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে, তারই এক ধারে ব'সে অন্ধকারের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। আমার চোখের সামনে বনের ওপরে হোলি খেলতে খেলতে সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার গাঢ় হবার আগেই আমি উঠে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলুম।

গ্রামের আর সে শোভা নেই। রাস্তা অনেক জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। চারিদিকে জঙ্গল আর বিশ্রী গন্ধ। অনেকখানি পথ চ'লে আমি হাটতলার মাঠে এসে দাঁড়ালুম। সেখানে তখনও অনেকগুলো ছোট-বড় চালা দেখে বুঝতে পারলুম যে, এখনও সেখানে হাট বসে। হাটের এক দিকে একটা বিশাল বটগাছ ছিল, গাছটা প্রায় চারশো বছরের পুরনো। ডাল থেকে বড় বড় শেকড় নামিয়ে দিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে তখনও সে পুরোদমে সেখানে রাজত্ব করছিল।

আমরা যখন ছোট ছিলুম, তখন রোজ বিকেলে গ্রামের ছেলেমেয়েরা সকলে মিলে এই গাছের তলায় এসে লুকোচুরি খেলতুম, এর শেকড় ধ'রে দোল খেতুম।

চোরের মতন চুপেচুপে হাটতলার মাঠ পেরিয়ে চ'লে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে সেই বটগাছটা একটা আনন্দের চীৎকার ক'রে উঠল। তার লক্ষ পাতার হাতছানির আকর্ষণ আমি এড়াতে পারলুম না; অপরাধীর মত সেখান থেকে ফিরে ধীরে ধীরে তার তলায় গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই তার পল্লবে পল্লবে করতালি বেজে উঠতে লাগল। নানা রকম অঙ্গভঙ্গীতে সে এই পুরনো বন্ধুকে তার হৃদয়ের সম্ভাষণ জানাতে লাগল। সেখান থেকে চ'লে যাবার শক্তি আমার ছিল না, কিসের একটা মাদকতায় আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে পড়তে লাগল। আমি সেইখানেই ব'সে পড়লুম। নানা রকম চিন্তায় আমার হৃদয় ভ'রে উঠেছিল। এই গাছের তলায় আমাদের সন্ধ্যেগুলো কেমন ক'রে কাটত! আমি, শান্তি, নির্মল ও গ্রামের আরও অনেক ছেলেমেয়ে এইখানে ছুটোছুটি লুকোচুরি খেলে বেড়িয়েছি, আজ তারা সব কোথায়? আমার ছেলেবেলার সখা ও সখীরা, তারা কি সুখে আছে? তারা কি সবাই বেঁচে আছে? শৈশবে আমিই ছিলুম তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী। অভাব কাকে বলে, তা আমি কখনও জানতে পারি নি। আমার ধন ছিল, রূপ ছিল, বংশমর্যাদা ছিল। আমার যা ছিল, তা তো সবই আছে, জীবনপথে চলতে চলতে যা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম, তাই আমার হারিয়ে গিয়েছে; তাই আজ আমার মতন দুঃখী কে আছে? ওগো বনস্পতি! তুমি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এইখানে দাঁড়িয়ে আমার গ্রামের সবারই সুখ-দুঃখের সাক্ষী হয়ে আছ, আমার মতন দুঃখী কি আর দেখেছ?

খেলার সাথীর প্রতি সহানুভূতিতে গাছটা স্থির হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ সে চঞ্চল হয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আবার স্থির হয়ে দাঁড়াল।

কতক্ষণ সেই গাছটার তলায় ব'সে ছিলুম, তা বলতে পারি না, যখন সেখান থেকে উঠলুম, তখন রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর; পূব-আকাশে চাঁদটা ঢ'লে পড়েছে।

সেখান থেকে উঠে পায়ে পায়ে বাড়ি অবধি এসে পাঁচিল টপকে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়লুম। সারারাত বাতাসের সঙ্গে খেলা ক'রে চাঁদের ঘুমপাড়ানি-মন্ত্রে আমার বাগানের ফুলেরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত শিশুর মতন তালে তালে তাদের নিশ্বাস পড়ছিল; পাছে তাদের ঘুম ভেঙে যায়, তাই সন্তর্পণে আমি আমার ঘরের পেছন দিকটায় এসে দাঁড়ালুম। আমি বাড়িতে না থাকলেও আমার বাড়ি সেই রকমই ঝকঝক করছে, বাগানের যত্ন হচ্ছে দেখে আমার উদাস প্রাণেও একটা আনন্দের তরঙ্গ খেলে গেল! জন্মভূমির প্রতি মানুষের এই রকমই মায়া বটে!

বাড়ির সমস্ত জানলা বন্ধ ছিল। আমি আমার শোবার ঘরের জানলাটার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইলুম। বাতাসের বেগে বইয়ের পাতাগুলি যেমন তাড়াতাড়ি উল্টে যায়, আমার মনের ভেতর দিয়ে অতীত-জীবনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি তেমনই ভাবে উল্টে যেতে লাগল।

হঠাৎ শোবার ঘরের একটা জানলা খুলে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেলুম, জানলায় একটি রমণীমূর্তি! আমার কোন কর্মচারী খালি বাড়িতে এসে বাস করছে ভেবে আমি জানলার সামনে থেকে স'রে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালুম। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই

জানলাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে এবার বেরিয়ে পড়ব মনে করছি, এমন সময় দেখলুম, সেই নারীমূর্তি বাগানে নেমে এসেছে, সে আমার দিকেই আসতে লাগল। আর স'রে যাবার উপায় নেই দেখে আমি সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলুন। নারীমূর্তি ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। শান্তি!

আমার চোখের সামনে গাছপালা, বাগানবাড়ি, মাঠ সব যেন বনবন ক'রে ঘুরতে আরম্ভ করল। তারপর সব মিলিয়ে গিয়ে রইল কেবল—শান্তি।

শান্তি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। এই পনরো বছরে তার চেহারার কোনও পরিবর্তন হয় নি। বরং আমার মনে হচ্ছিল, যেন সে দেখতে আরও সুন্দরী হয়েছে। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। তাকে পনরো বছর দেখি নি, এই পনরো বছরে আমার জীবনের কত পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু শান্তি তো বেশ আছে!

কিছুক্ষণ পরে দেখলুম যে, শান্তির ঠোঁট যেন নড়ছে, সে কি বলছে, অথচ আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, শান্তি, আমায় কিছু বলবার আছে? শান্তি আমার কথার কোন উ না দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি আবার বললুম, আমি শুনেছিলুম যে, তুমি এখান থেকে বহুদূরে চ'লে গিয়েছ; যদি গিয়েছিলে, তবে আবার ফিরে এলে কেন?

এবার শান্তি বললে, আমি আমার স্বামীকে দেখতে এসেছি।

আশ্চর্য! আমি এতদিন আমার অস্তিত্ব সবার কাছ থেকে একেবারে গোপন ক'রে রেখেছিলুম। আমি কোথায় আছি, না আছি,

স কথা আমার একজন কর্মচারী ছাড়া আর কেউ জানত না। াকাকড়ির প্রয়োজন হ'লে তাকে জানাতুম, সেই কি শান্তির কাছে মামার কথা বলেছে? কিন্তু আজ রাত্রে এমন সময় আমি এখানে াকব, সে কথা সেই বা জানবে কি ক'রে? আমি একটু শ্লেষের াঙ্গে বললুম, যাক, শুনে সুখী হলুম যে, তুমি আমাকে দেখতে এসেছ। কিন্তু তুমি যাকে স্বামী বলছ, তুমি তো নিজেই তার সঙ্গে তোমার সে বন্ধন কেটে ফেলেছ।

কেন? তুমিই আমার স্বামী।

শান্তির কথা শুনে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। বলে কি! এত কাণ্ডের পর এখন আমাকে স্বামী ব'লে সম্ভাষণ করতে লজ্জা করছে না? নারীচরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়।

আমি বললুম, হ্যাঁ, আইনমত এখনও আমি তোমার স্বামী, কিন্তু র্মত বোধ হয়—

বোধ হয়? কেন, তুমি কি আবার বিয়ে করেছ?

বিয়ে! সর্বনাশ, আবার বিয়ে! না শান্তি, বিয়ে সেই একবারই করেছিলুম। জীবনে একজনকেই ভালবেসেছিলুম—তুমি। তুমি কি এখনও নির্মলকেই ভালবাস? না, প্রণয়ী বদল করেছ?

আমার কথা শুনে শান্তি থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। তার মাথার কাপড় খ'সে এল, খোঁপা পিঠে ঝুলে পড়েছিল। আমি মানুষকে ওরকম ভাবে কাঁপতে এর আগে কখনও দেখি নি। তার প্রত্যেক লটি পর্যন্ত কাঁপছিল। আমার মনে হ'ল, যেন তার শরীরের ওপর দিয়ে একটা প্রবল বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে চ'লে গেল। কাঁপুনিটা থেমে যাবার পর সে অতি করুণ সুরে বললে, ওগো, ওরকম ক'রে ব'লো না। তুমি জান না, তুমি বুঝতে পারবে না।

জানি না! বুঝতে পারি না! হ্যাঁ শান্তি, একদিন ছিল বটে, যখন কিছুই বুঝতে পারতুম না। আমি তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, আমি নিজের ভালবাসায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। তোমাকে হৃদয়ে বসিয়ে যখন আমি মনের মধ্যে স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করছি, সেই সময় তুমি আমার বন্ধুর প্রেমে মশগুল হয়ে আমার কাছ থেকে পালাবার বন্দোবস্ত করছিলে—আমি স্বীকার করছি যে, তখন সেটা বুঝতে পারি নি। তোমার অবহেলাকে সত্য অবহেলা ব'লে কখনও মনে করতে পারি নি, তাই বুঝতে পারি নি।

তবে তুমি কি সত্যিই মনে কর যে, নির্মল—

হ্যাঁ, আমি তাই বিশ্বাস করি। তুমি কি সে কথা অস্বীকার করতে চাও?

শান্তি স্থির হয়ে অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিলে, নিশ্চয়ই করি। জীবনে আমি একজনকে ভালবেসেছি, সে আমার স্বামী, সে তুমি। কিন্তু আমি যাকে ভালবেসেছি, তাকে কখনও অবিশ্বাস করি নি, সে কথা কখনও কল্পনা করতে পারি নি। তোমার অসুখের পর তুমি আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলে, তাতে আমি প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু নির্মল-ঠাকুরপো আমায় বুঝিয়েছিল যে, তোমার মাথার গোল হয়ে গিয়েছে, তাই তুমি অমন করছ। কি করলে তুমি ভাল হবে, কি ক'রে তোমায় সুস্থ করতে পারব, সেজন্যে আমি দিবারাত্রি তার সঙ্গে পরামর্শ করতুম। কিন্তু তুমি তখন আমাদের সেই পরামর্শকে কি চোখে দেখতে, তা মনে ক'রে দেখ। তারপর একদিন তোমার দপ্তর পরিষ্কার করতে করতে একখানা বিশ্রী চিঠি আমার চোখে পড়েছিল, সেই চিঠি পড়ামাত্র তোমার সমস্ত ব্যবহারের কারণ আমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল। বুঝলুম যে, তুমি

আমায় সন্দেহ কর। আমি সেই দিনই নির্মলকে সেই চিঠিখানা দেখিয়ে তাকে ব'লে দিলুম, তুমি এখান থেকে চ'লে যাও, আমার চোখের সামনে আর কখনও এসো না। সেদিন সে আমার কাছ থেকে চোখের জলে বিদায় নিয়ে গিয়েছে।

আমি তার কথায় বাধা দিয়ে বললুম, নির্মল কোথায় আছে এখন?

তা জানি না, তবে যাবার সময় সে ব'লে গিয়েছিল যে, মৃত্যুর পর যদি এ জীবনের শেষ না হয়, তা হ'লে সেই রাজ্যে আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে, তখন আমায় এমন ক'রে তাড়িয়ে দিও না বউদি। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি।

তারপর শাস্তি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, দেখ, প্রেম সব অত্যাচার সহ্য করতে পারে, কিন্তু প্রেম অবিশ্বাস সহ্য করে না। নির্মল চ'লে যাবার পর আমি আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস আনবার কত চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি আমায় বার বার তাচ্ছিল্য ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছ। শেষে আমি বেশ বুঝতে পারলুম যে, এরকম ক'রে তোমার প্রেমে বঞ্চিত হয়ে তোমার কাছে থাকার চেয়ে দূরে স'রে যাওয়াই মঙ্গল। তাই তোমাকে মুক্তি দিয়ে আমি তোমার কাছ থেকে চ'লে গিয়েছিলুম। তোমার সঙ্গে যদি আমার প্রেমের সম্পর্কই চুকে গেল, তখন কেবল তুমি আমায় বিয়ে করেছ—এই দাবিতে তোমার সুখ ও শান্তির অন্তরায় হয়ে এখানে বাস করতে আমার অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আমি স্থির করলুম, যেমন ক'রেই পারি, আমি নিজের ভরণপোষণ চালিয়ে নোব—যে কোন কাজই হোক না কেন। জীবনে তোমার প্রেমই ছিল আমার প্রধান সম্পদ, সেই সৌভাগ্য থেকে যখন চ্যুত হয়েছি, তখন আর আমার মানই বা কি? কিন্তু আমি ভুল বুঝেছিলুম। তোমার ওপর অভিমান

ক'রে চ'লে গিয়েছিলুম বটে ; কিন্তু তোমার প্রতি আমার ভালবাসা, তা যে অটুট ছিল, সেটা অনুভব করলুম তোমাকে ছেড়ে গিয়ে। এখান থেকে চ'লে গিয়ে দশটি দিন মাত্র আমি আমার এক বাল্যসখীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলুম। তুমি তাকে চেন, সে আমাদেরই গাঁয়ের মেয়ে। দশ দিন পরে ফিরে এসে দেখলুম, তুমি নেই।

ফিরে এসে যখন দেখলুম যে, তুমি নেই, তখন আমার মনে যে কি ক'রে উঠেছিল, তা তুমি বুঝতে পারবে না। সে কথা পুরুষ বুঝতে পারে না। তারপর প্রতি পল, প্রতি মুহূর্ত, প্রতি দিন ধ'রে এখানে ব'সে আমার আহ্বান আমি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছি—এস প্রিয়তম, ওগো মধুরপ্রিয়, ওগো প্রিয়মধুর, তুমি ফিরে এস, ফিরে এস। তুমি কার ওপরে অবিশ্বাস ক'রে চ'লে গিয়েছ ? ফিরে এস। আহ্বান কি তুমি শুনতে পাও নি ? কিন্তু আমি জানতুম যে, একদিন না একদিন তুমি ফিরে আসবেই, তোমাকে আসতেই হবে। সেই অপেক্ষায় আজও আমি এখানে ব'সে আছি।

শান্তি চুপ করলে।

আমার মনে হতে লাগল, যেন আমি আস্তে আস্তে মাটির মধ্যে নেবে যাচ্ছি। অসহায়ের মতন হাত দুখানা শান্তির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, শান্তি, এত দুঃখ আমি তোমায় দিয়েছি, আমায় ক্ষমা কর শান্তি। নিজের দোষে আমিও কম দুঃখ ভোগ করি নি।

শান্তির চোখ দিয়ে তখন টপটপ ক'রে জল পড়ছিল। সে কাঁদতে কাঁদতে বললে, সেইটেই যে আমার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ প্রিয়তম। তুমি বল, আমার ওপর আর তোমার অবিশ্বাস নেই।

ভুল, শান্তি, ভুল করেছি। আজ পনরো বছর এই ভুলের পেছনে ঘুরে ঘুরে পাগল হয়ে গিয়েছি। আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

জামার পকেটে আমার প্রবন্ধটা ছিল, সেটা টেনে বের ক'রে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলুম। শান্তি একবার অবহেলাভরে সে-দিকে চেয়ে দেখলে মাত্র, আমাকে কোনও প্রশ্ন করলে না।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, শান্তি, এতদিন তুমি একলা কোন্ ঘরে থাকতে? চল, আমাকে কেউ দেখতে পাবার আগে আমরা বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ি।

আমার কথা শেষ হতে না হতে শান্তি ফিরে বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আমাদের পুরনো বাড়ির একখানা বড় ঘর ছিল, ঘরখানা বাড়ি থেকে একটু দূরে আলাদা জায়গায় তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে বাজে জিনিসপত্র গুদামজাত করা থাকত। শান্তি আস্তে আস্তে এই ঘরখানায় এসে ঢুকল।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাকে বললুম, এত ঘর থাকতে শেষে তুমি এই গুদোমঘরে বাস করছ?

শান্তি কোনও কথা না ব'লে ঘরের মধ্যে স্তূপাকার জিনিসপত্রের ফাঁক দিয়ে রাস্তা ক'রে এগিয়ে চলতে লাগল। তারপর সে ঘরের এক কোণে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। আমি তার পেছনে পেছনে অগ্রসর হয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি, সেখানে একটা মানুষের কঙ্কাল প'ড়ে রয়েছে! ওপরের দিকে একটা ঝুল-মাখানো দড়ি ঝুলছে।

কিছুই বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এসব কি ব্যাপার শান্তি? এ যে আমি কিছুই বুঝতে—

কিন্তু শান্তি! কোথায় সে? মুহূর্তের মধ্যে সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

পলক ফেলতে না ফেলতে সমস্ত রহস্য আমার চোখের সামনে

জলজল ক'রে ফুটে উঠল। দুঃসহ বেদনায় ছুটে গিয়ে দাঁড়িগাছ ধ'রে আমি চীৎকার ক'রে উঠলুম, শান্তি!

জীর্ণ দড়ি পট ক'রে ছিঁড়ে গেল। আমি সেই কঙ্কালের ওপর ঘুরে প'ড়ে গেলুম। চোখের সামনে দিয়ে সেই উড়ো চিঠির অক্ষরগুলো বিদ্যুৎবর্ণে একবার চিকচিক ক'রে আমার চোখ ঝলসে দিয়ে মিলিয়ে গেল।

মায়ের অনুগ্রহ

চীনে হোটেলের ছোট্ট একটা খোপের মধ্যে উপেন আর মন্মথ মুখোমুখি ব'সে জিন খাচ্ছিল।

তাদের সামনে একটা ক'রে শূন্য পাত্র। মাঝখানে বড় একখানা তস্তরিতে একরাশ কড়া আলুভাজা। উপেন একটা সিগারেট ধরিয়ে মৌজ ক'রে তাতে আস্তে আস্তে টান দিচ্ছিল, আর মন্মথ তস্তরি থেকে মধ্যে মধ্যে আলুভাজা তুলে নিয়ে দাঁতে কাটছিল।

আশপাশের ছোট বড় খোপ থেকে নানা দেশের নরনারীর বুকনির এক-আধটা টুকরো ছিটকে তাদের কানে এসে লাগছিল।

শনিবারের সন্ধ্যেটা খুব জ'মে উঠেছিল।

মন্মথ খানিকক্ষণ উপেনের দিকে চেয়ে থেকে ব'লে উঠল, মাইরি, মায়ের নিগ্রহ হয়ে তোর চেহারাটা একদম মাটি ক'রে দিয়েছে।

উপেন সিগারেটে একটা জোর দম লাগিয়ে বললে, চেহারা be damned, মায়ের নিগ্রহ যদি আর এক দিন পরে আমায় আক্রমণ করত, তা হ'লে প্রাণ দিতেও আমার আপত্তি ছিল না। আমার জীবনে সেইটেই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

মন্মথ বললে, সে আবার কি রকম?

আরে, তা জান না বুঝি? বলি নি তোমায়?

কই, না।

বল কি হে? তবে শোন, বলি।

মন্মথ বললে, তবে আর একটা ক'রে জিন দিয়ে যেতে বলি?

উপেন বললে, জিন তোমার ঘোড়ার পিঠে চাপিও, আমায় এক

পেগ হুইস্কি দিতে বল। বাবা, বিলেত থেকে ঘুরে এলে, অথচ হুইস্কি খেতে শিখলে না? আরে ছিঃ!

মন্মথ বললে, আমার লিভারে হুইস্কি সহ্য হয় না, ওইটেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

মন্মথ হাঁকলে, আ চুং!

হাস্যমুখে একটি চীনে যুবক তাদের ঘরে প্রবেশ করতেই সে বললে, এক পেগ হুইস্কি আর এক পেগ জিন।

হুইস্কির গেলাসে একটি চুমুক মেরে উপেন বলতে লাগল, তোরা তখনও বিলেত থেকে ফিরিস নি, সে বছর মাঘ মাস কাবার হতে না হতে শহরের চারিদিকে ভয়ানক বসন্ত শুরু হ'ল। হঠাৎ এই রকম বসন্তের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার অভিভাবকেরা তার কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে গবেষণা করতে ব'সে গেলেন। অনেক তদন্ত ক'রে তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে, প্রত্যেক পাঁচ বছরে শহরে বসন্ত-রোগের এই রকম বাড়াবাড়ি হয়। অতএব এই একটা বছর কোন রকমে চোখ-কান বুজে ওষুধ গেলার মত যদি বেঁচে যেতে পার, তা হ'লে পরের চারটে বছর বসন্ত-রোগে মরবার ভয় অপেক্ষাকৃত কম থাকবে। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তারা শহরের চারিদিকে বসন্ত-রুগীর বড় বড় প্ল্যাকার্ড মেরে দিয়ে টিকের বিজ্ঞাপন দিতে লাগলেন। বসন্ত যে সামান্য রোগ নয়, তা বোঝাবার জন্যে বেচারারা যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেছিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যে শহরে একটা হুলস্থূল কাণ্ড লেগে গেল। আজ যার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি, কাল তার বাড়িতে গিয়ে শুনি যে, তার গায়ে গুটি বেরিয়েছে, দিন দশেক যেতে না যেতেই সে ব্যক্তি স'রে পড়েছে।

ঠনঠনের শীতলা-তলায় পূজোর আর বিরাম নেই। দিন কয়েকের মধ্যেই সেই মান্ধাতার আমলের ছাত-ফুটো ভাঙা মন্দির মেরামত হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, কে একজন মাড়োয়ারী মন্দিরের চাতাল, সিঁড়ি, সব মার্বেল-পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে।

আমাদের মেস ছিল তখন একটা সরু গলির ভেতর ভদ্রপল্লীর মধ্যে। বাসার চারিদিকে গৃহস্থের বাড়ি। অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে একটু জিরোতে না জিরোতেই পুরাতন ভৃত্য রামদাস এসে খবর দিতে লাগল, বাবু, আজ ও-বাড়িতে মায়ের আগমন হয়েছে।

যাদের বাড়িতে বসন্ত হয়, তারা দিন দুয়েক ধ'রে শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে পূজোর নাম ক'রে রোগ তাড়াতে চেষ্টা করে, তারপরে দিন কয়েক ধ'রে রুগীর কাতরানি, তারপরে একদিন কান্নার রোলে পাড়া কেঁপে ওঠে।

পাড়ার সবার মুখেই একটা সন্ত্রস্ত ভাব, কখন কাকে ধ'রে! সকলেই ধীরে ধীরে কথা কয়, কথায় কথায় ওপর দিকে আঙুল তুলে দেখায়, অতি সন্তর্পণে বলতে থাকে—মায়ের অনুগ্রহ।

তোমায় বলব কি, মাস-খানেকের মধ্যে সমস্ত জাতটাই ধার্মিক হয়ে উঠল।

দেবতাকে ঘুষ দেবার ঠেলায় বাজারে সন্দেশের দর আক্রা হয়ে গেল।

আমাদের বাসার কাছাকাছি তিন বাড়িতে বসন্ত হয়েছিল। দিনের বেলা তো আপিসেই কাটত। রাত্রি এগারোটা বারোটা অবধি আড্ডা দিয়ে বাড়িতে ফিরে একটু গা গড়াবার উপক্রম করছি, আর রুগীর কাতরানি—বাবা গো, আর পারি না গো—

একদিন আপিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরেছি; বাসায়

তখনও কেউ ফেরে নি, ছাতের ওপর ব'সে একটু আরাম করছি, এমন সময় রামদাস এসে খবর দিলে—ঘোষেদের বাড়িতে মা এসেছেন। সেই মেয়েটির—

ঘোষেদের বাড়িটা একেবারে আমাদের লাগা বললেই হয়, মাঝে একটা সরু গলির ব্যবধান মাত্র। তাদের জানলা খুললে আমার ঘর থেকে বাড়ির ভেতর পর্যন্ত দেখা যেত। কদিন থেকে দেখছিলুম, ওদের বাড়ির একটি মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসেছে। বাপের বাড়িতে এসে সমস্ত বাড়িখানাকে সে আনন্দে মাথায় ক'রে রেখেছিল। আহা! মেয়েটির জন্যে বড় কষ্ট হতে লাগল।

মায়ের অনুগ্রহটা যতক্ষণ দূরে দূরে ঘুরছিল, ততক্ষণ আমাদের বাড়িতে কোন সাড়াই পড়ে নি। কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ একেবারে আমাদের গর্দান পর্যন্ত নেমে আসতেই বাড়ি ছেড়ে যে যার লম্বা দিলে। আমরা তিনজন, বসন্তে মরার চেয়ে অনাহারে মরবার ভয় যাদের বেশি, তারাই শুধু র'য়ে গেলুম।

আমার ঘরে একা আমি ছাড়া আর কেউ নেই। রাত্রে রুগীর কাতরানি শুনে আঁতকে উঠি; বাড়িতে আরও যে দুজন ছিল, তারা মাঝে মাঝে অন্যত্র রাত কাটায়; প্রভুভক্ত রামদাস আর আমি মায়ের অনুগ্রহের প্লাবনের ওপর আমাদের জীর্ণ জীবন-তরী নিয়ে টাল-মাটাল খেতে লাগলুম।

কিছুদিন এই ভাবে কাটবার পর আমার পুরাতন অনিদ্রা-রোগ আবার চেপে ধরল। রাতে ঘুম হয় না, আপিসে গিয়ে ঘুমোলে বড়বাবু এমন বেসুরো চীৎকার করতে থাকে যে, স্বয়ং নিদ্রাদেবীর পক্ষেও তা সহ্য করা শক্ত। অনেক দেখে-শুনে শেষকালে এক মতলব আবিষ্কার করা গেল। এগারোটার পর সিধে বাড়ি না ফিরে দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা ধ'রে

শহরময় ঘুরে শরীরটাকে এমন অবসন্ন ক'রে নিয়ে আসতে লাগলুম যে, বিছানায় পড়তে না পড়তে ঘুম আসত।

সেদিন ছিল শনিবার। রাত্রি প্রায় দেড়টা অবধি হনহন ক'রে শহরটা টহল মেরে বাড়িতে ঢোকবার আগে গলির মোড়ে সদর-রাস্তার ওপর একটা রকে ব'সে সিগারেট টানছি, রাস্তায় একটা লোক নেই, কিছুক্ষণ আগে রাস্তা মাতিয়ে একদল লোক মড়া নিয়ে গেছে, দূর থেকে তাদের চীৎকার বাতাসে উড়ে এসে আমার কানে লাগছিল। মৃদু বাতাস আমার অবসন্ন শরীরটাকে রাস্তাতেই ঘুম পাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে; উঠব মনে করছি, এমন সময় আমার পাশ দিয়ে দুটি রমণীমূর্তি চ'লে গেল।

সেই রাত্রে জনপ্রাণীহীন রাস্তায় নারীমূর্তি দেখে আমার জড়তা তখনই ছুটে গেল। পেছন থেকে তাদের পা দেখে যতটা বুঝতে পারা গেল, তাতে মনে হ'ল যে, তাদের মধ্যে একজন তরুণী, অপর জন বৃদ্ধা। তরুণীর বর্ণ গৌর।

ব্যাপার কি! জামাটা খুলে কাঁধে ফেলে রেখেছিলুম, তখনই সেটা পরতে পরতে এগিয়ে এসে একটা গ্যাসের কাছে দাঁড়ালুম। তারা আমার পাশ দিয়ে চ'লে গেল। গ্যাসের আলোতে তরুণীকে দেখলুম, বেশ দেখতে সে। সে আমার রকম দেখে আমার মুখের দিকে চেয়ে যেন একটু হেসে মুখখানা ফিরিয়ে নিলে।

বুকের মধ্যে কে যেন হাততালি দিয়ে ব'লে উঠল, বাস্, হেসেছে যখন—

আমি তাদের অনুসরণ করতে লাগলুম।

চলেছি তো চলেইছি। চলার যেন আর অন্ত নেই। বাঙালীর মেয়ে যে এত জোরে চলতে পারে, রাত-বেড়ানোর ইতিহাসে সে অভিজ্ঞতা

ইতিপূর্বে আমার আর হয় নি। চলতে চলতে মাঝে মাঝে একবার তরুণীর পাশে গিয়ে পড়ি, সে বিলোল কটাক্ষে আমার দিকে চেয়ে হাসে, তখনই আবার সন্ত্রস্ত হয়ে বৃদ্ধার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার রকম দেখে কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পারি না। সে কি ভদ্রলোকের মেয়ে? চেহারা দেখে তো ভদ্র ব'লেই মনে হয়। কিন্তু ভদ্রলোকের মেয়ের পক্ষে আর একজন পুরুষকে এই রকম কটাক্ষ করা—তাই বা কি ক'রে সম্ভব হতে পারে? মনের মধ্যে চিন্তার রাশি তালগোল পাকাতে লাগল বটে, কিন্তু পা দুখানা আমার সমান চালে কাজ করছিল।

বৃদ্ধা তরুণীর সঙ্গে সমান তালে চলতে পারছিল না। কখনও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, কখনও সঙ্গে চলে, আবার কখনও বা দশ হাত পিছিয়ে পড়ে।

এমনই ক'রে প্রায় ঘণ্টাখানেক পথ চলার পর বৃদ্ধা যেই একটু এগিয়েছে, সেই সুযোগে আমি তরুণীকে ব'লে ফেললুম, আর কতদূর ভাই? সারারাত্রি কি আজ পথে পথেই ঘুরবে?

তরুণী দ্বিধাহীনভাবে আমার কথার উত্তর দিলে, এই যে, আর বেশি নেই, এই মোড়টা—

ঠিক সেই সময় বৃদ্ধা পেছন ফিরে দেখতে পেলে যে, তরুণী আমার সঙ্গে কথা বলছে। তার সেই বিশ্রী তোবড়ানো মুখের কুঞ্চনগুলো বিস্ময়ে এক অদ্ভুত আকার ধারণ করল। বৃদ্ধা দু পা পেছনে এসে তরুণীর পাশে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও সিগারেট ধরাবার জন্যে দাঁড়িয়ে গেলুম।

বৃদ্ধা একটু উচ্চকণ্ঠে তরুণীকে কি বললে, শুনতে পেলুম না; তরুণী কিছু বললে কি না, তাও বুঝতে পারা গেল না।

আবার চলা শুরু হ'ল। চলার আর বিরাম নেই। জনশূন্য রাস্তা, মধ্যে মধ্যে গ্যাসের থামগুলো পাহারার মতন চোখ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে হেঁটে হেঁটে আমার হাঁটু দুটো ভেঙে পড়বার যোগাড়। এক জায়গায় এসে আবার একটা সুবিধে উপস্থিত হওয়ায় তাকে বললুম, আমি তা হ'লে চললুম, আর চলতে পারছি না।

তরুণী বললে, আর একটু চল না, এই তো এসে পড়েছি। দেখ, ওই লোকটা অনেকক্ষণ থেকে আমাদের পেছু নিয়েছে, ওকে তাড়াতে পার?

হঠাৎ বৃদ্ধার কর্কশ কণ্ঠে চমকে উঠলুম। সে বললে, বউমা, ও কি হচ্ছে? ওইজন্যেই তোমায় নিয়ে রাস্তায় বের হতে চাই নি।

বৃদ্ধার কথায় কান না দিয়ে অগ্রসর হলুম। দু-এক পা চ'লেই দেখি, ও ফুটপাথ দিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে ঘেঁষে একটা লোক এগিয়ে চলেছে। লোকটাকে এতক্ষণ একেবারে দেখতে পাই নি। আমি অন্য ফুটপাথে গিয়ে কোন রকমের ভণিতা না ক'রে একেবারে তার হাত চেপে ধ'রে বললুম, রাস্কেল, ভদ্রলোকের মেয়েছেলের পিছু নেওয়া! যাও, নিজের কাজে চ'লে যাও।

লোকটা বোধ হয় আমার কথার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে সে অবসর না দিয়ে আবার বললুম, এখান থেকে এক পা এগিয়েছ কি ছুরি দিয়ে পেট ফাঁসিয়ে দিয়েছি। খলিল গুণ্ডার নাম শুনেছ? বাঁচতে চাও, স'রে পড়।

লোকটা অবাক হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল; আমি ছুটে রাস্তা পার হয়ে আবার তাদের অনুসরণ করতে লাগলুম। একবার ফিরে দেখলুম, লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

আরও অনেকক্ষণ চলার পর তারা একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকল।

দু পা গিয়েই বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে চারপাশের বাড়িগুলো দেখতে লাগল। তার রকম দেখে মনে হ'ল, যেন তারা ভুল ক'রে এই গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

ঠিক সেই সময় বড় রাস্তায় একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। গাড়ির ভেতর থেকে একটা লোক চেঁচিয়ে গাড়োয়ানকে বলছিল, এই গলি, এই গলি।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে না দেখতে গাড়িটা গলির মধ্যে ঢুকে একেবারে আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়বার উপক্রম করল। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি গাড়ির একপাশে গিয়ে দাঁড়াল। আমি আর তরুণী অন্য পাশে রইলুম।

গাড়ির মধ্যে দেখি, সেই লোকটা। সে আর পায়ে না হেঁটে একখানা গাড়ি ভাড়া করেছে। সে একদৃষ্টে তরুণীর দিকে তাকিয়ে ছিল, আমার চোখে চোখ পড়তেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

তরুণী এবার আগে আমায় বললে, বড় কষ্ট হয়েছে তোমার, না?

কষ্ট যে হচ্ছিল, তা আর প্রকাশ করবার নয়—যেমন দেহে, তেমনই মনে। তবু বলতে হ'ল, না, কষ্ট কিসের? আর কতদূর?

তরুণী হেসে বললে, এই যে এবার ঠিক এসে পড়েছি।

ঠিক সেই সময় রাত্রির অন্ধকার তোলপাড় ক'রে চীৎকার উঠল, ব্যায়লা হায়রি হায়রি বোওওল।

শ্মশান-যাত্রীদের সেই বীভৎস চীৎকারে আমার বুকের ভেতরটা ছাঁত ক'রে উঠল। নিজেকে সামলে নেবার আগেই তরুণী "বাবা গো" ব'লে একটা অস্ফুট চীৎকার ক'রে দু হাত দিয়ে একেবারে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে বোধ হয় এক মিনিটের বেশি সময় লাগে নি।

গাড়ির ভেতর থেকে সেই লোকটা গলা বাড়িয়ে আমাদের দুজনকে সেই অবস্থায় দেখে হতাশভাবে ধপাস ক'রে ব'সে পড়ল।

গাড়িখানা গড়গড় ক'রে এগিয়ে গেল। তরুণীর একখানি শিথিল হাত তখনও আমার কাঁধের ওপর প'ড়ে ছিল। গাড়িখানা স'রে যেতেই বৃদ্ধা আমাদের সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে আমায় একটা বিশ্রী গালাগালি দিয়ে বললে, চল, তোমায় দেখছি।

তার কথা শুনে ক্রোধে আমার সমস্ত শরীর জ্বলতে লাগল। ইচ্ছে হচ্ছিল, তার গলাটা টিপে সেইখানেই শেষ ক'রে ফেলি। আমার প্রতি বক্তব্য শেষ ক'রে সে তরুণীকে বললে, রাস্তার মাঝে খুব ঢলানটাই ঢলালে যা হোক! চল, এ গলি নয়।

তারা গলি থেকে বেরিয়ে আবার বড় রাস্তায় প'ড়ে চলতে লাগল। সেই যে লোকটা গাড়ি নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, গলিটা সরু ব'লে কোচোয়ান আর গাড়ি ঘোরাতে পারলে না। গাড়ি সিধে গলির মধ্যে ঢুকে গেল। লোকটা একবার উজবুকের মত জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে শেষ দেখা দেখে নিলে।

বড় রাস্তায় প'ড়ে আবার চলা শুরু হ'ল। কারও মুখে কোন কথা নেই। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলেছি। আমার মনে হতে লাগল, আমি যেন এই ধরার প্রথম পুরুষ, প্রথম-নারী-দরশ-মুগ্ধ আমার মন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে যার পেছনে—কে সে নারী? কোথায় সে যাবে? কেন যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি, কিছুই জানি না। যুক্তি-তর্ক কিছুই নেই। নারীর পশ্চাতে পুরুষ এই ভাবেই ছুটতে থাকবে—নারী ও পুরুষের সৃষ্টিকর্তার এই বিধান। নারী ও পুরুষের মাঝে বিশাল সংসার বার বার বাধার দেওয়াল তুলে দেবার চেষ্টা করছে, ওই বিশ্রী বুড়ীটা যেন তারই চিহ্ন।

চিন্তা করতে করতে কতক্ষণ কেটে গেল। কত গলি পার হয়ে গেলুম, কিছুই দেখি নি। হঠাৎ তরুণী এক জায়গায় এসে দাঁড়াল। বুড়ী বললে, আবার কি হ'ল? দাঁড়ালে কেন?

আমি তার কাছে এসে দাঁড়াতেই সে আমায় চুপিচুপি বললে, কাল রাত্রি এগারোটার পর আমাদের বাড়ির নীচে এসে দাঁড়িও, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। বল, আসবে?

আমি বললুম, নিশ্চয় আসব।

তরুণী বললে, তোমার জন্যে ওপরে একটা জানলায় আমি অপেক্ষা করব।

বুড়ী বোধ হয় আর সহ্য করতে পারলে না। সে চেঁচিয়ে উঠল, ধন্যি মেয়ে যা হোক!

তরুণী আর কিছু না ব'লে এগিয়ে চলল। কিছুদূর গিয়ে তারা একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। ঢোকবার সময় সে আমাকে ইশারা ক'রে চ'লে যেতে বললে।

তারা ভেতরে চ'লে গেলে আমি তাদের বাড়িখানা ভাল ক'রে দেখতে লাগলুম। দোতলায় সারি সারি তিন-চারটে জানলা। ঊর্ধ্বমুখ হয়ে জানলাগুলো দেখছি, এমন সময় বুড়ীর কণ্ঠস্বর কানে গেল—এই যে, এখনও দাঁড়িয়ে আছে!

ওপরের একটা জানলায় সাদা মতন কি একটা দেখা গেল। কিন্তু সেদিকে দেখবার আর অবসর ছিল না। নীচে চোখ নামিয়ে দেখি, তাদের রকের ওপর দুটো ষণ্ডা লোক লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে।

লোক দুটোকে দেখেই আমার শ্রান্ত লকবগে পা দুটোতে কে যেন

স্প্রিঙের দম লাগিয়ে দিলে। এক মুহূর্ত আর সেখানে অপেক্ষা না ক'রে দৌড় দিলুম।

দূর থেকে 'মারো মারো, পাহারওয়ালা, খুন করব' ইত্যাদি নানা প্রকার শ্রবণের পীড়াদায়ক কথা উড়ে আমার কানে এসে পৌঁছতে লাগল।

দৌড়! দৌড়! দৌড়! আড়াই ঘণ্টা ধ'রে যে পথটা তাদের পেছন পেছন গিয়েছিলুম, ঠিক পনরো মিনিটে সেই রাস্তা পার হয়ে ফিরে এলুম। বাড়িতে এসে বিছানায় পড়তে না পড়তে ঘুম। সমস্ত ব্যাপারটা ভাল ক'রে চিন্তা করবারও অবসর হ'ল না।

রবিবার সকালে রামদাস যখন এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল, তখন বোধ হয় বেলা দশটা। সর্বাঙ্গে দারুণ বেদনা, মাথাটা এত ভারী যে, তুলতে কষ্ট হতে লাগল। বিছানায় উঠে ব'সেই মনে হ'ল, যা থাকে কপালে, আজ দেখা করতে যেতেই হবে। খাট থেকে নেমে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই নিজের দেহের দিকে চেয়ে দেখি, সর্বনাশ! বসন্তে আমার সর্বাঙ্গ ছেয়ে গিয়েছে।

তারপর প্রায় দু মাস ধ'রে যমে-মানুষে টানাটানি। সে ইতিহাস আর শুনে কি হবে!

নিজের গায়ের বিকট গন্ধে দম বন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়তুম। স্বপ্ন দেখতুম যে, সেই তরুণী তার অঞ্চল ভ'রে সৌরভ এনে আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

একদিন—রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর, রোগের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে আমি পরনের কাপড়খানা কড়িকাঠে ঝুলিয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করবার উদ্যোগ করছি, ঘরের মধ্যে কেউ নেই, দরজাটা খোলা রয়েছে, গলায় ফাঁস পরাচ্ছি, এমন সময় স্পষ্ট দেখলুম, সেই তরুণী ছুটে এসে আমার হাতখানা ধ'রে দাঁড়াল।

সে বললে, এ কি করছ ?

রোগের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় আমি তাকে এতবার দেখেছি যে, তার ঐই আসাটা আমার কাছে যেন খুবই স্বাভাবিক ব'লে মনে হ'ল।

আমি বললুম, আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না, দু দিন বাদে তো ম'রেই যাব, কেন এত কষ্ট সহ্য করি ?

সে বললে, তবে! তোমাকে যে আমার অনেক কথা বলবার আছে। আমার কথা না শুনেই মরবে ?

মনে হ'ল, তাই তো সুন্দরী, তোমার কথা না শুনে কি ক'রে মরি ?

আমি বললুম, কবে তুমি তোমার কথা বলবে ?

সে হেসে বললে, তুমি সেরে ওঠ, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

আত্মহত্যা করা হ'ল না, আবার বিছানায় প'ড়ে ছটফট করতে লাগলুম।

রোগ সেরে যাবার পর প্রথমেই আমি সেই সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু দেখলুম যে, সে বাড়ি ভেঙে ট্রামের আস্তাবল বাড়ানো হচ্ছে। সেখানে কত খোঁজ করলুম, কিন্তু কেউ তার সন্ধান দিতে পারলে না। তারপর কয়েকটা বছর ধ'রে তার দেখা পাবার আশায় সারারাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু দেখা পাই নি।

জীবনে তারপর অনেক সুন্দরীর অনেক কথা শুনেছি, হয়তো আরও অনেকের অনেক কথা শুনতে হবে। কিন্তু সেদিন রাতের সেই অপরিচিত সুন্দরী আমায় যে কি বলতে চেয়েছিল, সে কথা চিরকাল রহস্যের আবরণেই ঢাকা রইল।

উপেন চুপ করতে মন্মথ বললে, তোমার পলাতকা সুন্দরীর উদ্দেশ্যে এক পেগ হুইস্কি খাওয়া যাক। এই বো-ই, দোঠো বড়া পেগ হুইস্কি।

কবির মেয়ে

বৎসর দুই-একের মধ্যে আমাদের দলের তিন-চারিজন আড্ডাধারী যখন সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেল, তখন আমরা দস্তুরমত শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম। গেরুয়া না পরিলেও ত্যাগে আমরা গেরুয়াধারী অপেক্ষা কম ছিলাম না। আর এই পার্থিব জগতে আড্ডা দেওয়া হইতে যে অপার্থিব সুখ আর নাই, এ কথার ব্যবহারিক পরিচয় দিয়া অনেক গৃহবিমুখ সন্ন্যাসীকেও আমরা আড্ডামুখী করিয়া তুলিয়াছি। এ-হেন আড্ডা ছাড়িয়া লোক কি সুখে সন্ন্যাসী হইতে চাহে, এ সমস্যার মীমাংসা কিছুতেই করিতে না পারিয়া আমরা সকলেই মন-মরা হইয়া দিন কাটাইতেছিলাম, এমন সময় একদিন সংবাদ পাওয়া গেল যে, আরও একটি বড় স্তম্ভ খসিয়া গিয়াছে; অর্থাৎ কিনা আমাদের দীনবন্ধু হঠাৎ সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে।

ভাঙা আড্ডা কোনরূপে চলিতে লাগিল। বছর দুই-তিন আশায় আশায় থাকিয়া পলাতক আড্ডাধারীদের ঘরে ফেরা সম্বন্ধে যখন আমরা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি, এমন সময় একদিন দীনবন্ধু হৈ-হৈ করিয়া আড্ডায় উপস্থিত।

সংবাদ কি?

কোথায় ছিলি এতদিন?

গেরুয়া গেল কোথায়?

ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছিল বুঝি?

চারিদিক হইতে তাহার উপরে সহস্র প্রশ্নের বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

দীনবন্ধু বলিল, সন্ন্যাসী হয়েছিলুম ভাই।

সুরেশ বলিল, সে তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু সন্ন্যাসীই যদি হলি, তবে ফিরলি কেন?

দীনবন্ধু বলিল, ওরে বাবা! সংসারীর চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার ফ্যাসাদ বেশি।

মহেন্দ্র-দাদা বলিল, সেইজন্যেই তো পৃথিবীতে সংসারী লোক বেশি, আর সন্ন্যাসী কম। এই কথাটা বোঝবার জন্যে অত কষ্ট করলে কেন? আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো এর উত্তর পেতে।

দীনবন্ধু বলিল, মহেনদা, উত্তরের অভাব হ'লে নিশ্চয়ই তোমার কাছে যেতুম, কিন্তু তখন আমার যা প্রয়োজন হয়েছিল, তা উত্তরের একেবারে বিপরীত। আর সে জিনিস অন্তত তোমার কাছে পাওয়া যেত না।

মহেন্দ্র বলিল, কি হয়েছিল, বল তো?

দীনবন্ধু বলিল, পৈতৃক বাড়িখানা বাঁধা পড়েছিল, জান তো? পাওনাদাররা নালিশ ক'রে বাড়িখানা বিক্রি ক'রে নিলে। এর পরে আর স সারে টান থাকে? তুমিই বল?

মহেন্দ্রদা বলিল, সংসার-সমুদ্রে অর্থই হ'ল সব থেকে বড় নোঙর, তারই শেকল যখন ছিঁড়ে গেল, তখন কিসে আর ধ'রে রাখবে, বল? কিন্তু আবার ফিরে এলে কিসের টানে, বল দেখি? ছোট ছোট নোঙর কোথাও ফেলবার চেষ্টায় আছ নাকি?

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিল, না দাদা, আর নোঙরে কাজ নেই। এই রকম ভেসে ভেসেই বেড়াব।

সুরেশ বলিল, আচ্ছা, বেরিয়েই বা গেলে কেন, আর ফিরেই বা এলে কেন?

দীনবন্ধু বলিল, বেরিয়ে যাবার কারণ তো বলেছি। অবিশ্যি ফিরে আসবারও কারণ একটা আছে।

দীনবন্ধুকে সকলে চাপিয়া ধরিলাম, কারণ বলিতেই হইবে। তাহারও বিশেষ আপত্তি ছিল না। সে আরম্ভ করিল—

তোমাদের তো আগেই বলেছি, পৈতৃক আর স্বোপার্জিত পাওনাদাররা মিলে ভিটেখানা বিক্রি করালে। তখন আমার হাতে আছে মোট তিপ্পান্ন টাকা আর কয়েক আনা পয়সা। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ব'সে ব'সে ভাবলুম, কি করা যায়! যেমন বাজার, তাতে চাকরি-বাকরির সুবিধে কোথাও হবে না। ওদিকে তিপ্পান্ন টাকা ফুরোবার আগে যে উদরযন্ত্রের দাবিও ফুরিয়ে যাবে, এমন কোনও আশা নেই। এই সব নানা দিক ভেবে ঠিক ক'রে ফেললুম, সন্ন্যাসীই হওয়া যাক। যাঁহাতক মনে হওয়া, অমনই আনা-দুয়েকের লাল মাটি কিনে এনে দুখানা ধুতি গেরুয়া রঙে ছেপে ফেলা গেল। তার পরদিন দুপুর-বেলায় হরিদ্বারের গাড়িতে সন্ন্যাস-যাত্রা।

হরিদ্বারে গিয়ে তো পৌঁছলুম, কিন্তু গুরু আর খুঁজে পাই না। অনেকে পরামর্শ দিলে যে, হিমালয়ে অনেক ভাল ভাল সন্ন্যাসী আছেন, সেখানে গিয়ে কারুর কাছ থেকে দীক্ষা নাও।

হিমালয়ের দিকেই যাত্রা করা গেল। সমস্ত দিন চলি আর রাত্রে কোন চটিতে আশ্রয় নিই। পথে লোকজনের সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা করি, ভাল সন্ন্যাসী কোথায় আছে? তাদের নির্দেশমত কোনও মঠে গিয়ে উঠি। কোথাও বা যাওয়ামাত্র তাড়িয়ে দেয়, কোথাও বা দু দিন বাদে ব'লে দেয়, তোমাকে দীক্ষা দোব না। সেখান থেকে বেরিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করি।

এই রকম প্রায় মাস-খানেক পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে একদিন এক

সন্ন্যাসীর আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। এঁর নাম জীবানন্দ। হরিদ্বারে থাকতেই খুব উচ্চদরের সাধক ব'লে এঁর নাম শুনেছিলুম। ছোট্ট একটি উপত্যকার মধ্যে এঁর মঠ। তিন-চারখানি ঘর, তাতে গুটি দুয়েক শিষ্যকে নিয়ে তখন বাস করছিলেন।

সন্ন্যাসীকে গিয়ে প্রণাম ক'রে বললুম, বাবা, আমার মনে বড় অশান্তি, তাই আপনার আশ্রয়ে এসেছি।

সন্ন্যাসী স্মিত হাস্যে বললেন, বেশ করেছ, এখানে থাক। শান্তিময় এই স্থান, শান্তি পাবে।

সেখানে দু-তিন দিন থাকার পর একদিন বিকেলবেলা তাঁকে একলা পেয়ে আমি ব'লে ফেললুম, বাবা, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আপনি আমায় দীক্ষা দিন।

আমার কথা শুনে সন্ন্যাসীর চোখ দুটো হঠাৎ লাল টকটকে হয়ে উঠল। আমি তাঁর পদসেবা করছিলুম, তিনি পা গুটিয়ে নিয়ে উঠে ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বললে?

স্বামীজীকে হঠাৎ অমন উত্তেজিত হতে দেখে আমি থতমত খেয়ে গিয়েছিলুম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি, কি বললে?

এবার আমি সাহস সঞ্চয় ক'রে ব'লে ফেললুম, আপনার কাছে আমি দীক্ষা নিতে এসেছি। আমি সংসার ত্যাগ—

স্বামীজী সেই সুরেই বললেন, কে তোমাকে সংসার ত্যাগ করতে বলেছে? আমার কাছে আসতেই বা কে বলেছে?

কোনও জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী আবার বললেন, আমি মনে করেছিলুম, তুমি এখানে বেড়াতে এসেছ, কিছুদিন থেকে মনটা ভাল হ'লে ফিরে যাবে। এই ভেবেই তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলুম।

জানই তো, এরকম ধরনের কথা কোন দিনই সহ্য করা আমার অভ্যেস নেই। তবুও, সন্ন্যাসী লোক, তাকে কিছু বলব না মনে ক'রে এতক্ষণ চুপ ক'রেই ছিলুম। কিন্তু আর সহ্য করা সম্ভব হ'ল না। ব'লে ফেললুম, আশ্রয়ের আমার এমন অভাব হয় নি যে, সেজন্তে এই পাহাড়-পর্বত ভেঙে আপনার কাছে আসতে হবে।

আরও একটু কড়া কথা বলতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু স্বামীজী তার আগেই একটি প্রকাণ্ড ধমক ছেড়ে বললেন, তবে ওঠ্। এই মুহূর্তেই এখান থেকে দূর হয়ে যা।

চীৎকার শুনে শিষ্য দুজন ছুটে এল। স্বামীজী তাদের বললেন, এখুনি একে মঠের চৌহদ্দি পার ক'রে দিয়ে এস।

আমি তখনই উঠে পড়লুম। শিষ্য দুজন আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে একটা রাস্তা দেখিয়ে বললে, এই পথ ধ'রে যাও, কেদারে পৌঁছবে। রাস্তা দুর্গম, একটু সাবধানে যেও। পথে যাত্রী দেখলে তাদের সঙ্গ নিও, অসুবিধে হবে না।

শিষ্যরা চ'লে গেলে আমি সেই পথ ধ'রে হাঁটতে আরম্ভ করলুম। অনেকক্ষণ চলবার পর বিপরীত দিক থেকে একজন লোক আসছে দেখে, তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, চটি কত দূরে?

সে বললে, এখানে চটি কোথায়? দশ মাইল দূরে একটা চটি আছে বোধ হয়।

লোকটার কথা শুনে আমি একেবারে ব'সে পড়লুম। একে তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, অন্ধকারে পথও চিনতে পারি না; মঠে যাবার পথ চিনি বটে, কিন্তু সেখানে ফেরবার পথ নিজেই নষ্ট ক'রে এসেছি। এই রাত্রিতে দশ মাইল পাহাড়ে-পথ অতিক্রম ক'রে চটিতে পৌঁছবার আশা বিড়ম্বনামাত্র। বাইরের অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল।

অন্তরের আশার শিখাও স্তিমিত। একমাত্র ভরসা আমার দুর্জয় সাহস। সেই সাহসে ভর ক'রে আমি অগ্রসর হতে লাগলুম।

রাত্রি এক প্রহর কেটে যাবার পর আকাশে একটু চাঁদের আলো দেখা দিলে। ক মাইল পথ চ'লে এসেছি, তা ঠিক করতে পারলুম না, তবে যতদূর মনে পড়ে, একটা ছোট আর একটা বড় উপত্যকা পার হয়ে হাঁপিয়ে পড়েছিলুম। স্থির করলুম যে, এক জায়গায় ব'সে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার চলতে শুরু করব।

একটা গাছের তলায় ব'সে বিশ্রাম করছিলুম, কখন যে সুষুপ্তির কোলে ঢ'লে পড়েছি, তা জানতেই পারি নি, হঠাৎ খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস আমায় ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিলে।

জেগে দেখি, চাঁদের আলোতে চারিদিক ভেসে গেছে। আমার চারিদিকে ছোট থেকে বড়—একটার পর একটা পাহাড় থাকে থাকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। দূরে, সবার পেছনে একটা পাহাড় আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে নীল আকাশ ভেদ ক'রে উঠেছে। বাতাস অতি মৃদুভাবে তার গায়ে মেঘের চামর বুলিয়ে দিচ্ছে। কি স্থির আর কি শান্তভাবে তারা কাল-সমুদ্রের বুকে অনন্তের নোঙর পেতে প'ড়ে আছে!

আমার মনে হতে লাগল, পাহাড়গুলো যেন এই শব্দহীন, অন্তহীন নীল চাঁদোয়ার নীচে ব'সে মহাপ্রলয়ের দিন কে কি কাজের ভার নেবে, তারই পরামর্শ করছে। সেই বিরাট মহান প্রকৃতির সামনে মাথা আপনি নুয়ে পড়ল।

মাথা তুলতে না তুলতে শুনতে পেলুম, চল্, এত রাতে আর এখানে ব'সে থাকে না।

পেছনে ফিরে দেখি, স্বামীজী তাঁর দুই শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে

আছেন। আমি ফিরতেই তিনি বললেন, তুই তো ভারি অভিমানী ছেলে! চ'লে যেতে বললুম ব'লেই কি চ'লে যেতে হয়?

স্বামীজীকে প্রণাম ক'রে বললুম, প্রভু, আপনি তাড়িয়ে না দিলে এ দৃশ্য আমি দেখতে পেতুম না। চ'লে যেতে ব'লে ভালই করেছিলেন।

স্বামীজী আমার একখানি হাত ধ'রে বললেন, চল্, ফিরে চল্। রাগ করিস নি।

সেই রাত্রিতে আবার মঠে ফিরে এলুম। বোধ হয় চার দিন পরে স্বামীজী আমায় দীক্ষা দিলেন। আমার সংসারী নাম ঘুচে গিয়ে নাম হল—অরূপচৈতন্য।

মঠে বেশ আনন্দেই দিন কাটতে লাগল। সকালে স্বামীজী আমাদের ধর্মশিক্ষা দিতেন। দূরে দু-তিনখানা গ্রাম ছিল, তারই বাসিন্দারা আমাদের আহার্য যোগাত, মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর ধনী শিষ্যরা ভেট পাঠাত। শক্ত কাজের মধ্যে ছিল ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসা। জ্যোৎস্না-রাত্রি হ'লেই আমি পাহাড়ে বেরিয়ে পড়তুম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে মঠে এসে শুয়ে পড়তুম।

বাইরের যে পৃথিবীটার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে চ'লে এসেছিলুম, মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্তে তার আহ্বান আমার হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ে আমাকে আকুল ক'রে তুলত। কিন্তু নির্জনতার মধ্যেও একটা মাদকতা আছে। তার নেশা ধরতে দেরি লাগে বটে, কিন্তু সে মৌতাত একবার অভ্যেস হয়ে গেলে আর ছাড়া মুশকিল। আস্তে আস্তে এই একলা থাকার মৌতাতে আমি মশগুল হয়ে উঠছিলুম, এমন সময় কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে স্বামীজীকে বোম্বাইয়ের দিকে চ'লে যেতে হ'ল।

মঠে তখন আমরা তিনজনমাত্র শিষ্য ছিলুম। স্বামীজী একজনকে সঙ্গে নিলেন, একজনকে পাঠিয়ে দিলেন প্রয়াগ-অঞ্চলে, আর আমায় বললেন, তুই নিজের দেশে যা। সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর একবার দেশে যেতে হয়।

মঠ ছেড়ে কোথাও যেতে আর আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু গুরুর আগ্রহে আমায় বেরুতে হ'ল। তিনি আমাদের দুজনকে ব'লে দিলেন, দু বছর পরে আমি এইখানে ফিরব।

বেরিয়ে পড়তে হ'ল। বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছিলুম, তখন হাতে আর কিছু না থাক্, রেলভাড়াটা ছিল, এখন একেবারে রিক্ত। বিনা টিকিটেই রেলে উঠে পড়া গেল। টিকিট নেই শুনে কেউ বা সন্ন্যাসী দেখে ছেড়ে দেয়, আর কেউ বা ঘাড় ধ'রে নামিয়ে দেয়। তখনকার মত নেমে পড়ি, পরদিন আবার ট্রেনে উঠে চলতে থাকি।

এই রকম ক'রে অগ্রসর হতে হতে একদিন মধুপুর রেল-স্টেশনে একজন কর্মচারী আমার টিকিট নেই দেখে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলে। আমি মনে করেছিলুম, আমাকে নামিয়ে দিয়েই সে নিশ্চিন্ত হবে, আমিও আবার অন্য গাড়িতে চড়ব। কিন্তু তা হ'ল না, স্টেশন থেকে গাড়িখানা চ'লে যাবার পর সে ব্যক্তি আমাকে একেবারে রেল-পুলিসের জিম্মায় সমর্পণ করলে। এরকম ফ্যাসাদে এর আগে আর কখনও পড়ি নি। প্রায় আট-দশ দিন টানা-প'ড়েন থানা-পুলিস হতে হতে ব্যাপারটা আদালত অবধি গড়াল। আমি আন্দাজ করেছিলুম, এই সুযোগে জেলে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা বোধ হয় হয়ে যাবে। কিন্তু অবোধ হাকিম কোম্পানির সমস্ত কথা শুনে আমায় বললে, যাও, এমন কাজ আর ক'রো না।

সন্ন্যাসীর নামে মামলা হওয়ায় সেখানে হৈ-চৈ প'ড়ে গিয়েছিল।

আমি মুক্তি পেতেই শহরের একজন ধনী আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। কলকাতায় যাব শুনে তারা রেলের টিকিট কিনে দিতে চাইলে। কিন্তু রেলে উঠতে আমার আর প্রবৃত্তি হ'ল না। আমি সেখান থেকে হেঁটেই রওনা হলুম।

মধুপুর থেকে কলকাতা অবধি বেশ ভাল হাঁটা-পথ আছে। সেই রাস্তা ধ'রে কলকাতার দিকে এগিয়ে চলেছি। তখন বর্ষাকাল, মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে কষ্ট দেয়, আর পাহাড়ে-নদীগুলো ভ'রে ওঠায় কোন কোন জায়গায় পারের জন্যে একটু মুশকিলে পড়তে হয়। তা না হ'লে । পক্ষে পথ চলায় কোনও কষ্ট নেই।

মাসখানেক পথ চ'লে বাংলায় এসে পৌছলুম। বৃষ্টি তখনও থামে নি, বরং আরও বেড়েছে। মাঠ ঘাট সব জলে ভর্তি, রাস্তাও আর তেমন শুকনো নয়, মধ্যে মধ্যে ভারি কাদা।

একদিন—সেদিন আর কোন গ্রামের মধ্যে ঢুকি নি। রাস্তা বেয়ে তাড়াতাড়ি চলেছি; কোনও রকমে কলকাতায় গিয়ে পৌছতে পারলে হয়। কতবার বৃষ্টি এল, আর কতবার যে ভিজে কাপড় গায়েই শুকিয়ে গেল, তার ঠিকানা নেই। সমস্ত দিন চ'লে চ'লে সন্ধ্যের সময় একটা গাছতলায় আশ্রয় নিলুম। পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম, তার ওপরে জলে ভিজে ভিজে কদিন থেকেই শরীরটা জ্বর-জ্বর করছিল।

সন্ধ্যের কিছু পরেই আবার বৃষ্টি শুরু হ'ল। মনে করেছিলুম, রাত্রিটা এখানে কোনও রকমে কাটিয়ে সকালে আবার চলা শুরু করব। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতে আকাশ যেন ভেঙে পড়ল, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল।

আমি যে গাছের নীচে আস্তানা করেছিলুম, তার একটু দূরেই

একটা রাস্তা গ্রামের দিকে চ'লে গিয়েছে। এই দুর্যোগে কোনও রকমে কোনও গৃহস্থের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হতে পারলে নিশ্চয় রাত্রির মত একটু আশ্রয় পাওয়া যাবে—এই ভরসায় গাছের তলা থেকে দৌড় দিলুম।

দৌড়—দৌড়—দৌড়। কিছুক্ষণ দৌড়ুই, আবার কিছুক্ষণ হাঁটি। এই রকম ক'রে চলতে চলতে দূরে একটা আলো দেখতে পেলুম। ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেটা একটা মুদীর দোকান; ছোট্ট একটি চালাঘর। মুদী সেখানে আশ্রয় দিলে না, তবে সে দয়া ক'রে গ্রামের রাস্তাটা আমায় দেখিয়ে দিয়ে বললে, গাঁয়ের ভেতরে যাও, সেখানে আশ্রয় পেতে পার।

গাঁয়ের মধ্যে ঢুক্‌লুম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তার ওপরে কালো মেঘের ছায়া ধরণীর যা কিছু সব যেন নিকিয়ে নিয়েছে। চোখে কিছুই দেখতে পাই না। অন্ধকার, কাঁটা আর কাদায় মিলে সে একটা বীভৎস ব্যাপার হয়ে রয়েছে। তার ওপর দিয়ে এক রকম গড়াতে গড়াতে চলতে লাগলুম।

গ্রাম একেবারে নিষুতি। একে এই দুর্যোগ, তার ওপরে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, গ্রামবাসীরা যে যার শুয়ে পড়েছে। মানুষ তো ছার, একটা কুকুরের ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। এরই ভেতর দিয়ে আমি পিছলে পিছলে টলতে টলতে চলেছি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে, তবুও চলেছি। এমন সময় অনেক দূরে একটা ক্ষীণ আলো দেখা গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা সেই আলো লক্ষ্য ক'রে গিয়ে আমি একটা একতলা জীর্ণ বাড়ির সামনে উপস্থিত হলুম। একটা খোলা জানলা দিয়ে ক্ষীণ একটু আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছিল। একটু ঘুরে বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজা ভেজানো ছিল, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল বটে,

কিন্তু কেউ নেই সেখানে। আমি ডাক দিলুম, বাড়িতে কে আছেন? বাড়ির ভেতরে রমণীকণ্ঠ শোনা গেল, ওরে, দেখ, বোধ হয় ডাক্তারবাবু এলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই একটি কিশোরী একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। কিশোরী প্রথমে আমাকে দেখতে পায় নি। সে লণ্ঠনটা তুলে 'কে?' ব'লে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমাকে সেই অবস্থায় দেখে তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না। কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে লণ্ঠনটা ঠক ক'রে নামিয়ে রেখে সে ভেতরে চ'লে গেল।

একটু পরেই একজন বিধবা রমণী 'কে?' ব'লে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে গুটি দুই-তিন ছেলেমেয়ে।

আমি একটু এগিয়ে এসে বললুম, আমি অতিথি। এই দুর্যোগে বড় বিপদে পড়েছি; রাত্রির মত একটু আশ্রয় চাই।

রমণী স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তোমার বাড়ি কোথায় বাবা?

বললুম, সন্ন্যাসীর আবার বাড়ি কোথায় মা!

ও, তুমি সন্ন্যাসী। তা গেরুয়া দেখেই মনে হয়েছিল। এস বাবা, ভেতরে এস। ভগবান তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বাড়ির ভেতরে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে কাপড়খানা নিংড়ে পরলুম। শরীর একেবারে ভেঙে আসছিল; শোবার জন্যে জায়গা খুঁজছি, এমন সময়ে সেই বিধবা আমায় বললেন, বাবা, আমাদের বড় বিপদ। তাই দেখেই বোধ হয় ভগবান এত রাত্রে তোমাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ঘুম-টুম সব ছুটে গেল। জিজ্ঞাসা করলুম, কি বিপদ বলুন? আমার যদি সাধ্য থাকে—

তিনি বললেন, আমার বড় মেয়েটি আজ ছ মাস ধ'রে জ্বরে ভুগছে। আজ সন্ধোবেলায় কাসতে কাসতে কি রকম অজ্ঞানের মত হয়ে পড়েছে, এখনও ভাল ক'রে জ্ঞান হয় নি। এ গ্রামে কোনও ডাক্তার নেই; ভিন গাঁয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হয়েছে। তা এই দুর্যোগে সে বোধ হয় আর এল না।

চলুন, তাকে দেখে আসি।

এই ব'লে উঠলুম। বিধবা আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের এক দেওয়ালের গায়ে লাগা এক খাটে রোগিণী শুয়ে আছে। এই ঘরেরই খোলা জানলা দিয়ে যে ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছিল, তাই লক্ষ্য ক'রে আমি এসেছি। রোগিণীর বয়স বোধ হয় কুড়ির কাছাকাছি। দেখতে হয়তো সুন্দরীই ছিল, কিন্তু নির্মম রোগ তার সমস্ত সৌন্দর্যই গ্রাস করেছে।

অনেকক্ষণ বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে মুখ দেখলুম। চোখ বুজে সে প'ড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম, এর নাম কি?

ললিতা।

রোগিণীর তপ্ত ললাটে হাত দিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলুম, ললিতা!

ডাকামাত্র তার নিমীলিত চোখ দুটো খুলে গেল। সে আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শুল।

রোগিণীর মা বললেন, সন্ধ্যের আগে একবার বমি ক'রে সেই যে চোখ বুজেছিল, আর এই খুলল। তোমাকে কি বলব বাবা—

আমি বললুম, আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আর কোন ভয় নেই; কাল ডাক্তার এলে যা হয় ব্যবস্থা হবে।

রোগিণীর ঘরের বাইরে একটা চওড়া দাওয়া। তারই এক কোণে আমার শোবার ব্যবস্থা হ'ল।

পাশের একটা ঘরে ছেলেমেয়েদের মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল, ললিতার মা আমাকে শুইয়ে সেই ঘরে ঢুকে গেলেন।

তখনও বৃষ্টি থামে নি। বৃষ্টির সেই অখণ্ড ঘুম-পাড়ানিয়া গানে গ্রামের সমস্ত প্রাণীই নিদ্রিত। আমার চোখ থেকে কিন্তু ঘুম ছুটে গিয়েছিল। চোখ বুজলেই পাশের ঘরের সেই রুগ্না মেয়েটির জীর্ণ মুখ চোখের সামনে ভাসতে থাকে। তার কথা ভাবতে ভাবতে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আমাকে তার দিকে টানতে লাগল।

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, বাতিটা তখনও মিটমিট করছে। কোণে এক বৃদ্ধা ঝি প'ড়ে অঘোরে নিদ্রা দিচ্ছে। খাটের দিকে চেয়ে দেখলুম, ললিতা আবার চিত হয়ে শুয়েছে। সেই স্তিমিত আলোতে তার মুখ ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছিল না, আমি খাটের ধারে গিয়ে ঝুঁকে তার মুখখানা দেখতে লাগলুম।

একদৃষ্টে তাকে দেখছি। নিশ্বাস এত ক্ষীণ যে, তা পড়ছে কি না, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তার একখানা হাত তুলে নাড়ী দেখতে লাগলুম। জীবনপ্রবাহ অতি ক্ষীণ, যে কোনও মুহূর্তে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ রুগ্নার চোখ দুটো খুলে গেল। আমাকে দেখেই সে ব'লে উঠল, কে! কে তুমি?

আমি তাড়াতাড়ি তার হাতখানা নামিয়ে রেখে বললুম, কোনও ভয় নেই। আমি সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী! ও, তুমিই বুঝি রোজ ওই জানলার ধারে ব'সে থাক? আজ এত কাছে এসেছ যে?

আমি বললুম, তুমি ঘুমোও। বেশি কথা বললে অসুখ বাড়বে।

কিন্তু তুমি এত কাছে এসেছ কেন? আমাকে বুঝি নিয়ে যাবে? না না, আমি যাব না, তুমি যাও।

স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল যে, বিকারের ঘোরে সে ভুল বকছে। আমি তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, তুমি চোখ বোজ, ঘুমোও।

মেয়েটি আর একবার দৃষ্টিহীন চাউনিতে আমার দিকে চেয়ে চোখ বুজল।

একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। তার সেই শীর্ণ মুখ আর অসহায় অবস্থা দেখে তার প্রতি করুণায় আমার মনটা আর্দ্র হ'য়ে উঠতে লাগল। আমি ব'সে ব'সে ললিতাকে পাখার বাতাস করতে লাগলুম। গুরুদেবের শিক্ষা একেবারে বিফলে যায় নি। তোমাদের সত্যি বলছি, সেখানে ব'সে ব'সে আমার মনে হ'তে লাগল যে, এর মধ্যে ভগবানের নিশ্চয় কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। তা না হ'লে কোথাকার লোক আমি, আর আজ এই শেষরাতে কোথায় ব'সে কাকে বাতাস করছি! আশ্চর্য দৈবের খেলা!

সূর্যের রথখানা তখনও উদয়াচলের শিখরে এসে পৌঁছয় নি। অন্ধকার একটু ফ্যাকাশে হয়েছে মাত্র, এমন সময় ললিতার মা ঘরে ঢুকে আমাকে ওই অবস্থায় ব'সে থাকতে দেখে বললেন, সারারাত্রি এইখানে ব'সে আছ বাবা? তুমি আর-জন্মে নিশ্চয়ই আমাদের কেউ ছিলে। তা না হ'লে—

তাঁকে বাধা দিয়ে বললুম, আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না। সেবাই আমাদের ধর্ম।

আমাদের কথা শুনে ললিতার ঘুম ভেঙে গেল। সে চোখ চেয়ে অবাক হয়ে আমার দিকে চাইতে লাগল। তার মা কাল রাত্রির সমস্ত কথা ব'লে আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে শুয়ে শুয়েই হাতজোড় ক'রে আমাকে নমস্কার করলে।

সকালবেলা ক্রমে ক্রমে ললিতাদের বাড়ির অবস্থা জানতে পারলুম। ললিতার বাবা ছিলেন একজন কবি, কাজেই দরিদ্র। চাকরি-বাকরির চেষ্টা চার-পাঁচ বার করেছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি কোথাও বনিবনা হয় নি। অতি সামান্য আয় আছে, তাতে কষ্টে দুবেলা খাওয়া চলে। জাতে তাঁরা ব্রাহ্মণ। বছরখানেক আগে ললিতার বাবা তিন দিনের জ্বরে মারা গেছেন। ললিতা ছাড়া আরও একটি মেয়ে আছে, তার নাম অমিতা। দুটি ছেলে, তারা মেয়েদের চেয়ে ছোট। মেয়েদের কারও বিয়ে হয় নি। ললিতার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছিল, এমন সময় তার বাবা মারা গেলেন। তারপরে আজ ছ মাস সে জ্বরে জ্বরেই সারা হচ্ছে। কাল বিকেলে সে রক্তবমি ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ভিন গাঁয়ে ডাক্তার থাকে, রাতে লোক পাঠানো হয়েছিল, লোকও ফেরে নি, ডাক্তারও আসে নি।

ললিতার মার বয়সও বেশি নয়, চল্লিশের কাছাকাছি হবে। সংসারের কাহিনী বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, ললিতা বাঁচবে তো? কর্তার বড় আদরের মেয়ে ও।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম। বললুম, না বাঁচবার তো কোন কারণ দেখছি না, ও সেরে উঠবে।

তিনি বললেন, তুমি কটা দিন এখানে থাক বাবা, তোমায় দেখে আমার ভরসা হচ্ছে।

মাসখানেক ধ'রে হেঁটে হেঁটে আমিও ক্লান্ত হয়েছিলুম, বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন ছিল। তাঁর কথা শুনে বললুম, বেশ, আমি আছি।

ললিতার মা সংসারের কাজে ব্যাপৃত হলেন, আমি আবার ললিতার বিছানার পাশে গিয়ে বসলুম। তার মনটা একটু প্রফুল্ল করবার জন্যে বললুম, ললিতা, গল্প শুনবে?

সে উৎসাহিত হয়ে বললে, হ্যাঁ, বলুন, শুনব।

একটা গল্প বললুম। সে শুনে বললে, এ গল্প আমি জানি। আর একটা বললুম, সে বললে, এও আমি জানি।

সকালবেলা গল্প ক'রে কাটল। দুপুরবেলা ডাক্তার এলেন। হাতুড়ে ডাক্তার, কলকাতার কোন্ এক স্বদেশী ডাক্তারী কলেজে বছর ছয়েক প'ড়ে পাঁচটি অক্ষর উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু ললিতার যে রোগ, তা ধরবার জন্যে দিগ্‌গজ ডাক্তার না এলেও চলে। ডাক্তার রোগী পরীক্ষা ক'রে দুটি টাকা নিয়ে আমায় আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, রাজযক্ষ্মা হয়েছে, দুটো ফুসফুসেই আর কিছু নেই, যে কোন মুহূর্তেই মৃত্যু হতে পারে।

বিকেলবেলায় ললিতার খাটের পাশে ব'সে আছি। অস্তোন্মুখ রবির এক টুকরো ম্লান রশ্মি খোলা জানলা দিয়ে বিছানার ধারে এসে পড়েছিল। ললিতা অনেকক্ষণ সেই আলোটুকুর দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, সন্ন্যাসী, ডাক্তার কি ব'লে গেল, আমি আর বাঁচব না?

আমি বললুম, সে কি! কে বললে তোমাকে? ডাক্তার বললে, তুমি শিগগির সেরে উঠবে। ওসব কথা ভাবে না, লক্ষ্মীটি।

আমার কথা শুনে ললিতার শীর্ণ মুখ খুশিতে ভ'রে উঠল। সে বললে, না না সন্ন্যাসী, আমি তো সে কথা ভাবি না। আমি দিনরাত বাঁচবার কথাই ভাবি। শুধু ভাবি, কবে ভাল হয়ে উঠব। এখন আমি মরতে চাই না। আমার এই উনিশ বছর বয়েস, এই বয়েসে কি মরতে ইচ্ছে হয়? আমার অনেক আশা আছে, অনেক—অ—নে—ক—

এই অবধি ব'লে সে ভয়ানক হাঁপাতে লাগল। পাছে আবার সেই প্রসঙ্গ ওঠে, এই ভয়ে তাকে বললুম, ললিতা, গল্প শুনবে?

ললিতা একটু হেসে বললে, না, গল্প নয়। ওই তাকের ওপর কবিতার বই আছে, নিয়ে এসে আমায় শোনাও না।

তাকের ওপরে সারি সারি ইংরেজী বাংলা কবিতার বই সাজানো ছিল। একখানা বাংলা বই নিয়ে এসে বললুম, কোন্‌টা পড়ব?

ললিতা বললে, যেটা ইচ্ছে পড়।

আমি পড়তে লাগলুম, আর ললিতা চোখ বুজে রইল। একটার পর একটা প'ড়ে যাই, তার আর ক্লান্তি নেই। ঝি এসে আলো দিয়ে গেল, মা এসে কাছে বসলেন, অমিতা এসে খাইয়ে গেল, মা অন্য কাজে গেলেন, পড়ার আর বিরাম নেই। একবার সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে ক'রে আমি পড়া বন্ধ করলুম, কিন্তু তখনই সে চোখ চেয়ে বললে, কই, পড়ছ না?

আবার পড়তে শুরু করা গেল। একবার ললিতার দিকে চেয়ে দেখলুম, তার দুই চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

তার সেই অবস্থায় মনের ওপর কোন চাপ পড়া উচিত নয় ভেবে পড়া বন্ধ করলুম। ললিতা তখনই চোখ চেয়ে বললে, থামলে যে?

আমি বললুম, আজ এই অবধি থাক্‌, আবার কাল হবে। কি বল?

ললিতা বললে, আচ্ছা।

তাকে বইখানা রেখে এসে তার কাছে বসামাত্র সে বললে, সন্ন্যাসী, তুমি বড় ভাল। বড় সুন্দর পড়তে পার তুমি। আমার বাবাও খুব সুন্দর পড়তে পারতেন। আমাতে আর বাবাতে বই হাতে ক'রে কখনও চ'লে যেতুম সেই নদীর ধারে, কখনও বা ওই বড় মাঠটা পেরিয়ে সেই প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে, সমস্ত দিন আমরা সেখানে ব'সে ব'সে কবিতা পড়তুম। এই ভাদ্র মাসে আমরা ভাই-বোনে মিলে মাঠে-ঘাটে কত খেলাই করেছি! আজ প্রায় ছ মাস হ'ল বাড়ি থেকে বেরুই নি।

প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে উঠছে। কতদিনে আমি ভাল হয়ে উঠব, বলতে পার, সন্ন্যাসী ?

ললিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, তুমি শিগগির সেরে উঠবে। সেরে উঠলে আবার আমরা তেমনই ক'রে খেলতে যাব। তোমার শরীরটা একটু ভাল হোক।

আমার কথা শুনে সে সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি তাকে বাধা দিয়ে বললুম, তুমি ঘুমোও, লক্ষ্মীটি, তা না হ'লে আবার অসুখ বাড়বে।

ললিতা আর কিছু না ব'লে চোখ বুজে ফেললে।

সে রাত্রিতে ললিতার অসুখ ভয়ানক বেড়ে উঠল। রাত্রি বারোটা কি একটার সময় সে কাসতে আরম্ভ করলে। কিছু পরেই তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগল। আমি ছুটে গিয়ে তার মাকে খবর দিলুম। ললিতার মা আর তার বোন অমিতা এসে আর্তের পাশে দাঁড়াল। যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল। বাতাস করতে করতে একটু যদি যন্ত্রণা কমে তো অমনই কাসি শুরু হয়, তারপরেই দু ঝলক লাল টকটকে রক্ত। একটুখানি নিশ্বাস নেবার জন্যে সে কি চেষ্টা! শতচ্ছিদ্র ফুসফুসের সে যে কি ভীষণ যন্ত্রণা, তা যক্ষ্মা-রুগীকে যে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না। আমার মনে হতে লাগল, আজ রাত্রিতে বোধ হয় শেষ। কিন্তু মানুষের প্রাণ পৃথিবীর সমস্ত পাওনা চুকিয়ে না দিয়ে তো মুক্তি পায় না। সারারাত্রি সেই যন্ত্রণা সহ্য ক'রে শেষ রাত্রির দিকে ললিতা যেন ঝিমিয়ে পড়ল। আমরা তিনজনে সারারাত তার বিছানার পাশে ব'সে ব'সে কাটালুম।

ললিতাদের গ্রামের ধার দিয়েই গঙ্গা ব'য়ে গিয়েছে। আমি রোজ নদীতে গিয়ে স্নান করতুম। সকালবেলা একটুখানি ঘুমিয়ে স্নান সেরে

এসে দেখি, ললিতা জেগেছে আর বেশ প্রফুল্লভাবেই তার ছোট ভাই-বোনদের সঙ্গে গল্প করছে। একটি ভাই আদর ক'রে তার দিদির পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকতেই ললিতা আমায় জিজ্ঞাসা করলে, সন্ন্যাসী, তুমি স্নান করতে গিয়েছিলে বুঝি ?

হ্যাঁ।

এখন গঙ্গার দু কূল ভ'রে উঠেছে, না ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা সন্ন্যাসী, গঙ্গার ধারে সেই যে বড় বটগাছটা, সেটা দেখেছ ?

হ্যাঁ।

তারই একটি মোটা শেকড় মাটি থেকে ধনুকের মত হয়ে উঠে আবার মাটির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, সেটা দেখেছ ?

কই, তা তো দেখি নি !

তা হ'লে সেটা জলে ডুবে গিয়েছে। আর কতদিনে যে গঙ্গার সে রূপ আবার দেখতে পাব !

ললিতা তার ক্লান্ত চোখ দুটো বন্ধ করলে। কিছুক্ষণ পরে ললিতার মা অমিতা ও তার ছোট ভাই দুটিকে খাবার জন্যে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ভাই-বোনেরা চ'লে যাবার পর ললিতা চোখ মেলে আমায় বললে, সন্ন্যাসী, এই সময় মাঠে খুব কাশফুল হয়। আমার জন্যে কাল এক গোছা তুলে আনবে ?

আমি বললুম, কাল কেন, আজই বিকেলে তোমার জন্যে কাশ নিয়ে আসব। মাঠে অনেক কাশ দেখেছি।

ললিতা এতক্ষণ বেশ হাসিখুশিই করছিল, হঠাৎ তার চক্ষু দুটি সজল হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে

সে বললে, সন্ন্যাসী, আমার যেন মনে হচ্ছে, মাঠ-ভরা কাশের সেই শোভা, বর্ষার গঙ্গার সেই আপন-ভোলা উদ্দাম স্রোত, শরতের সকালে এই মিষ্টি রোদ—এই শেষ—সব শেষ। আর দেখতে পাব না।

ললিতার কণ্ঠে এমন একটা অসহায় ও উদাস সুর বাজতে লাগল যে, চোখের জল সংবরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তখনও সন্ন্যাসীর অভিমান আমার যায় নি। নিজের মনকে ধমক দিতে লাগলুম, ছি, এত কোমল তুমি!

ললিতাকে বললুম, ললিতা, ওসব কথা ভেবে নিজের অসুখ বাড়িয়ে কেন আমাদের দুঃখ দিচ্ছ? তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর।

ললিতা আবার আমার মুখের দিকে তাকালে। সেই সজল দৃষ্টি এবার সে বললে, সন্ন্যাসী, আমার জন্যে তোমার দুঃখ হয়? আমি যদি ম'রে যাই, আমার কথা কি তোমার মনে থাকবে? আমি ম'রে গেলে তুমিও তো এখান থেকে চ'লে যাবে। তারপর তুমি কত দেশে দেশে ঘুরবে, কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে, তারই মধ্যে সজনে কি নির্জনে পাড়াগাঁয়ের এই ললিতার কথা, যার সঙ্গে দুদিনের জন্যে তোমার ভাব হয়েছিল, তার কথা কি মনে থাকবে?

আমার কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছিল। কোনও রকমে গলাটি পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললুম, থাকবে ললিতা। তোমাকে কখনও ভুলব না।

ললিতা যেন একটা আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলে বললে, আ সন্ন্যাসী তুমি বড় ভাল।

ললিতাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তার মাকে নির্জনে ডেকে বললুম ললিতার অবস্থা ভাল নয়, বোধ হয় দু-একদিনের বেশি বাঁচবে না।

কথাটা শুনে তিনি চমকে উঠলেন। সন্তানের মৃত্যু-সম্ভাবনা

ঃবাদে মায়ের সে চমকানি, তার বর্ণনা করবার ভাষা আমি জানি না। তনি কোন কথা না ব'লে নীরবে কাঁদতে লাগলেন। সন্তোবিধবা সেই ।রীকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা আমার যোগাল না। ব'সে ব'সে াবতে লাগলুম, মৃত্যু এ সংসারে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু ধরণীর ই অতি-পুরাতন অতিথি প্রতি গৃহে প্রতি বারেই দেখা দেয়। সকলেই ানে, এর কোন প্রতিকার নেই, তবুও তারা শোকে কাতর হয়। কলেই জানে, সান্ত্বনার কোন মূল্য নেই, তবুও সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে ললিতার মার অশ্রু দেখে আমিও দু-চারটে সান্ত্বনার বাঁধা গৎ াওড়াতে লাগলুম। কিন্তু ছেলেরা সেখানে এসে পড়ায় তাড়াতাড়ি দখান থেকে স'রে গেলুম।

বিকেলবেলা অমিতা ও তার ভাই দুটিকে নিয়ে মাঠ থেকে কয়েক গাছা কাশফুল তুলে নিয়ে এলুম। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ললিতা ক রকম বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। ফুলগুলো দেখে তার মুখে আবার ম্লান াসি ফুটে উঠল। সে একটি গোছা ফুল নিয়ে নিজের মুখের ওপর লোতে আরম্ভ করলে।

সেদিন সন্ধ্যের দিকে ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙল একেবারে াত্রি বারোটা কি একটায়। এর মধ্যে তাকে একবার জাগিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল। আমি তার পাশে ব'সে ছিলুম, সে আমার একখানা হাত 'রে বললে, সন্ন্যাসী, ঠিক ক'রে বল তো আমি বাঁচব কি না? দেখো, ামায় কাছে গোপন ক'রো না। যদি আমি আর না বাঁচি, তা হ'লে তামায় একটা কথা ব'লে যাব। সে কথা তোমাকে বলবার আগে াামি ম'রে গেলে আমার ক্ষোভের আর সীমা থাকবে না। সে দুঃখ ্মি বুঝতে পারবে না। বল বল, আমি কি আর বাঁচব না?

ললিতার সে অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

ব'লে ফেললুম, তোমার অবস্থা খুবই খারাপ, যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে।

আমার কথা শুনে সে একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলে বললে, বড় উপকার করলে তুমি আমার। এ কথাটা তোমায় না বললে ম'রেও আমি শান্তি পেতুম না। শুনবে সে কথা?

বল, শুনি।

আমি তোমায় ভালবাসি।

অাঁ! আমার সন্দেহ হ'ল যে, বিকারের ঝোঁকে সে বুঝি ভুল বকছে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, ললিতা, ঘুমোও তুমি। বেশি কথা কইলে—

ললিতা আমার কথা গ্রাহ্য না ক'রে ব'লে যেতে লাগল, দেখ সন্ন্যাসী, জীবনে আমার সব সাধই মিটেছে, কিন্তু আমি কখনও কারুকে ভালবাসি নি। আমার বুকে ভালবাসার যে সম্পুটখানি আছে, ধনী যেমন যত্ন ক'রে নিজের বুকের মধ্যে মহামূল্য রত্নকে আগলে রাখে, আমিও তেমনই আমার কুমারী-ধর্ম দিয়ে আমার সেই ভালবাসাটিকে আগলে রেখেছিলুম, আমার স্বামীর হাতে অক্ষুণ্ণ সেই পাত্রটিকে তুলে দেবার জন্যে। আজ আর সময় নেই, আমি তোমার হাতে আজ সেই রত্ন তুলে দিচ্ছি। সন্ন্যাসী, শোন, আমি তোমায় ভালবাসি।

আমার মনের অবস্থাটা একবার তোমরা কল্পনা ক'রে দেখ বাক্‌পটুতার জন্যে তোমাদের কাছে কত প্রশংসাই না পেয়েছি! কিন্তু সেই মুমূর্ষু দু দিনের পরিচিতার প্রেম গ্রহণ করবার মত ভাষা আমি খুঁজে পেলুম না। স্তম্ভিত হয়ে তার পাশে ব'সে রইলুম।

ললিতা আবার বলতে আরম্ভ করলে, সন্ন্যাসী, এদিকে ফেরো, আমার দিকে চাও।

আমি তার দিকে চাইলুম। সে বললে, তুমি? তুমি আমায় ভালবাস?

আমি কি বলব! তাকে ভালবাসার কোনও কল্পনা তখনও পর্যন্ত স্বপ্নেও আমার মনের মধ্যে উঁকি দেয় নি। কিন্তু তার জীবন-মরণের মাঝে সেই ক্ষীণ ব্যবধানটুকু প্রত্যাখ্যানের লজ্জা আর দুঃখে ভরিয়ে দেবার মত সত্যনিষ্ঠা আমার নেই। ব'লে ফেললুম, বাসি ললিতা, বাসি। তুমি কি বুঝতে পার না?

ব'লেই মনে হ'ল, মিথ্যা কথা বলতে শেখা আমার সার্থক হয়েছে। মিথ্যার অতখানি সদ্ব্যবহার করবার অবসর বোধ হয় জীবনে আর পাব না।

ললিতা আমার কথা শুনে বললে, বুঝতে পারি। সেইজন্যেই তো তোমাকে ভালবেসেছি।

আমি বললুম, ললিতা, গতজন্মে তোমার সঙ্গে নিশ্চয় আমার কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেবার বোধ হয়, আমি তোমাকে এমনই ক'রে ফাঁকি দিয়েছিলুম, এ জন্মে তুমি আমায় ফাঁকি দিলে।

ললিতা একটু হেসে বললে, শোধবোধ হয়ে গেল। এবার যখন মিলব, তখন আর ছাড়াছাড়ি হবে না। যাবার আগে—

ললিতা আর বলতে পারলে না। আমি নীচু হয়ে তার জ্বরতপ্ত অধরে তার কুমারী-জীবনের প্রথম প্রেমের চুম্বন এঁকে দিলুম।

ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নাম কি সন্ন্যাসী?

আশ্চর্য! এতদিন সে আমার নাম পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নি। আমাকে 'সন্ন্যাসী' ব'লেই ডাকত। আমি বললুম, আমার নাম দীনবন্ধু।

সে বললে, না না, ও নাম ভাল নয়। ও আবার কি নাম!

বললুম, তা হ'লে তুমি আমার একটা নাম দাও।

ললিতা আবার সেই ম্লান হাসি হেসে বললে, সেই বেশ। তোমার নাম তরুণ। কেমন?

আমার হাসি পেল। বললুম, তোমার যে নাম ইচ্ছে, সেই নাম ধ'রেই আমায় ডেকো।

সে বললে, দূর, তোমার নাম বুঝি আমায় ধরতে আছে?

একটু চুপ ক'রে সে আবার বললে, ওগো, তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় একটু দাও না।

আমি তাই দিলুম। একটু হাঁপিয়ে গিয়ে সে বললে, আর একবার, ওগো, আর একবার।

আবার তার তৃষিত অধর চুম্বনে ভরিয়ে দিতে হ'ল। চুমুতে তার যেন সাধ আর মিটছিল না। সে আমার একখানা হাত চেপে ধ'রে রইল। সেই অবস্থাতে আমাদের প্রথম প্রেমের বাসর-রাত্রি অবসান হ'ল।

পরদিন সন্ধ্যের সময় ললিতা ইহলোক থেকে বিদায় নিলে।

দীনবন্ধুর কাহিনী শুনিয়া আমরা নীরব রহিলাম। মহেন্দ্র-দাদা জিজ্ঞাসা করিল, গেরুয়া ছাড়লে কোথায়?

দীনবন্ধু বলিল, শ্মশানঘাটে স্নান ক'রে নতুন কাপড় পরবার সময় গঙ্গার জলে গেরুয়া ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি।

হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট

মারো মারো—

আবার কি হ'ল ?

দেখ দেখ, লোকটাকে মেরে ফেললে বুঝি !

একটা মোছলমান শহীদ হ'ল বোধ হয়।

গোলমাল শুনে ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে জানতে পারলুম, আমাদের কয়লাওয়ালাটাকে দাঁ-দের দারোয়ানেরা মেরে ফেললে। লোকটা নাকি আজ পনরো বছর ধ'রে মুসলমানত্ব গোপন ক'রে এ পাড়ায় কয়লা ফিরি ক'রে বেড়াচ্ছিল। আজ সকালে হঠাৎ কি ক'রে তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে তার বিচার ও সাজা হয়ে গেল।

সকালবেলা উঠেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। হাঙ্গামার আতঙ্কে সারারাত্রি ঘুম হয় না। রাত্রি তিনটে অবধি বাঁটুল-হাতে ছাতে ঘুরে বাড়ি পাহারা দিই, দূরে গোলমাল শুনতে পেলে সেই দিক লক্ষ্য ক'রে কল্পিত শত্রুর উদ্দেশ্যে গুলতি ছাড়ি। চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতে বন্দী, দিনের বেলাতেও বেরুবার জো নেই। কি জানি, কোন্ গলি-ঘুঁজির মধ্যে ছোরা নিয়ে মুসলমান লুকিয়ে আছে। জানতে পারবার আগেই হয়তো রপ্তানি হয়ে যাব।

খবরের কাগজ ওলটাতে লাগলুম। তিনজন হিন্দুস্থানী গ্যাঁড়াতলার পথ দিয়ে জাহান্নমে চ'লে গিয়েছে, সাতজন মুসলমান শহীদ হয়েছে, দুজন মাড়োয়ারীর ঘৃতপুষ্ট ভুঁড়ির দফা কাবার, পা পিছলে প'ড়ে গিয়ে একজন বাঙালী বিশেষ আহত হয়েছে, তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, ইত্যাদি পড়তে পড়তে মগজের মধ্যে যুদ্ধের বাজনা বেশ জ'মে উঠেছে,

এমন সময় মেয়ে আমার নাচতে নাচতে এসে প্রশ্ন করলে, হ্যাঁ বাবা, ধনাঢ্য মানে নাকি মাড়োয়ারী ?

জিজ্ঞাসা করলুম, এ সন্ধানটি তোমায় দিলে কে ?

মেয়ে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, কাকা।

দিন তিনেক আগে ভায়া আমাকে কেন যে 'কিণ্ডারগার্টেন' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিল, এবার তার কারণ বুঝতে পারলুম। মেয়েকে বললুম, যা, তোর বই নিয়ে আয়, দেখি, কেমন পড়াশুনো হচ্ছে।

যাক, তবু একটা কাজ পাওয়া গেল মনে ক'রে মহা উৎসাহে মেয়েকে পড়াতে শুরু করলুম বটে, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলুম, কাজটি মোটেই সুখকর নয়। কি ক'রে নিজের রচিত এই ফাঁদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, তার উপায় উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করছি, এমন সময় ছোট ভাই মণি মুখ শুকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, মেজদা, একটা মোছলমান তোমায় ডাকছে।

অ্যাঁ, মোছলমান!

হ্যাঁ।

কি রকম দেখতে, ষণ্ডা মতন, লুঙ্গি-পরা ?

না, ইজের-আচকান-পরা।

ছোরা-টোরা হাতে আছে দেখলি ?

না, তা দেখি নি, তবে আচকানের ভেতর কোমরের কাছে কি যেন একটা উঁচু হয়ে আছে ব'লে মনে হ'ল।

মেয়ে আমার এই অবসরে উঠে পালিয়েছিল, তাই নিঃসঙ্কোচে ব'লে দিলুম, ব'লে দে, বাড়ি নেই।

ভায়া একটু কাঁচুমাচু হয়ে বললে, আমি যে তাকে বলেছি, তুমি বাড়িতে আছ। সে বৈঠকখানায় বসেছে।

বেশ করেছ। এখন কি করা যায়।

আমায় চিন্তিত দেখে ভায়া প্রস্তাব করলে, গজেনদার বাড়ি থেকে রিভল্ভারটা চেয়ে আনব?

ততক্ষণে আমি একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে নিয়েছিলুম। ভায়াকে আশ্বস্ত ক'রে নীচে নেমে পড়লুম।

আমাদের পাড়াটাকে হিন্দু-কেল্লা বলা চলে। এখানে গাজী হবার আশায় কোন মুসলমান এসে বিশেষ সুবিধে করতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল। ভরসা ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি— আরে, সখায়ৎ মিয়া যে! কি খবর?

সখায়ৎ বললে, মানিকতলার বাজারে মুসলমানদের ঢুকতে দিচ্ছে না, তাই তোমাদের পাড়ায় গোস্ত কিনতে এসেছিলুম। তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেলুম, ফুফা মিয়া তোমায় সেলাম জানিয়েছেন।

সখায়তের ফুফা মিয়া ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত বাজিয়ে। তাঁরা পশ্চিমে-মুসলমান, আমরা তাঁর শিষ্য, তিনি আমাদের ওস্তাদ। এই দুর্দিনে ওস্তাদ কেন স্মরণ করেছেন বুঝতে পারলুম না। সখায়তকে বললুম, ওস্তাদকে আমার সেলাম জানিও, সুবিধে করতে পারলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

দিন দুয়েক পরে সন্ধ্যের ঝোঁকে একদিন ওস্তাদজীকে গিয়ে সেলাম দেওয়া গেল। তাঁকে ঘিরে জনকয়েক সাকরেদ ব'সে আছে, তারা সকলেই হিন্দু, নানা রকম আলোচনা চলছে। জিজ্ঞাসা করলুম, ওস্তাদ কেমন আছেন?

খাঁ সাহেব বললেন, শরীর ভারি খারাপ। তোমায় ডেকেছিলুম একটা কাজের জন্যে এই যে, হিন্দুরা এমন ক'রে মুসলমানদের মারছে,

মসজিদ ভেঙে দিচ্ছে, খবরের কাগজে একটা চিটি লিখে হিন্দুদের এই অত্যাচার থামিয়ে দিতে পার না?

কয়েকজন অপরিচিত লোকও সেখানে ব'সে ছিল, তারা সম্ভ্রমে সঙ্গে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারা হয়তো মনে করলে যে আমার একটু কলমের খোঁচার ওপর এতবড় হাঙ্গামাটা থামা না-থাম সব নির্ভর করছে।

গম্ভীরভাবে আসন নিয়ে বললুম, এখন চিঠি লিখলে কি আর হিন্দুর মার থামাবে, মুসলমানেরা যে আগে মার শুরু করেছে, মন্দির ভেঙেছে আর এখনও মারছে।

খাঁ সাহেব তামাক টানতে টানতে বললেন, আরে, সে কথা ছেড়ে দাও। হিন্দুরা যে এই অন্যায় করছে—

এই অবধি ব'লেই খাঁ সাহেব কাসতে আরম্ভ করলেন। কাশি থামলে একটু দম নিয়ে বললেন, ক'দিন খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচারে শরীরটা একদম গিয়েছে।

একজন শিষ্য বললেন, খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচার কেন করেন? এখন একটু বুঝে চলতে হয়—

খাঁ সাহেব একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, তোমরা বুঝে চলতে দিচ্ছ কোথায় বাপু? এই যে চার দিন বাজারে একেবারে গোস্ত পাওয়া গেল না—

আমি বললুম, ওস্তাদ, বাজারে মাছ তো পাওয়া যাচ্ছে—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে খাঁ সাহেব বললেন, মাছ! মছলি! লাহলাল্লা! এই মাছ খেয়েই তো আমার এই অবস্থা হয়েছে। মাছ কি একটা খাবার জিনিস?

মাছের মতন এমন নিরীহ জীবের ওপর অতখানি খাপ্পা হবার কি

কারণ থাকতে পারে, আমরা তা অনুমান করতে পারলুম না। ইত্যবসরে ওস্তাদ গড়গড়ায় দুটি দম লাগিয়ে বলতে লাগলেন, তাজ্জব এই যে, হিন্দুরা এত লেখাপড়া শিখে লায়েক হয়, কিন্তু আল্লার ইশারা তারা মোটেই বুঝতে পারে না। আরে, এটা বুঝতে পারিস না যে, খোদা জমির ওপর এত জায়গা থাকতে মাছের বাসস্থান নির্দেশ করলেন কিনা জলের মধ্যে! মাছ অতি গরম জিনিস, এত গরম যে মানুষের অখাদ্য। দেখ না, দিনরাত তারা জলের মধ্যে বাস করে, কিন্তু মাছের সর্দি হতে কেউ কখনও দেখেছ? হিন্দুরা সেই সাংঘাতিক জিনিসকে জল থেকে তুলে এনে তাতে রাজ্যের গরম মসলা দিয়ে রোজ খাবে। শুধু তাই নয়, এই মাছ নিয়ে হিন্দুরা একটা শাস্তর পর্যন্ত লিখেছে। এই সবের জন্যেই তো বেহেস্তে হিন্দুর স্থান নেই।

ওস্তাদকে ঘিরে আমরা যে কজন মাছ-খোর হিন্দু ব'সে ছিলুম, তাদের পক্ষে এটা বিশেষ গুরুপাক ব'লে বোধ হ'ল না, কিন্তু হিন্দুস্থানী সীতারাম কথাটা হজম করতে পারলে না। সে বললে, খাঁ সাহেব মাছের চেয়ে মাংস তো আরও বেশি গরম—

খাঁ সাহেব এবার নলচে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, কে বললে? এমন কথা কে বলে? আরে, সামান্য বুদ্ধি দিয়েই দেখ না, বকরি, সে জমিনের ওপর চ'রে বেড়ায়, খাদ্য তার ঘাস। তার মাংস কখনও গরম হতে পারে? এইজন্যেই তো মাংস রাঁধতে এত গরম মসলার প্রয়োজন। একদিন মাংস শুধু সিদ্ধ ক'রে খাও দিকি। দেখবে, সর্দিতে ফুসফুস ভ'রে উঠবে।

এমন অকাট্য যুক্তির কাছে সীতারামও হার মানলে। খাঁ সাহেব পরম নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানতে টানতে ক্ষিতীশকে বললেন, এই ক্ষিতীশ, বাজাও।

ক্ষিতীশ কোণ থেকে সেতারটি নামিয়ে সুর বাঁধতে লাগল। ঠিক সেই সময় বাইরে আবার গোল শুরু হ'ল, মারো মারো—

আসরের সবাই উঠে দাঁড়াল। কেউ কেউ ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। কেউ বা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গলাটা যতদূর সম্ভব লম্বা ক'রে দেখতে লাগল। খাঁ সাহেব 'কেয়া আফৎ' ব'লে চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে ব'সে রইলেন। একটু পরে শ্যাম এসে খবর দিলে, একজনকে ছুরি মেরেছে।

সকলে সমস্বরে প্রশ্ন—হিঁদু, না, মোছলমান?

হিন্দু।

অ্যাঁ, হিন্দুকে মারলে পাড়ার ভেতরে!

খাঁ সাহেব সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে, যানে দাও জাহান্নমে গিয়া।

কথাগুলো গুরুপাক হ'লেও, যারা মাছ খায় তারা কোন রকমে হজম ক'রে ফেললে, কিন্তু নিরামিষাশী সীতারামের তা সহ্য হ'ল না। সে একটু খাঁজের সঙ্গে বললে, হিন্দু মরলেই জাহান্নম, আর মুসলমান মরলেই বেহেস্ত, কি বলেন ওস্তাদ?

ওস্তাদ বললেন, বেশখ্‌খ্‌। অর্থাৎ নিশ্চয়ই, এ বিষয়ে কি কিছু সন্দেহ আছে?

সীতারাম বললে, বা রে, বেশ মজার কথা তো!

খাঁ সাহেব বললেন, সীতারাম, তুমি ছেলেমানুষ, এসব কথা নিয়ে তর্ক ক'রো না। এর পরীক্ষা হয়ে গেছে, প্রমাণ হয়ে গেছে। এ নিয়ে কোন প্রশ্নই এখন আর উঠতে পারে না।

সীতারাম এটোয়ার ব্রাহ্মণ। তার শাস্ত্রে লেখে, ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ বেহেস্তে যেতে পারে না। খাঁ সাহেবের বাড়ি থেকে ফিরে গিয়ে এব

ঘন্টা ধ'রে সে স্নান করে, সে অত সহজে ছাড়বে কেন? সে ব'লে ফেললে, এসব আপানার গা-জুরী কথা। এ আমি মানতে রাজি নই। খাঁ সাহেব একবার গলা খাঁকরি দিয়ে বললেন, শুনবে তবে?

আমরা সবাই বললুম, ওস্তাদ, বলুন, শোনা যাক।

হরিহর এতক্ষণ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আফিঙের মৌজে বেহেস্তের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, খাস বেহেস্তের কথা উঠতে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে এগিয়ে এসে বসল। খাঁ সাহেব একবার উঠে দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলেন, আশে-পাশে বেহেস্তের কোন দালাল লুকিয়ে আছে কি না। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে শুরু করলেন।—

বেশি দিনের কথা নয়। কলকাতায় আসবার পাঁচ কি ছ বছর আগে হবে, তখন আমরা লক্ষ্ণৌয়ে থাকি। গোমতীর ধারে আমাদের । বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনে বাড়ি একেবারে জমজম। বাবার অনেক সাধু সন্ন্যাসী ফকির বন্ধু ছিলেন। তাঁরা রোজ আসতেন, জলসা হ'ত। বেশ চলছিল, এমন সময় একদিন হিন্দু-মুসলমানে লাগল ফাটাফাটি। একদিন, ঠিক এই রকম আর কি, চারিদিকে দাঙ্গা চলেছে, আমাদের বৈঠকখানায় আমি আছি, বাবা আছেন, আর আছেন এক ফকির আর এক সাধু। ফকির সাহেব আর স্বামীজী দুজনেই সাধক, এক কথায় তাঁরা দুজনেই ছিলেন :রর বজরুগ। আজ যেমন আমাদের তর্ক বেধেছে, সেদিনও এমনই ধারা বেহেস্তের কথা হতে হতে স্বামীজী আর ফকির সাহেবে লেগে গেল তর্ক। ফকির সাহেব স্বামীজীকে বললেন, তুমি সাধক লোক তা আমি স্বীকার করছি, কিন্তু বেহেস্তে তোমার স্থান নেই।

দুজনে এই নিয়ে তুমুল তর্ক। শেষকালে আমার বাবা বললেন,

আপনারা ক্ষান্ত হোন, এ নিয়ে তর্ক ক'রে কোন লাভ নেই, কারণ এ কথার প্রমাণ এখানে হতে পারে না।

ফকির সাহেব বললেন, এখুনি এর পরীক্ষা হয়ে যেতে পারে।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কি ক'রে?

ফকির সাহেব বললেন, আমরা দুজনে এখুনি এই দেহ ছেড়ে চ'লে যাব। যে বেহেস্ত থেকে সেখানকার প্রধান ফল আনার নিয়ে আসতে পারবে, বুঝতে হবে সে-ই সেখানে গিয়েছিল।

ফকির সাহেবের প্রস্তাব শুনে আমি তো স্তম্ভিত। কিন্তু বাবা দেখলুম কিছুমাত্র ভড়কালেন না। তিনি এসব ব্যাপার এর আগে ঢের দেখেছেন কিনা। তিনি বললেন, খয়ের, এ অতি উত্তম প্রস্তাব।

ফকির সাহেব আর স্বামীজী দুজনে প্রস্তুত হলেন। সাধু আসন-পিঁড়ি হয়ে ধ্যানস্থ হলেন আর ফকির সাহেব একটি ছোট্ট মাদুর পেতে সেখানে নেমাজী-বৈঠক শুরু ক'রে দিলেন। তারপরে 'ইয়া বিসমিল্লা' —এই ব'লে ওস্তাদজী বাঁ হাতের তাবিজটাকে ডান হাতের দুই আঙুল দিয়ে চেপে ধ'রে বিড়বিড় ক'রে কি মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন।

আমরা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম, তারপর কি হ'ল ওস্তাদ?

খাঁ সাহেব চক্ষু মেলে চারিদিকে চেয়ে অতি মৃদুভাবে বলতে লাগলেন, তারপরে দেখতে দেখতে ফকির আর সাধু দুজনের দেহ হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেল। যেখানে সাধু ব'সে ছিলেন সেখানে শুধু তাঁর লেংটি, আর ফকিরের মাদুরে তাঁর আলখাল্লাটি প'ড়ে রইল।

ব্যাপার দেখে আমরা বাপ-বেটায় জড়াজড়ি ক'রে কোণঠাসা হয়ে ব'সে রইলুম। এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা চ'লে গেল, ফকির কিংবা সাধু কারুরই দেখা নাই। শেষকালে রাত যখন কাবার হয় হয়, সেই সময় দেখা গেল, সাধুর ল্যাঙট আর ফকিরের আলখাল্লা ভ'রে উঠছে।

দেখতে দেখতে দুজনেই এসে হাজির হলেন, দুজনের হাতে দুই আনার। সে আনারের যেমন রঙ, তেমনই তার আকৃতি আর তেমনই তার খোশবু। আমাদের সমস্ত মহল্লাটা আনারের খোশবুতে ভরপুর হয়ে উঠল। সাধু তাঁর আনারটি বাবার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, খেয়ে দেখ খাঁ সাহেব।

বাবা সে আনার ভেঙে একটি ক'রে দানা সবার হাতে দিলেন। আহা-হা-হা, শোভনাল্লা! কি তার আস্বাদন! জীবনে এমন আনার কখনও খাই নি। বাবা স্বামীজীর তারিফ ক'রে বললেন, মাশাল্লা সাধুজী, আল্লা তোমার তন্ দুরস্ত রাখুন, আজ তুমি যা খাওয়ালে জীবনে ভুলব না।

তারপরে ফকির সাহেব তাঁর আনারটি বাবার হাতে তুলে দিলেন। আনারটি সাধুর আনারের চাইতে কিছু বড় হবে। তা হোক, গাছের সব ফল আকারে সমান হয় না, তার জন্যে কিছু আসে যায় না। বাবা আস্তে আস্তে আনারটি ভাঙলেন। তোমাদের কি বলব, তোমরা সাকরেদ, ছেলের মতন—কি বলব, হাজার মৃগনাভির ছাল একসঙ্গে ছাড়িয়ে ফেললে যেমন গন্ধ বেরোয়, সেই রকম গন্ধে বোধ হয় দশ মাইল জায়গা আমোদিত হয়ে গেল। তারপরে একটি দানা মুখে দেওয়া গেল। সাধুর আনার সু-তার বটে, কিন্তু এ আনারের তুলনা নেই। সাধুকে পর্যন্ত সে কথা স্বীকার করতে হ'ল।

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, সাধুজী, এর অর্থ কি?

সাধুজী ঘাড় নীচু ক'রে ব'সে ছিলেন, তিনি মুখ তুলে বললেন, আপনাদের কি বলব, আমার এতকালের সাধনা সবই বৃথা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি যখন বেহেস্তের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, তারা আমায় ভেতরে ঢুকতে দিলে না। তারা বললে, তুমি

সাধু লোক, তুমি এখানে ঢুকলে আমাদের সাজা হবে। আমি অনেক অনুনয় করলুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। মনের দুঃখে সেখান থেকে ফিরে আসছি, এমন সময় পথে যেন কে আমার নাম ধ'রে ডাকলে। ফিরে দেখি, আমার ছেলেবেলাকার এক বন্ধু, ইহলোকে তার নাম ছিল আব্বাস। জিজ্ঞাসা করলুম, কি রে আব্বাস, কবে এলি এখানে, কি করছিস, কেমন আছিস?

আব্বাস বললে, এসেছি তো প্রায় বিশ বছর। আমি বেশ আছি, বেহেস্তের গাঁড়াতলার সর্দার হয়েছি। তারপর তুমি যে এখানে?

আব্বাসকে সব কথা খুলে বললুম। সে বললে, আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি, আমি যদি কিছু করতে পারি।

আমাকে সেইখানে দাঁড় করিয়ে রেখে আব্বাস চ'লে গেল। তারপর কিছুক্ষণ বাদেই এই আনারটা সে আমায় এনে দিলে।

এই ব'লে সাধু কাঁদতে লাগলেন। ফকির বললেন, এ আনারও বেহেস্তেরই বটে, কিন্তু সেখানে এই আনারগাছ দিয়ে বাগানের বেড়া দেওয়া হয়। বেড়ার আনারের চেয়ে খাস বাগানের আনার ভাল তো হবেই।

সাধুজী তখুনি হিন্দুয়ানিতে তোবা ক'রে ফকির সাহেবের কাছে কলমা প'ড়ে মুসলমান হয়ে পড়লেন।

এই অবধি ব'লে খাঁ সাহেব তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তামাক টানতে লাগলেন। হরিহর একটু এগিয়ে এসে বললে, খাঁ সাহেব, এর পরের ঘটনাটুকু আরও আশ্চর্য, আপনি জানেন না।

হরিহর ছিল সংসারত্যাগী। তার ওপরে সে হিপ্‌নটিজ্‌ম জানত। খাঁ সাহেব দু-একবার তার ক্রিয়া-কলাপ দেখে তার ভারি ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে তাকেও একজন উঁচুদরের বজরুগ ব'লে মনে

ফকির সাহেব বললেন, রাজি, কিন্তু এখুনি প্রমাণ করতে হবে।

বেশ।—ব'লে বন্ধুকে আবার আসনে বসিয়ে দেওয়া গেল। ঘণ্টা-ানেক ধ্যানস্থ হয়ে ব'সে থাকার পর সে উঠে পড়ল। আমরা জিজ্ঞাসা রলুম, কি হ'ল?

সে বললে, স্বর্গের দূতেরা বললে, আলখাল্লা প'রে ধ্যান করলে স্বর্গে কেতে দেবে না।

বন্ধু আলখাল্লা খুলে ফেলে লেংটি প'রে আবার ধ্যানস্থ হ'ল। এবার ন্তু দেখতে দেখতে তার দেহ হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেল।

প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক পরে বন্ধু আমার একটি আম হাতে নিয়ে ফিরে ল। আহা-হা-হা! কি তার রূপ! খাঁ সাহেব, এ তোমার তোবড়া-খো আনার নয়, এ একেবারে যৌবনের জোয়ারে পরিপূর্ণ, নিটোল। আমের রূপ দেখেই তো ফকিরের দশা লেগে গেল। গুণী লোক কিনা, মাল দেখেই চিনে ফেলেছিল। তারপরে তাঁর চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে এনে একটি চাকলা কেটে মুখে ফেলে দিলুম। ফকির তো খেয়ে একেবারে পাগল। বেহেস্তের আনার যে স্বর্গের াকুতে খায়, এ সম্বন্ধে তাঁর আর তিলমাত্র সন্দেহ রইল না। সেই দিনই ামরা তাঁকে শুদ্ধি করিয়ে হিন্দু ক'রে নিলুম। ফকির সাহেব প্রথমে আলখাল্লা ছেড়ে ন্যাঙট পরতে রাজি হন নি। অনেক বোঝানোর পর ালখাল্লা ছাড়লেন বটে, কিন্তু মুরগী হালাল করবার ছোরাটা আর কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি হন না। শেষকালে তাঁকে হিন্দু-টিমটের দুটো চারটে নিরুপদ্রব প্যাঁচ শিখিয়ে দিতে তিনি ছোরা ছেড়ে টেরই অনুরাগী হয়েছেন।

এই অবধি ব'লে হরিহর চুপ করলে। হিন্দুর অধিকার নিয়ে এই গড়ার বাজারে হরিহর যে একজন মুসলমানকে শুদ্ধি করেছে, সেজন্তে

তার প্রশংসায় আমাদের সবারই বুক ফুলে উঠছিল, কিন্তু অসৌজন্যে
ভয়ে আমরা সবাই চুপ ক'রে রইলুম।

হঠাৎ সেই স্তব্ধতা ভেদ ক'রে খাঁ সাহেবের গড়গড়াটা একটি ক্ষী
প্রতিবাদ জানালে, ঝুট্‌র্‌র্‌র্‌—বাৎ।

মরু-মরীচিকা

মালকোশ রাগ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। খাঁ সাহেব বললেন, এই রাগের ওপরে জিনের আসক্তি আছে।

শিষ্যবৃন্দ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সেটা কি রকম?

খাঁ সাহেব বলতে লাগলেন, মর্ত্যের দরবারের জন্যে মিয়া যেমন দরবারী রাগের সৃষ্টি করেছেন, তেমনই স্বর্গের দরবারের জন্য স্বরুদ্ভুতীজী মালকোশের সৃষ্টি করেন। এই রাগ বাজালে স্বর্গবাসী আত্মাদের মর্ত্যের কথা মনে প'ড়ে যায়। নারদজী এই রাগ ধরাধামে প্রচার করেন।

তবলার ওপরে ডুগিটা উল্টে রেখে দর্শন সিং বললে, খাঁ সাহেব, ওই যে বললেন, মালকোশের ওপরে জিনের আসক্তি, এটা একেবারে নির্ঘাস সত্যি কথা।

উৎসুক শ্রোতৃবৃন্দের আবার প্রশ্ন—সেটা আবার কি রকম?

তা হ'লে বলি শোন। সে এক কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে গয়া শহরে এই কাণ্ড। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা, শহর একেবারে নিষুতি। টেঁড়িজীর বাড়িতে জলসা হচ্ছে, তিনি নিজে এস্‌রার ধরেছেন। মালকোশ আলাপ চলেছে, আসর খুব জ'মে উঠেছে, এমন সময় দেখলুম যে, আসরের এক পাশে আমাদের কিষণদাস লণ্ঠন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই অবধি ব'লে ঠাকুর চোখ দুটো বুজে স্থির হয়ে রইল। সিদ্ধির ঝোঁকে মধ্যে মধ্যে কথার খেই হারিয়ে সে ওই রকম স্থির হয়ে ব'সে থাকত। তার অবস্থা দেখে আমরা ব'লে উঠলুম, হ্যাঁ ঠাকুর, কিষণদাস—

দর্শন সিং তার ভাঙা গলায় গর্জে উঠল, হ্যাঁ খাঁ সাহেব, কিষণদাস, আরে রাম রাম, কিষণদাস দু বছর আগে মারা গিয়েছে, সেই কিষণদাস এসে, ঠিক আগে যে রকম আসত, সেই ভাবে লণ্ঠনটি নিবিয়ে দিয়ে তার নির্দিষ্ট পেরেকটিতে ঝুলিয়ে একেবারে আমার গা-টি ঘেঁষে চেপে বসল। খাঁ সাহেব, আমার তো হাত-পা ঠকঠক ক'রে কাঁপতে শুরু করল। কি বলব, টেঁড়িজী আলাপ করছিলেন, গৎ তোড়া বাজালে আমাকে সেদিন ডাহা বেইজ্জৎ হতে হ'ত।

আবার মিনিটখানেক দম নিয়ে ঠাকুর শুরু করলে, টেঁড়িজীর আলাপ শেষ হয়ে গেলে পাশ ফিরে দেখি, কিষণদাস গায়েব। মুখ তুলে পেরেকের দিকে চেয়ে দেখি, লণ্ঠনও গায়েব।

হয়তো মনের ভুলে কি দেখতে কি দেখেছি মনে ক'রে কথাটা আর কারুকে বললুম না। জলসা ভেঙে যাবার পর বাড়ি চললুম। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, দলে দলে তাঁরা দু পাশের বাড়ির ছাতে ব'সে আছেন। পাগুলো ঝুলিয়ে দিয়েছেন, একেবারে রাস্তায় এসে ঠেকেছে।

ঠাকুরের গল্প শুনে শিষ্যবৃন্দ উৎসাহিত হয়ে উঠল। তারা আশা করছিল, এর পর খাঁ সাহেব যা বলবেন, সেটা একটা শোনবার মতন জিনিস হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকার পরেও খাঁ সাহেবের দিক থেকে কোন জবাবই এল না। সেদিন তাঁর মেজাজটা ভাল নেই স্থির ক'রে আমরা যে যার বাড়ি চ'লে গেলুম।

এর কয়েক বছর পরের কথা। পুষ্কর তীর্থ থেকে ফেরবার পথে আজমীঢ়ে উরুস্‌ পর্ব দেখতে গিয়েছিলুম। বিখ্যাত মুসলমান সাধু মৈহুদ্দিন চিস্তির যে সমাধি সেখানে আছে, সেইখানে তাঁর মৃত্যুদিনে সাত দিন দিন-রাত্রি শ্রাদ্ধোৎসব হয়। উরুস্‌ পর্ব এখন কি ক'রে সম্পন্ন হয় বলতে পারি না, যখনকার কথা বলছি, তখন মুসলমানদের

াজীতাতঙ্ক-রোগটা এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দাঁড়ায় নি। সাধুর শ্রাদ্ধের াঙ্গে সঙ্গে মসজিদের আনাচে-কানাচে ব'সে অনেক পণ্ডিত মিলে তখন ান-বাজনারও শ্রাদ্ধ করতেন। এইখানে, মসজিদের ভেতরে রোগী ং্ব, রাজা ফকির, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি নানা রকমের মানুষ-খিচুড়ির াধ্যে খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আরে, তুমি এখানে ?

বললুম, পুষ্করে গিয়েছিলুম, মনে করলুম, উর্‌স্‌টাও দেখে যাই। এ জন্মে হিন্দুমতে যত পাপ সঞ্চয় করা গেছে, তাতে স্বর্গবাস আমার কেউ মারতে পারবে না। এই সঙ্গে বেহেস্তে যাবারও যদি একখানা াাস যোগাড় করতে পারি তো মন্দ কি ?

খাঁ সাহেব তাঁর শিষ্যকে ভাল ক'রেই চিনতেন। আমার পিঠে াাত চাপড়ে বললেন, বেশ করেছ বেটা। দেখ, এখানে হিন্দু মুসলমান ামানে পূজো দিচ্ছে। এ দৃশ্য না দেখলে একটা ক্ষোভ থাকত।

জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি এখানে ?

খাঁ সাহেব বললেন যে, এখানে এক মেবারী সর্দারের ছেলে তাঁর কাছে বাজনা শিখছে। তাঁকে উদয়পুরেই থাকতে হয়। সম্প্রতি তারা এখানে তাদের বাগানবাড়িতে এসে বাস করছে। এই শহর থেকে াাইল পনরো দূরে তাদের বাড়ি।

কিছুক্ষণ সদালাপের পর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া গেল।

পরদিন বিকেলবেলা বাক্সপত্র গুছোচ্ছি, এমন সময় আমাদের হোটেলের সামনে প্রকাণ্ড এক জুড়ি-গাড়ি এসে দাঁড়াল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি যে, খাঁ সাহেবের ভাতিজা গাড়ির মধ্যে এমন জাঁকিয়ে ব'সে আছে যে দেখলেই মনে হয়, গাড়ি-ঘোড়ার মালিক সে নয়।

আমি ওপর থেকে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি ? চলেছ কোথায় ?

আমাকে দেখেই সে গাড়ি থেকে নেমে একেবারে আমার ঘরে এসে বললে, তোকে নিয়ে যাবার জন্তে এসেছি। সর্দারজী আর খাঁ সাহেব তোকে নেমন্তন্ন করেছেন, আজ ওখানে ভারী জলসা আছে।

আমি বললুম, সে কি! আজ রাত্রি দুটোর গাড়িতে আমি যে আবার যাব, টিকিট কেনা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে।

সে বললে, তার আগে তোমায় এখানে পৌঁছে দিয়ে যাব। তোমায় না নিয়ে গেলে দুজনেই আমার ওপরে নারাজ হবেন।

অগত্যা বেরুতে হ'ল। দু ঘণ্টা কি আড়াই ঘণ্টা ছুটে অশ্বিনীতনয়-যুগল আমাদের ঠিকানায় পৌঁছে দিলে।

সর্দারের বাড়িতে যখন পৌঁছলুম, তখন সন্ধ্যে উতরে গেছে। আসরে বাজনা শুরু হয়েছে। সেখানে যেতেই খাঁ সাহেব সর্দারজীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। উভয় পক্ষ থেকে কিছুক্ষণ আপ্যায়ন চলবার পর আসরে আসন নেওয়া গেল।

কয়েকজন স্থানীয় ওস্তাদের বাজনা হয়ে যাবার পর খাঁ সাহেব সরোদ নিয়ে বসলেন। সরোদের তারে একবার মৃদু আঘাত দিতেই কোণ থেকে একজন ফরমাশ করলেন, খাঁ সাহেব, মালকোশ।

খাঁ সাহেব তার বেঁধে মালকোশ আলাপ শুরু করলেন।

আলাপ চলেছে। আসরে সকলেই সমঝদার, বাজে লোক নেই একটু কাসির শব্দ পর্যন্ত হচ্ছে না। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে একমনে শুনতে শুনতে আমার মনও সুরের স্রোতে ভেসে চলেছে হঠাৎ কে যেন কানে কানে বললে, এই রাগের ওপরে জিনের আসক্তি আছে।

কথাটা শুনে চমকে উঠলুম। বহুদিনবিস্মৃত আর একজনের কথা মনে প'ড়ে গেল। মনে পড়ল, দর্শন সিং ও তার অভিজ্ঞতার কথা

আর তারই সঙ্গে মনে পড়ল যে, দর্শন সিং আজ আর ইহজগতে নেই।

শরীর ও মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। খাঁ সাহেব ততক্ষণে বিলম্বিত লয় শেষ ক'রে মধ্য লয়ে বাজাতে শুরু করেছেন। মালকোশ রাগের গম্ভীর করুণ সুর চোখের সামনে স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে। সুরের সুরায় মাতাল মন আমার একেবারে স্বর্গের দরবারে গিয়ে হাজির। দেখতে লাগলুম, যেন দেবী সরস্বতী মাঝখানে বসেছেন, তাঁর বীণা মোহন অঙ্গুলির আঘাতে শাপভ্রষ্ট বিরহী যক্ষের মত মালকোশের সুরে গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে। সুরপ্রিয় এক ধারে চক্ষু মুঁদে ব'সে আছেন, সুরায় তাঁর আজ রুচি নেই, ভৃঙ্গার আসরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। পরলোক-প্রবাসী আত্মার দল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মালকোশ যেন ইহলোকের সন্দেশহর, তাকে দেখে এই ধরণীর সুখ-দুঃখ আশা-উৎসাহ বিরহ-মিলন যা-কিছু তাদের কাছ থেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তারই মধ্যে ফিরে যাবার জন্যে তারা উতলা হয়ে উঠেছে।

মুখ তুলে একবার চারিদিকে চাইলুম। দেখলুম, অধিকাংশ লোকই চোখ বুজে, বাকি যারা তাদের চক্ষুও অর্ধ-নিমীলিত। দূরে দেওয়ালে একটা বড় লণ্ঠন ঝুলছিল, সেটাও যেন নেশায় ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।

মনকে একবার জোর ক'রে নাড়া দিয়ে চাঙ্গা হয়ে বসতে না বসতে আবার শুনতে পেলুম, কেয়া বূঢ়া বাবু, মেজাজ শরীফ ?

পাশ ফিরে দেখি, আরে! ছ ফুট তিন ইঞ্চি দর্শন সিং দাঁড়িয়ে!

পোড়া অদৃষ্টকেও বলিহারি! কোথায় উর্বশী মেনকা এসে আসরে

নৃত্য শুরু করবে, তা নয় আমার বরাতে এল কিনা—আরে ছ্যাঃ!

চুপ ক'রে আছি দেখে ঠাকুর বললে, ভয় নেই, আমি বেশিক্ষণ থাকব না।

এই ব'লে সে আমার পাশে ব'সে পড়ল। আসরের আর কেউ ঠাকুরকে দেখেছে কি না জানবার জন্যে চারদিকে দেখতে লাগলুম। খাঁ সাহেব তখন মাথা গোঁজ ক'রে দ্রুত লয়ে বাজিয়ে চলেছেন। যারা এতক্ষণ চোখ বন্ধ ক'রে শুনছিল, এবার তারা বিস্ফারিত নয়নে তাঁর আঙুল চালাবার কায়দা দেখছে। সবার চোখ তাঁর দিকে, এদিকে আমার যে কি অবস্থা তা দেখবার অবসর কারুরই নেই।

মালকোশ শেষ হতে প্রায় দশটা বাজল। পাশ ফিরে দেখি, দর্শন সিং উধাও। আর বেশিক্ষণ সেখানে থাকা সুবিধের নয় এই ভেবে খাঁ সাহেবকে বললুম, এবার আমার যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিন। আজ রাতেই আমাকে রওনা হতে হবে।

খাঁ সাহেব সর্দারজীকে বলতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে গাড়ি আনতে হুকুম দিলেন। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে লোক এসে সংবাদ দিলে যে, গাড়িই ঠাকুরাণীদের নিয়ে শহরে গিয়েছে। অন্য সব ঘোড়াই বেদম। একমাত্র গুল্‌কন্দ ছাড়া আর কেউ সোয়ারি দিতে পারবে না।

লোকটির কথা শেষ হতে না হতে খাঁ সাহেব ব'লে উঠলেন, হাঁ৷ হাঁ৷, ঘোড়া হ'লেই চলবে। ভাল ক'রে জিন চড়িয়ে দাও।

ঘোড়ায় চড়বার কথা শুনে তো একেবারে দ'মে গেলুম। এর চেয়ে যে সারারাত্রি জিনের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সে থাকতে রাজি আছি। আমার মতন লোকের এই পনরো মাইল রাস্তা ঘোড়ার পিঠে যেতে হ'লে ঘোড়া কিংবা সওয়ার কারুরই যে উদ্দেশ মিলবে না,

স কথাটা এখন এদের বোঝাই কি ক'রে! একবার ভাবলুম, এখানে থকেই যাই, টিকিটের দামটা না হয়ে যাবে। পাঁচটা টাকার জন্মে কি :বঘোরে প্রাণটা দোব।

মনের অশান্তি বোধ হয় মুখে ফুটে উঠেছিল। আমার দিকে কছুক্ষণ চেয়ে থেকে সর্দারজী খাঁ সাহেবকে কি বললেন। তাঁর কথা শুনে াঁ সাহেব ব'লে উঠলেন, আরে না না, সেজন্মে আপনি কিছু মনে করবেন না। ও বিশ-পঁচিশ মাইল ঘোড়ার পিঠে যাওয়া ওর কাছে কিছুই নয়।

মিথ্যে কথা বলা অন্যায়—এই ব্যবস্থা সমাজকে যাঁরা দিয়েছেন, তাঁরা সত্যিই পণ্ডিত লোক। মনে পড়ল, কলকাতায় থাকতে খাঁ াাহেবের আড্ডায় ব'সে বড় বড় ঘোড়-সওয়ারের অনেক কীর্তি-কাহিনী একটু অদল-বদল ক'রে বেমালুম নিজের ব'লে চালিয়েছি, এখন উপায় কি করি ?

তবুও একবার খাঁ সাহেবকে বলা গেল, ওস্তাদ, আমি তো আজ াাতেই চ'লে যাব, ঘোড়ার কি হবে, কোথায় থাকবে ?

খাঁ সাহেব বললেন, ঘোড়া হোটেলের আস্তাবলে থাকবে। শহরে মামাদের লোক রোজই যাচ্ছে, কাল গিয়ে ঘোড়া নিয়ে আসবে।

কথাবার্তা চলছে, এমন সময় ঘোড়া এসে হাজির হ'ল। সাদা কাঠিয়াবাড়ী ঘোড়া, তার ওপরে দিশী জিন চড়ানো, ঠিক যেন একখানি াাজপুত চিত্র।

সর্দারজী ব'লে দিলেন, ঘোড়াটার মুখ কড়া আছে।

ভাবলুম, আর কড়া আছে! আলগা থাকলেই বা কি সুবিধা হবে মামার!

বৃথা চিন্তায় কালক্ষেপ না ক'রে গুলবদনের পিঠে সওয়ার হওয়া গেল।

ডান পায়ের রেকাব লাগাতে না লাগাতে আরবী ঘোড়ার বংশধর চার পা তুলে ছুট দিলে। সর্দারজীকে তাঁর অনুগ্রহের জন্যে একটা ধন্যবাদ দেবার অবসর পেলুম না।

ছুটতে ছুটতে একটা তেমাথার কাছে এসে ঘোড়া থামিয়ে ফেললুম। কোন্ রাস্তা দিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছিল কিছুতেই তা ঠিক করতে পারলুম না। রাস্তায় আলো নেই, লোকজনও নেই যে পথ জিজ্ঞাসা ক'রে অগ্রসর হব। অনেক গবেষণা ক'রে শেষে ডান দিকের পথে ঘোড়া চালিয়ে দিলুম।

গুল্‌কন্দ আবার ছুট দিলে। একে অনভ্যেস, তার ওপরে সেই গদিওয়ালা দিশী জিন। কখনও ডাইনে কখনও বা বাঁয়ে হেলে কোন রকমে ব'সে আছি। একটু যে আস্তে চ'লে জিরিয়ে নোব, তারও উপায় নেই। রাজপুতানার ঘোড়া আবার দুলকি-চাল জানে না। যেতে বললেই চার পা তুলে ছোটে, আর রাশ টানলেই দাঁড়িয়ে যায়। পথ যে চিনে চলব, তারও উপায় নেই, কারণ ঘোড়ায় চড়ার দিকেই সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিতে হয়েছে।

ওদিকে আনাড়ী সওয়ার পিঠে নিয়ে গুল্‌কন্দেরও দম প্রায় বেরিয়ে এসেছে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমার ও তার দুজনেরই প্রায় সমান অবস্থা।

ঠিক পথে চলেছি কি না, তা জানবার জন্যে এক জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে পড়লুম। কিন্তু অন্ধকারে পথ কিছুতেই চিনতে পারলুম না। মনে হতে লাগল, যেন ভুল পথেই এগিয়ে চলেছি। ঘড়িতে দেখলুম, একটা বেজে গিয়েছে। ভেবে দেখা গেল, যে পথেই আসি না কেন, আজ রাত্রে আড্ডা ত্যাগ করা অসম্ভব। আমি ঘোড়ার মুখ ধ'রে পথের ধারে এক গাছতলায় টেনে নিয়ে গিয়ে, গাছের সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে,

তার পিঠ থেকে গদি নামিয়ে তাই মাথায় দিয়ে বালির ওপরে শুয়ে পড়লুম।

মালকোশের প্রভাব তখনও কাটে নি। জলের মধ্যে ছুঁচোবাজি যেমন ঘুরে বেড়ায়, খাঁ সাহেবের হাতের এক-একটা গমক আমার মগজের মধ্যে এমনই চোঁ-চোঁ ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শান্তিতে হাত পা এলিয়ে এসেছিল, তার ওপরে নৈশ শীতল বায়ু লেগে ক্লোরোফর্মের নেশার প্রথম অবস্থার মতন বেশ একটা আরামদায়ক অবসাদ শরীরকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে লাগল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানতে পারি নি। হঠাৎ একটা তীব্র আলো চোখে লাগায় ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ চেয়েই দেখি, কতকগুলো লোক আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, আর একটা ষণ্ডা মতন লোক অতি কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। বাংলা থিয়েটারের ভীমের মতন তার গালপাট্টা আর গোঁফ, দেহটি কিন্তু ভীমের চেহারার চারগুণ।

শুনলুম, ভীমমুখো অন্য একজনকে বললে, নিশ্চয় সেই, এতে আর কোন ভুল নেই।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক ব্যক্তি গম্ভীরভাবে ব'লে উঠল, তবে আর কেন, লাগাও।

ধড়মড় ক'রে উঠে একবার ভাল ক'রে চারদিক চেয়ে দেখি যে, এক ব্যক্তি একটা লণ্ঠন আমার মুখের কাছে ধরেছে আর তিন-চারজন লোক আমার দিকে চেয়ে আছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস হ'ল না। দু হাতে বেশ ক'রে চোখ রগড়ে আবার দেখলুম, যথাপূর্বং।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন বললে, এই, ওঠ।

ব্যাপার কি? কারা এরা? এত ক্রোধেরই বা কারণ কি? কিছুই

বুঝতে পারলুম না। একবার মনে হ'ল, মালকোশের ঝোঁক কি এখনও কাটে নি? এরা কি জিন, না ডাকাত?

রাজপুতানায় ঘুরে ঘুরে যে কটি ঝাড়সাই বুলি শেখা গিয়েছিল, তাই এক রকম জোড়াতাড়া দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ ক'রে বললুম, কে তোমরা? কি চাও?

ভীমরূপী লোকটা এক বিরাট হুঙ্কার ছেড়ে বললে, চোপ রও।

ভীমের পাশেই একটা রোগা মতন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। এই ব্যক্তি এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। ভীমের হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই সে কোমর থেকে সাঁই ক'রে একখানা ছোরা টেনে নিয়ে তার বেদানার মতন তোবড়ানো মুখ আরও বিকৃত ক'রে বললে, বিনা বাক্যব্যয়ে এখান থেকে আমাদের সঙ্গে চল। আর একটি কথা বলেছ কি এই ছুরি বুকে বসিয়ে দোব।

বিনা বাক্যব্যয়েই উঠে দাঁড়ালুম। উঃ, মালকোশে কি এতদূর পর্যন্ত হয়! কি করতে চায় এরা আমাকে নিয়ে? কোথায় নিয়ে যেতে চায়?

কি একটা কথা তাদের জিজ্ঞাসা করব ব'লে ভাবছিলুম, এমন সময় একটা লোক আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে বললে, আবার দাঁড়ালি যে?

চল, কিন্তু আমার ঘোড়া—

ভীম একজনকে হুকুম দিলে, এই, ঘোড়াটাকে নিয়ে এস।

চার-পাঁচজন প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে চলতে লাগলুম। কি যে হচ্ছে, কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। বিপদে পড়লুম, না এটা সৌভাগ্যেরই সূচনা হ'ল, তাও ধরতে পারছিলুম না। ওদিকে আমার প্রহরীদের মুখে গালাগালির তুবড়ি ছুটেছে। মাঝে মাঝে পেছন থেকে আচমকা এক-আধটা গুঁতো, গোঁজা, ধাক্কা, এ তো চলেইছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা এই ভাবে চলবার পর তারা আমায় একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। ভীম বললে, একেবারে ভেতরে নিয়ে চল, এখানে নয়।

তার কথা শুনে অন্য লোকগুলো আমায় ঠেলতে ঠেলতে দোতলার একখানা বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে ফেললে। ঘর ও সেখানকার আসবাবপত্র দেখলে মনে হয় যে, বাড়ি যাদের, তারা ধনী ও শৌখিন লোক। ঘরখানা ভাল ক'রে দেখছি, এমন সময় ভীম একটা চাবুক হাতে সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল।

চাবুকটা একবার সট ক'রে আওয়াজ ক'রে ভীম বললে, আজ তোমার শেষ দিন।

ভয়ে আমার কালঘাম ছুটতে আরম্ভ করল। উঃ, মালকোশের কি ভীষণ পরিণাম! এখন কি করি? কি ক'রে এই সব দৈত্যদানাদের হাত থেকে উদ্ধার পাই? মনের মধ্যে একটা আশা হচ্ছিল যে, কোন রকমে রাতটা কাটাতে পারলে হয়। খাঁ সাহেবের মুখে শুনেছিলুম যে, দিনের আলোতে জিনের দেহ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। নানা রকম ভাবনায় মগজের মধ্যে ঝিঁঝি ডাকতে শুরু হ'ল। ভীমের কথার কি উত্তর দোব তাই ভাবছি, এমন সময় সেই বেদানামুখো লোকটা বললে, তোমার এ রকম ব্যবহারের কারণ কি?

এটা যে আমারই প্রশ্ন, সে কথা এদের এখন বোঝাই কি ক'রে? চুপ ক'রে রইলুম।

এক ব্যক্তি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে জোরে আমায় একটা লাথি মেরে বললে, আবার কথা কওয়া হচ্ছে না, মৌনী হয়েছেন!

আমি বললুম, কি কথা বলব? তোমাদের কোন কথাই আমি বুঝতে পারছি না।

ধাঁ ক'রে গালে একটা চড় এসে পড়ল। চড়টা এত অকস্মাৎ

ও অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়ল যে, কে যে সেটা মারলে, তা বুঝতেই পারলুম না।

ভীম বলতে লাগল, অকৃতজ্ঞ! খেতে পেতিস না, আমার বাবা তোকে খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করলে, তার মেয়েকে বিয়ে ক'রে শেষ-কালে এই ব্যবহার!

বলতে বলতে ভীম উত্তেজিত হয়ে চাবুকের বাঁট দিয়ে পায়ের গাঁটে ঠকাং ক'রে এক ঘা বসিয়ে দিলে।

আমি বললুম, মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে, তোমরা নিশ্চয় ভুল করছ, আমি সে ব্যক্তি নই।

বদমাইস, মাথার চুল অন্য রকম ক'রে ছেঁটেছ ব'লে মনে করেছ আমাদের চোখে ধুলো দেবে! তা পারবে না, আজ তোমাকে খুন ক'রে এইখানে পুঁতে রাখব।

আবার একটি চড়।

পাজি, স্ত্রীকে এখানে ফেলে তুমি চারিদিকে মজা ক'রে বেড়াচ্ছ, আর এদিকে চোখের জলে তার দিন কাটছে। কোথায় ছিলি এতদিন, বল্ শিগগির?

আবার একটি বিষম গোঁজা।

উঃ! মনে হ'ল, এই অনাহূত কিল-চড়গুলো বাদ দিলে মোটের ওপর ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে মন্দ নয়। জিনদের রসিকতার মধ্যে দেখছি বেশ মৌলিকতা আছে।

ওদিকে তুমি মজা ক'রে বেড়াচ্ছ, আর এদিকে তোমাকে ধরবার জন্যে আমরা এই তিন-চার বছরে প্রায় লাখ টাকা খরচ করেছি।

হায় হায়! বলে কি এরা! আমার জন্যে এক জায়গায় লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল, আর আমি কিনা খাতা বগলে নিয়ে প্রকাশকদের

[দ]রজায় দরজায় ঘুরেই জীবনটা কাটিয়ে দিলুম! দুরদৃষ্ট আর কাকে [ব]লে?

চাবুকের বাঁট দিয়ে ভীম আর একটা খোঁচা দিয়ে বললে, এখন [ত]োমার মতলব কি? মনে রেখো, আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে [য]াবে।

মনটা তখনও মুগ্ধ ভ্রমরের মতন ওই খরচ-হয়ে-যাওয়া লাখ টাকার [চ]ারপাশে ঘুরছিল। ভীম আর একটা খোঁচা দিয়ে আমায় সজাগ [ক]'রে জিজ্ঞাসা করলে, চুপ ক'রে থাকলে একেবারে জন্মের মত চুপ [ক]রিয়ে দোব বলছি। মতলবখানা কি, খুলে বল।

বললুম, মতলব আর কি? আমার জন্যে যদি আর কিছু খরচ করবার ইচ্ছে তোমাদের থাকে তো সেটা আমাকে নগদ ধ'রে দাও।

কাচের ওপরে পাথর ঘষলে যেমন শব্দ হয়, ঠিক সেই রকম ক্যাঁককেঁ্যাকে স্বরে কানের পাশে একজন ধমকে উঠল, আবার রসিকতা [হ]চ্ছে?

বললুম, সম্পর্কটা তো সেই রকমই সাব্যস্ত করবার চেষ্টা চলেছে বাপু।

চোপ রও :—ব'লে সেই ক্যাঁককেঁ্যাকে লোকটা আমার বাঁ গালে এক [চ]ড় কষিয়ে দিলে। এক চড়ে সর্বাঙ্গ চিড়বিড়িয়ে উঠল। বুঝতে পারা [গ]েল যে, আগেকার সেই চড়টি এই ব্যক্তির কাছ থেকেই এসেছিল। আর তো সহ্য হয় না। আর এ তো ঠিক জিনের ব্যাপার ব'লেও মনে [হ]চ্ছে না। একজন বলে, চুপ ক'রে থাকলে একেবারে চুপ করিয়ে দোব। আর একজন কথা কইলে চড় হাঁকড়ায়। কথা বলা আর চুপ ক'রে থাকার মাঝামাঝি কি হতে পারে, তাড়াতাড়িতে তাও ঠিক ক'রে উঠতে পারলুম না। এদিকে মার খেতে খেতে যে বেদম হয়ে পড়লুম! ঠিক

করলুম, এবার যে মারবে, তাকেই মারব। ব'সে ব'সে কাঁহাতক গালাগালি আর চোরের মার হজম করা যায়?

চুপ ক'রে আছি দেখে ভীম আবার জিজ্ঞাসা করলে, এখন আবার মতলব কি? এখানে ভদ্রভাবে থাকবে, না যমের বাড়ি পাঠিয়ে দোব?

আমি বললুম, তা হ'লে আমায় দিনকতক সময় দাও। ঘরে ব্রাহ্মণী আছেন, তাঁর সঙ্গে পাকা রকমের একটা কাটান-ছিটেন ক'রে আসি। কথাটা তারা বোধ হয় বুঝতে পারলে না। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, কি, কি বললে?

আবার বললুম, দেশে স্ত্রী রয়েছে, তার সঙ্গে একটা ব্যবস্থা ক'রে আসতে হবে তো?

ভীম বলতে লাগল, আবার যে বিয়ে করেছ, সে কথা আমরা আগে বুঝতে পেরেছিলুম। এর মধ্যে নিশ্চয় অন্য স্ত্রীলোক আছে, নইলে হঠাৎ তুমি তোমার ধর্মপত্নীকে ফেলে পালাবেই বা কেন? পাষণ্ড!

ক্যাঁকক্যাঁকে লোকটা বললে, তবে আর ওর ওপরে মায়া কিসের? লাগাও।

ও বাবা! এতক্ষণ এঁরা তা হ'লে আমার প্রতি মায়া করছিলেন! মায়ার অবতারেরা এবারে সাংঘাতিক একটা কিছু করবেন, এই আঁচ পেয়ে একটা কিছু অস্ত্রের জন্যে চারদিকে তাকাতে লাগলুম। কিন্তু আমি প্রস্তুত হতে না হতে আবার সেই রকম একটা চড় পড়ল।

যা থাকে কপালে, আর নয়, এই স্থির ক'রে ক্যাঁকক্যাঁকের গালে ঠেসে একটি চড় কষিয়ে দিলুম। চড় খেয়েই সে মাথা ঘুরে প'ড়ে গেল। একবার উঠতে চেষ্টা করলে, কিন্তু আবার ঘুরে পড়ল। তার অবস্থা দেখে অন্য লোকগুলা চেঁচিয়ে আমাকে মারতে এল। আমি উঠে দেওয়ালে গা দিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হলুম। তারপরে রীতিমত

যুদ্ধ। তারা দূর থেকে জুতো লাঠি গাড়ু গামছা হাতের কাছে যে যা পেলে, তাই ছুঁড়ে আমাকে মারতে লাগল।

গোলমাল শুনে ঘরের মধ্যে আরও তিন-চারজন লোক এসে পড়ল। তারা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল, ঘরে ঢুকেই যুদ্ধে লেগে গেল।

সেই সাত-আটজন লোক এক দিকে, আর আমি একা এক দিকে, এই ভাবে কতক্ষণ আত্মরক্ষা করা সম্ভব? শেষকালে একখানা বড় শতরঞ্চি চাপা দিয়ে তারা আমায় ধ'রে ফেললে।

তারপরে সেই আট-দশজনে মিলে আমার ওপরে কিল, গুঁতো, গাঁট্টা, গোঁজা, লাথি, চড়, ঠুসো, ঠাসা যার যা খুশি স্বাধীনভাবে চালাতে আরম্ভ ক'রে দিলে। শুধু-হাতে মারতে বোধ হয় তাদের অঙ্গে ব্যথা লাগছিল, তাই শেষকালে তারা সশস্ত্র হয়ে আসতে লাগল। কেউ ছুরি, কেউ তলোয়ার, কেউ বা লাঠি, কেউ বা সড়কি। কিছুক্ষণ আগেও যদি তারা অস্ত্র নিয়ে আসত, তা হ'লে একজনের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কিছু পরিমাণে আত্মরক্ষা করতে পারতুম। কিন্তু তখন আমার প্রায় হয়ে এসেছিল। একজন দূর থেকে পায়ে এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিতেই প'ড়ে গেলুম ও সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় ছিলুম জানি না। চৈতন্য ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে অত্যন্ত বেদনা বোধ করতে লাগলুম। বুঝতে পারলুম যে, হাত পা দৃঢ়ভাবে বাঁধা। যে ঘরে আমায় প্রথমে নিয়ে আসা হয়েছিল, এটা সে ঘর নয়। ঘরের মধ্যে বাতি নেই, অন্ধকার ঘুটঘুট করছে।

আমার সেই অদ্ভুত অবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে মাথা ঘুরতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

এবার যখন জ্ঞান হ'ল, তখন শরীরের গ্লানি অনেকখানি কেটে

গিয়েছে। ঘরখানার এক দিকের দেওয়ালের একটা ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে খানিকটা রোদ্দুর ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল। আমার মনে হতে লাগল, বদ্ধ ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে আমার জীবনবন্ধু অরুণ যেন মুক্তির খোশ-খবর-ভরা একখানা খাম সম্মুখে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। একবার দাঁত দিয়ে হাতের বন্ধন খুলে ফেলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু মানুষের দাঁত আহার্যের আস্বাদন পেতেই ব্যগ্র, মুক্তির আস্বাদন সে জানতেই চাইলে না। কিছুক্ষণ টানাটানি ক'রে সে কার্যে ক্ষান্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

ঘুমের জন্যে বেশি চেষ্টা করতে হ'ল না। সে যেন মাথার শিয়রেই ব'সে ছিল, ডাক দিতেই চোখের ওপরে সে তার সুপ্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিলে।

সেবারে বোধ হয় অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম। দরজা খোলার আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। ক্লান্তির অবসাদে দেহ তখনও অবশ, চোখ চাইতে আর ইচ্ছে করছিল না। হঠাৎ নারীকণ্ঠের শব্দ কানে এল। শুনলুম সে বলছে—আচ্ছা, তোমরা যাও, আমি একবার গিয়ে দেখি।

নারী যে শক্তির অংশ—এ বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নেই। মুমূর্ষুর মত নির্জীব হয়ে প'ড়ে ছিলুম, নারীর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই শরীরের মধ্যে বেশ একটা উৎসাহের আবেগ সঞ্চারিত হতে লাগল।

তখুনি একজন পুরুষ বললে, দেখবে আবার কি? ওকে আমরা খুন ক'রে ফেলব।

নারীকণ্ঠ শুনে দেহে যতটুকু উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল, পুরুষের কণ্ঠে খুন হবার কথা শুনে উৎসাহের সে গতি দ্বিগুণ বেগে উৎস-মুখে ফিরে গেল।

নারীকণ্ঠে আবার উচ্চারিত হ'ল, তবুও আমি একবার দেখে নিই।

ভীম বললে, আচ্ছা, দেখ। আজ সন্ধ্যের মধ্যে যদি ওর কাছ থেকে কোনও পাকা কথা না পাওয়া যায়, তা হ'লে রাত্রেই ওকে শেষ করব।

চুপ ক'রে প'ড়ে রইলুম। মনকে প্রবোধ দিতে লাগলুম যে, খুনই হই আর মুক্তিই পাই, যা হয় একটা কিছু আজই সন্ধ্যের মধ্যে হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ আগে দরজা খোলার শব্দ হয়েছিল, এবারে মনে হ'ল, দরজাটা যেন বন্ধ হ'ল। বুঝতে পারলুম, ঘরের মধ্যে কেউ এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। যে এল, সে ধীরে ধীরে আমার সামনে এসে বসল।

অত্যন্ত বিপদের পাশেও শিকার থাকলে কূর্ম যেমন সাবধানে খোলের ভেতর থেকে মুখ বের করে, ঠিক সেই রকম সন্তর্পণে আমার চোখ দুটো একবার দেখে নিলে যে, আমার সম্মুখে যে ব'সে আছে সে নারী।

ধীরে ধীরে সে আমার হাত ও পায়ের বন্ধন খুলে দিলে। শরীরের বেদনা তখনও যায় নি। নড়তে-চড়তে কষ্ট হচ্ছিল, তবুও কোন রকমে উঠে বসলুম।

মুখ তুলে দেখলুম, আমার সামনে ব'সে আছে এক নারী। মুখের ওপরকার ওড়না তার ঘাড়ের ওপরে চ'লে পড়েছে। মেঘাবৃত পূর্ণ শশীর মত বিষণ্ণ তার মুখ; নয়নকোণে অশ্রুর জোয়ার সবেমাত্র তার রেখা ফেলে রেখে পালিয়েছে।

কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে, কি?

আমিও বললুম, কি?

আবার কিছুক্ষণ নীরব। যুবতীর তুই গাল বেয়ে টপটপ ক'রে অশ্রুজল ঝ'রে পড়তে লাগল।

এ আবার এক নতুন বিপদ হ'ল দেখছি! ভাবতে লাগলুম, খুন হবার জন্যে বোধ হয় সন্ধ্যে অবধি আর অপেক্ষা করতে হ'ল না। সামনে ব'সে অপরিচিতা সুন্দরী যদি এই ভাবে কাঁদতে থাকে, তা হ'লে তো সন্ধ্যের আগেই আত্মহত্যা ক'রে ফেলতে হবে। কি ব'লে তাকে সান্ত্বনা দোব তাই ভাবছি, এমন সময় সে বললে, কেন তুমি আমায় ফেলে এমন ক'রে চ'লে গিয়েছিলে?

আমি তাকে বললুম, সুন্দরী, তোমরা যাকে মনে করেছ, সে ব্যক্তি আমি নই। আমি মুসাফের, পথ হারিয়ে এই দিকে এসে পড়েছিলুম। তোমার বাড়ির লোকেরা ভুল ক'রে আমায় ধ'রে এনেছে। তুমি আমায় ভাল ক'রে দেখ, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।

যুবতী সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, তুমি সেই, তুমি সেই। পোশাক বদলে আর মাথার চুল অন্য রকম ক'রে ছেঁটে কি আমায় ভোলাতে পারবে?

আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, তোমায় আমি আর ছাড়ব না। এইখানে বন্ধ ক'রে রেখে দোব, আর পালাতে পারবে না।

একবার মনে হ'ল, যা থাকে কপালে, থেকেই যাই; তারপর না হয় সময় বুঝে একদিন লম্বা দোব। বললুম, সুন্দরী, আমি তো বিদেশী, তোমাদের ভাষা কিছুই জানি না বললেই হয়। এই কিড়িরমিড়ির ভাষায় প্রেমের বুলি শিখতে যে অনেকদিন লেগে যাবে! ততদিনে আমার কথা তো ছেড়েই দাও, তোমার যৌবনই কি থাকবে?

কথাটা শুনে সুন্দরী চ'টে গেল। মুখটা অত্যন্ত অপ্রসন্ন ক'রে আমার

দিকে রেগে চেয়ে রইল। এদের ধাতে দেখছি ঠাট্টা জিনিসটা একেবারে সহ্য হয় না। সে কিছু বলবার আগেই আমি ব'লে ফেললুম, দেখ, আমায় ছেড়ে দাও। তোমরা যাকে মনে ক'রে আমায় ধরেছ, আমি সে লোক নই।

এবার সে আমার একখানা হাত ধ'রে বললে, তোমায় ছাড়ব না। কেমন যাবে যাও দিকিনি?

না, থেকেই যেতে হ'ল দেখছি। সুন্দরীর এই অনুনয় ঠেলে যে পাষণ্ড চ'লে যেতে পারে, সে যাক। আমার সে চরিত্রবল নেই।

মনে মনে ভাবতে লাগলুম যে, ব'লে ফেলি—আচ্ছা সুন্দরী, তোমার কথাই থাক্‌, আমি র'য়ে গেলুম। কিন্তু তখুনি মনে হ'ল যে, এই নারী প্রতিদিন অন্য লোক মনে ক'রে আমাকে তার প্রেম-নিবেদন করবে। ওই মৃণাল-কোমল বাহুলতা অন্য লোক ভ্রমে আমায় আলিঙ্গন করবে। তারপরে, তারপরে—যাক, আর চিন্তায় যোগাল না। জোর ক'রে ব'লে ফেললুল, না সুন্দরী, আমি তোমার স্বামী নই। আমাকে ছাড়তেই হবে।

হ্যাঁ, তুমিই আমার স্বামী।

ব্যাপারটা যে গুরুতর হয়ে দাঁড়াল দেখছি! আমি বললুম, আচ্ছা, তোমার স্বামীর অঙ্গে কোনও দাগ ছিল?

হ্যাঁ, ছিল। ছিল কি, আছে।

কোথায়?

আচ্ছা, তোমার জামাটা খোল।

না, আগে তুমি বল।

বলব?

হ্যাঁ, বল।

তোমার ডান দিকের পাঁজরায় একটা দাগ আছে।

তাড়াতাড়ি জামাটা খুলে ফেললুম। সর্বনাশ! ছেলেবেলা ফুটবল খেলতে খেলতে প'ড়ে গিয়ে পাঁজরার কাছে কেটে গিয়েছিল। সেই দাগটা দেখিয়ে দিয়ে রমণী ব'লে উঠল, এই দেখ। আমার সঙ্গে চালাকি?

আর কথা বলা অসম্ভব হ'ল। এই একটা তুচ্ছ দাগ, যাকে এতদিন অতি সামান্য ব'লেই বিবেচনা ক'রে এসেছি, সেইটেই শেষে আমার জীবনে চিরজীবনের দাগা হয়ে রইল।

জয়ের আনন্দে সুন্দরীর মুখ খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠল। এবার সে হাসতে হাসতে বললে, কেমন, আমার সঙ্গে আর চালাকি করবে? দেখি, আর কত চালাকি জান তুমি! তোমাকে যে আমি তোমার চেয়ে বেশি চিনি, এই চার বছরেই সে কথা কি ভুলে গিয়েছ?

সত্যি কথা বলতে কি, আমারই তখন নিজের সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছিল। মনে হতে লাগল, এতদিন কি তবে স্বপ্নে ছিলুম? না, এটাই স্বপ্ন? স্বপ্নই হোক আর সত্যই হোক, সহজে যা এসেছে সহজেই তাকে গ্রহণ কর। মানুষের জীবনে এমন অবসর কখনও আসে না। অধরের সম্মুখে এই যে পিয়ালা, কেন তা নিঃশেষে পান ক'রে ফেলি না? কদিনের এ জীবন? হয়তো কালের ফুৎকারে কালই বুদ্বুদের মত এ মিলিয়ে যাবে।

স্বপ্নের দোলায় চ'ড়ে কল্পলোকের কুঞ্জবনে দোল খাচ্ছি, এমন সময় সুন্দরীর কণ্ঠস্বর কানে গেল।

শুনেছি, তুমি আবার বিয়ে করেছ?

যাঃ, নেশা ছুটে গেল।

সুন্দরী আবার বলতে আরম্ভ করলে, এখানে তাকে নিয়ে এস।

আমরা দুজনে মিলেমিশে থাকব। আমায় যে দিব্যি করতে বল করছি, তার সঙ্গে আমি কখনও ঝগড়া করব না। শুধু তুমি আমায় ছেড়ে যেও না।

বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে আবার টপটপ ক'রে জল পড়তে লাগল। তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখও জলে ভ'রে উঠল। এই প্রেমপাত্র অবহেলায় ঠেলে ফেলে যে হতভাগ্য চ'লে গিয়েছে, তার প্রতি আক্রোশে আমার দেহ-মন ভ'রে উঠতে লাগল।

সুন্দরী কাঁদতে কাঁদতে আবার বললে, কি গো, কথা কইছ না যে?

আমি বললুম, সুন্দরী, কি কথা বলব? তোমরা যে বিষম ভুল করেছ, সে কথা কি ক'রে তোমাকে বোঝাব? কি করলে তোমার বিশ্বাস হবে যে, আমি তোমার স্বামী নই?

আমার কথা শুনে এবার সে কোন উত্তর না দিয়ে ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে রইল। অনেকক্ষণ সেই ভাবে ব'সে থেকে সে মুখ তুলে বললে, বেশ, তুমি যদি চ'লে যেতে চাও তো আমি তোমার সুখের পথে কাঁটা হতে চাই না। যাও তুমি, কিন্তু মনে রেখো, আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

আমি বললুম, যদি দয়া ক'রে ছেড়ে দেবে তো এখুনি দাও। না হ'লে সন্ধ্যেবেলা তোমার ভাইয়েরা এসে আমায় মেরে ফেলবে।

যুবতী বললে, না, তারা কেউ বাড়ি নেই, তাদের ফিরতে দেরি হবে। আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি।

আমার ঘোড়া আছে তোমাদের আস্তাবলে—সাদা ঘোড়া, সেটাকে দাও।

একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে সে বললে, এখনও সেই রকম ঘোড়ার শখ আছে?

কথাটা শুনে অতি দুঃখেও হাসি এল। কিন্তু মুক্তির আশ্বাস পেয়ে মন তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাই বাজে কথায় সময় নষ্ট না ক'রে বললুম, দেখ, সাইসকে ঘোড়া আনতে ব'লো না। আমায় আস্তাবলটা দেখিয়ে দাও, আমি নিজেই জিন চড়িয়ে নোব। পালাচ্ছি—সে কথা তুমি ছাড়া আর যেন কেউ না জানতে পারে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে বললে, কেন, আমি কি জিন চড়াতে জানি না?

আধ ঘণ্টা পরে সে ঘরের মধ্যে এসে বললে, এস, এরা এখন কেউ নেই, এই বেলা পালাও।

তারপর সে আমাকে কতকগুলো সরু দেওয়াল-ঘেরা গলি-পথ দিয়ে একেবারে বাড়ির পেছন দিকে নিয়ে গেল। সেখানে আমার ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাড়াতাড়ি তার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় সে আমার একখানা হাত ধ'রে বললে, ওগো, তুমি কি এত নিষ্ঠুর হয়েছ? একবার ছেলেটাকে দেখে যাবে না?

ছেলে! হ্যাঁ, কই, ছেলেকে নিয়ে এস, দেখি।

সুন্দরী ছুটে গিয়ে ছোট্ট একটি ছেলেকে নিয়ে এল। সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি, তাকে দেখলে অতি বড় পাষণ্ডের প্রাণও স্নেহে গ'লে যায়। তার কোল থেকে ছেলেটিকে নিয়ে দু গালে চুমু খেয়ে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললুম, সুন্দরী, তোমার উপকার জীবনে কখনও ভুলব না। তোমার স্বামীকে খুঁজে বের করাই আজ থেকে আমার প্রধান ব্রত হয়ে রইল। তোমার স্বামীর নাম কি?

সুন্দরীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, অশ্রুজলে তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে। ছেলেটাকে এক হাতে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে একটুখানি ম্লান হেসে আমার মুখের ওপরে দরজাটা সে বন্ধ ক'রে দিলে।

প্রত্নের প্রেত

সাহিত্য-চর্চা ছেড়ে দিয়েছি ব'লে বন্ধুরা প্রায়ই অনুযোগ করেন, তাঁদের কথার যে কি জবাব দোব, তা বুঝতে পারি না। মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখি, প্রকাশ করি না। মধ্যে মধ্যে মনকে ফাঁকি দিয়ে চোখ দিয়ে দু-এক ফোঁটা জলও বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু আমার ও পথ মাড়াবার আর জো নেই। সরস্বতীর নিকুঞ্জে পৌঁছবার রাস্তার দু ধারে যতগুলি দাঙ্গাবাজ গুণ্ডা আড়ালে-আবডালে ঝোপে-ঝাপে লুকিয়ে আছে, বরাতের গুণে তারা একে একে সবাই আমাকে আক্রমণ করেছিল, গাঁটে যা ছিল তা তো কেড়ে নিয়েছে, উপরন্তু ব'লে দিয়েছে যে, এ পথ মাড়ালে এবার প্রাণটি পর্যন্ত যাবে। তাদের অত্যাচারে সাহিত্য-রোগ আমার সেরে গিয়েছে, কিন্তু রোগের ভয়টা এখনও যায় নি।

ছেলেবেলায় কবি হবার সাধ মনের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। রোজ গাদা গাদা কবিতাও লিখতুম, বাড়ির সবার মুখে আমার কবিতার প্রশংসা আর ধরত না, তাঁরা শেলী না কীট্স এই রকম কি একটা খেতাবও আমায় দিয়েছিলেন। কিন্তু কবি হওয়া আমার বরাতে নেই। আমার কবিতা লেখার অভ্যাস যদি স্থায়ী হ'ত, তা হ'লে কবিতার বাজারে আজকাল যাঁরা আসর জমিয়ে বসেছেন, তাঁদের অনেককেই অন্য আসরে আশ্রয় নিতে হ'ত। কিন্তু পরের উপকার করার দিকে ঝোঁকটা ছেলেবেলা থেকেই কিছু বেশি পরিমাণে থাকায় কবিতা লেখা ছেড়ে দিলুম। অবশ্য আমার কবিতা লেখা ত্যাগ করার মূলে মাসিক-পত্রিকাগুলির সম্পাদকদের যে কোন হাত ছিল না, সে কথা হলফ ক'রে

বলতে পারি না, তবে সে কথাগুলো আর প্রকাশ করব না, রসিক যাঁরা সেটা তাঁরা বুঝে নেবেন।

ওই একই কারণে গল্প ও উপন্যাস লেখাও ত্যাগ করতে হয়েছিল। এবারের মতন সাহিত্য-চর্চা এখানেই শেষ হ'ল মনে ক'রে মনটা ভারি হ'য়ে গেল, ঠিক এই সময়ে দু-একজন বন্ধু আমায় গল্প-কবিতা ছেড়ে সমালোচনায় মন দিতে পরামর্শ দিলেন। শুধু সাহিত্য-ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যের বাইরে যে বাস্তব ব'লে আর একটা বড় ক্ষেত্র আছে, সেখানেও এমন বন্ধু ও এমন অমোঘ উপদেশ আমি কখনও পাই নি।

আমি সমালোচক হলুম। ছোটগল্পকে চুটকি-গল্প নাম দিয়ে বর্তমানের গল্পলেখক-সম্প্রদায়কে গালাগালি দিয়ে কোন এক মাসিক-পত্রে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেওয়া গেল। আশ্চর্যের বিষয়, এবার আর সাত দিন যেতে না যেতেই লেখা ফিরে এল না। প্রবন্ধ তো বেরোলই, উল্টে অন্য কাগজ থেকে লেখার জন্যে তাগাদা আসতে লাগল যেসব সম্পাদক আমার কবিতার ওপর একটু-আধটু টিপ্পনী কেটে ফেরত দিতেন, তাঁরাও সমালোচনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ চেয়ে পাঠাতে লাগলেন। দেখতে দেখতে সাহিত্যের বাজারে সমালোচক ব'লে আমার একটা সুনাম র'টে গেল। ভাবলুম যে, গল্প আর কবিতা লিখে জীবনটাকে নষ্ট ক'রে ফেলেছিলুম আর কি!

তখনও আমি কলেজে পড়ি। কলেজ থেকে বাইরে বেরোবার আগেই একজন উঁচুদরের সমালোচক ব'লে আমার নাম র'টে গিয়েছিল।

লেখাপড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার চেয়ে একটা বড় রাস্তা আমার চোখের সামনে খুলে যাওয়ায়, সে রাস্তা ছেড়ে সাহিত্যের আর একটা রাজপথে প্রবেশ করেছিলুম। এই রাস্তায় যদি না যেতুম তা হ'লে সাহিত্য-চর্চা আমায় ছাড়তে হ'ত না।

কলেজ ছেড়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটা বড় শহরে এক কলেজের অধ্যাপকের চাকরি পেয়ে দেশ ছেড়ে চ'লে যেতে হ'ল। শহরে অনেক বাঙালীর বাস, এইখানে এসে আমার প্রত্নতাত্ত্বিক হবার শখ চেপেছিল। এই নতুন শখের কারণ যে একেবারে ছিল না, তা নয়। আমি দেখতুম যে, শহরের চারিদিকে যেখানেই যাই সেখানেই একটা না একটা অদ্ভুত পাথরের মূর্তি প'ড়ে রয়েছে। রাস্তার ধারে এই পাথরের মূর্তিগুলো কতদিন ধ'রে এই ভাবে অবহেলায় প'ড়ে রয়েছে, তার ঠিকানা নেই। এক-একটা মূর্তির পেছনে কত বড় বড় ইতিহাস, কত আশ্চর্য কাহিনী, হয়তো কত প্রণয়ীর অশ্রুজল ও দীর্ঘশ্বাস জড়িত রয়েছে, তা কে বলতে পারে! কোন কোন জায়গায় পল্লীর গরিব লোকেরা তাদের পাড়ায় একটা মূর্তির অদ্ভুত নাম দিয়ে মূর্তিটাকে সিঁদূর মাখিয়ে পূজো করে। আমার বাড়ি থেকে কলেজ ছিল প্রায় চার মাইল দূরে। কলেজে যাওয়া-আসার সময় এক্কাগাড়ির ঝাঁকুনির তালে তালে আমার মগজে এই সব মূর্তির ইতিহাস গজিয়ে উঠতে থাকত। আমি রবিবারে ও অন্য অন্য ছুটির দিন মূর্তিগুলিকে গিয়ে ভাল ক'রে দেখে আসতে আরম্ভ করলুম।

মাস কয়েক চাকরি ক'রে ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে শ-পাঁচেক টাকা জমেছিল। সে টাকা কটা তুলে এনে একটা ক্যামেরা কিনে ফেললুম। তারপর কয়েকটা মূর্তির ফোটো তুলে একখানা বিখ্যাত বাংলা মাসিক-পত্রে এক প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেওয়া গেল।

সমালোচকের চাইতে প্রত্নতাত্ত্বিকের খাতির তখন বাজারে খুব বেশি। প্রবন্ধ বেরুতে না বেরুতে চারিদিকে তার প্রতিবাদ ও সঙ্গে সঙ্গে একজন মস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ব'লে আমার খ্যাতি র'টে গেল। প্রতি মাসেই ফোটোসমেত আমার প্রবন্ধ মাসিক-পত্রে শোভা পেতে লাগল।

চারিদিকে জম-জমাট নাম আর খাতির, সাহিত্য-সভা-সমিতিতে নিমন্ত্রণ,—এই সব ব্যাপারে মেজাজ আমার সরগরম হয়ে উঠল।

এই রকম একটা সময়, তখন বোধ হয় ঈস্টারের ছুটি। ছুটিতে যে একবার বাড়ি ঘুরে আসব, তারও জো নেই, মাত্র চার দিনের ছুটি, বাড়িতে যেতে আসতেই চারদিন কেটে যাবে। সকালবেলা চা খেয়ে বাইরের ঘরে ব'সে একটা মূর্তির ছবি নিয়ে সেটার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখার কথা ভাবছি, এমন সময় আমার দুটি ছাত্র সন্তর্পণে এসে আমায় নমস্কার করলে।

কি ব্যাপার! সকালবেলা কি মনে ক'রে হে?

বিশ্বনাথ ও সুরেশ বললে যে, তারা প্রত্নতত্ত্ব শিখতে চায়।

আমি তাদের খুব উৎসাহ দিয়ে বললুম, তোমাদের মতন যদি কয়েকটি উৎসাহী ছেলে পাই, তা হ'লে দেশের যে কত কাজ করতে পারি!

আমার কথা শুনে তারা বললে, স্যর্, আপনি যা বলবেন, তাই করব।

বিশ্বনাথ ও সুরেশ সেদিন থেকে সকাল-বিকেল আমার কাছে আসতে লাগল। আমার অর্ধেক কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে নিতুম। তাদের উৎসাহ দেখে আমার ইতিহাস-চর্চার ঝোঁক আরও বেড়ে গেল।

সেদিন রবিবার। বিশ্বনাথ কোথায় বাইরে গিয়েছে, সুরেশ সকালবেলা একলাই এসেছিল। নিমক-মণ্ডির চৌপায়া-মায়ীর মূর্তি সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা চলছিল। এই মূর্তিটি অদ্ভুত—তাঁর চারটি পা, পাঁচটি হাত, কিন্তু মুণ্ডুটা নেই, হয়তো ভেঙে গিয়েছে। রাস্তার ধারে একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে হেলানো ভাবে প'ড়ে আছে। মূর্তির কতক

অংশ মাটির নীচে পোঁতা। সেই পল্লীর লোকেরা মূর্তিটাকে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে পূজো করে। আমরা কিছুদিন আগে মূর্তিটার একটা ফোটো নিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু পল্লীর লোকেরা ভয়ানক আপত্তি করায় সেদিন আর ছবি তোলা হয় নি। মূর্তিটার সঙ্গে যে একটা বড় ও অত্যন্ত আশ্চর্য রকমের ইতিহাস জড়িত আছে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না।

সুরেশ বললে, সার্, মূর্তিটাকে ওখান থেকে তুলে আনলে কেমন হয়?

সুরেশের প্রস্তাবটা নেহাত মন্দ লাগল না। কিছুদিন থেকে বাড়িতে একটা মিউজিয়াম করবার আমার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু মূর্তিগুলো যে ভারী, কেই বা সেগুলো নিয়ে আসবে? আর এদেশের কোন লোকের কাছে সে প্রস্তাব করলে সে খুনই ক'রে ফেলবে। এই সব নানান কথা ভেবে ও-বিষয়ে এখনও কিছু স্থির করতে পারি নি। সুরেশের কথা শুনে আমি বললুম, চৌপায়া-মূর্তির ওজন প্রায় চার মণ হবে, কে নিয়ে আসবে?

সুরেশ বললে, সার্, বিশ্বনাথদের বাড়িতে একটা উড়ে ঠাকুর আছে, সে লোকটা আকাট যণ্ডা, তাকে কিছু কবলালে হয়তো সে এ কাজে রাজি হতে পারে। পশ্চিমের দেবতাদের ওপর উড়েদের কোন ভক্তি নেই।

ঠিক হ'ল যে, বিশ্বনাথদের ঠাকুরটা যদি রাজি হয়, তা হ'লে তাকে নিয়ে গিয়ে একদিন রাত্রিবেলা মূর্তিটা তুলে আনতে হবে।

কথাবার্তা ঠিক ক'রে উঠে যাবার সময় সুরেশ বললে, সার্, একটা কথা বলব?

আকস্মিক তার এই রকম বিনয়-প্রকাশের ঘটা দেখে আমি অবাক হয়ে বললুম, বল না কি বলবে?

সে বললে, সার্, সেকালের বরাহ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছি, দেখে দিতে হবে।

তার কথা শুনে আমি তো অবাক। প্রবন্ধ লেখবার কি আর বিষয় পেলে না বাবা! সেকালের বরাহ তো দূরের কথা, একালের বরাহ সম্বন্ধেও আমার জ্ঞান উইল্‌সনের হোটেলের চেয়ে বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লুম।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, বৈষ্ণবের ছেলের বরাহের ওপর অহেতুক এমন প্রেম উথলে উঠল কেন হে?

সে বললে যে, লালবাগ যাবার রাস্তায় জোয়ার-ক্ষেতের পাশে একটা পাথরের বরাহ-মূর্তি প'ড়ে আছে, সেটাকে দেখে প্রথমে বরাহ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখবার অনুপ্রেরণা আসে। তারপরে অনেক গবেষণা ক'রে সে এই প্রবন্ধটি লিখেছে। সুরেশের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক হ'ল, সেদিন বিকেলে তার সঙ্গে গিয়ে মূর্তিটা দেখে আসব।

বিকেলবেলা সুরেশচন্দ্র এক্কা নিয়ে হাজির। দুজনে মিলে সেকালের বরাহের সন্ধানে যাত্রা করা গেল। এক্কায় উঠেই সুরেশ বললে, সার্, একটা শাবল নিয়ে এসেছি।

শাবল! শাবল কি হবে?

যদি সুবিধে হয় তো আজকেই ওটাকে তুলে নিয়ে আসা যাবে।

আধ ঘণ্টা এক্কার ঝাঁকুনি সহ্য ক'রে আমরা বরাহ-অবতারের মূর্তির কাছে এসে পৌঁছলুম। এক্কাওয়ালাকে একটু দূরে দাঁড়াতে ব'লে আমরা মূর্তিটার কাছে হাজির হলুম। দিব্যি ছোটখাটো একটি জানোয়ারের মূর্তি, অনেকটা বরাহেরই মতন; তবে মাথার ওপর দুটো শিং আছে। ওজনে দশ-পনরো সেরের বেশি হবে না। কিন্তু সেদিন লালবাগে কি একটা মেলার জন্যে পথে লোক চলার আর অন্ত ছিল না। ঠিক হ'ল,

আসছে শনিবার সন্ধ্যের পর সুরেশ এসে বরাহটি এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে।

সে বললে, আপনার আর আসবার দরকার হবে না সার্।

শনিবার রাত্রি প্রায় নটার সময় গলদ্ঘর্ম কলেবরে সুরেশচন্দ্র বরাহ-মূর্তি নিয়ে এসে হাজির।

সে বললে, লোকজনের চলাচল কিছুতে কমে না। শেষকালে রাস্তা একটু নিরিবিলি হতে সে মূর্তিটা তুলে ফেললুম। কিন্তু সেটিকে তুলে কিছুদূর এগিয়ে এসে আবার এক মুশকিল। এক্কাওয়ালা সে মূর্তি তার গাড়িতে তুলতে কিছুতেই রাজি হয় না। শেষে আর কোন উপায় নেই দেখে এই চার মাইল রাস্তা সেই আধ-মুণে বরাহ ঘাড়ে ক'রে আসতে হয়েছে।

সুরেশের উৎসাহ দেখে আমি তো স্তম্ভিত। তার সর্বাঙ্গ ধুলোয় ভ'রে গেছে। আমার বাড়িতে স্নান ক'রে খেয়ে-দেয়ে যখন সে বাড়ি গেল, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। যাবার সময় সে বললে, শাবলটা মাঝ-পথে ফেলে এসেছি, কাল সকালেই আবার সেটাকে আনতে যেতে হবে।

যখন সমালোচক ছিলুম, তখন সাধারণে আমাকে চিনত বটে, কিন্তু পত্রিকা-সম্পাদকদের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা হয় নি। প্রত্নতাত্ত্বিক হওয়ার কিছুদিন পরেই তিন-চারটি প্রধান প্রধান মাসিক-পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা, কারও কারও সঙ্গে আত্মীয়তাও জ'ন্মে গিয়েছিল। আমি সুপারিশ ক'রে যখন সুরেশের "সেকালের বরাহ" প্রবন্ধ পাঠিয়েছি, তখন আর কথা আছে!—পরের মাসেই একখানা প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পত্রে সুরেশের প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল।

ছাপার অক্ষরে নাম দেখে সুরেশের উৎসাহ দশগুণ বেড়ে গেল।

সে একদিন কলেজের ছুটির পর আমাকে জানালে, সার্, আজ রাত্রি দশটার সময় আপনি ঠিক হয়ে থাকবেন, আমি আর বিশে আপনার ওখানে যাব, তারপর চৌপায়া-মায়ীকে তুলে আনার বন্দোবস্ত করতে হবে।

চৌপায়া-মায়ী সম্বন্ধে প্রবন্ধ আমার লেখা হয়ে প'ড়ে ছিল, কেবল ছবির জন্যে সেটা কাগজে দেওয়া হচ্ছিল না। তার কথা শুনে আমার ভরসা হ'ল যে, এতদিনে আর একটা বড় রকম প্রবন্ধ বেরোবার সুবিধে বুঝি লাগে!

রাত্রি দশটার সময় আমার দুই সাকরেদ এসে উপস্থিত। দুজনের হাতে দুটো বড় শাবল। বিশ্বনাথের বাড়িতে শাবল ছিল না, প্রত্নতত্ত্ব শিখতে হ'লে প্রত্যহ যে শাবলের প্রয়োজন হয়, এ কথা সুরেশ আমার সামনেই দু-তিন দিন তাকে বলেছিল। নতুন উৎসাহে সে তিন হাত লম্বা একটা শাবল কিনে ফেলেছে।

রাত্রি প্রায় দেড়টা অবধি তিনজনে মিলে চৌপায়া-মায়ীর চারিদিকে পগারের মত চওড়া এক গর্ত ক'রে ফেললুম, তবুও তাকে একটু নড়াতে পারলুম না। অনেক কষ্টে প্রায় দু-হাত গর্ত খোঁড়ার পর চৌপায়া-মায়ীকে একটু নড়ানো গেল। কিন্তু আমাদের সাধ্য কি যে সে মূর্তি সেখান থেকে তুলে আনি! ঠিক হ'ল, কাল রাতে বিশ্বনাথদের ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে চারজনে মিলে মূর্তিটা বাড়িতে আনা হবে। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে হাতের তেল-সিঁদুর তুলতে রাত প্রায় ভোর হয়ে গেল।

পরদিন সন্ধ্যের একটু পরে নিমক-মণ্ডির ভেতর দিয়ে বাড়ি ফিরছি, এমন সময় দেখি যে, চৌপায়া-মায়ীর চারিদিকে বিস্তর লোকের সমাগম হয়েছে। চারিদিকে আলো, মূর্তির ওপর একটা লাল রঙের চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে। সে মহল্লার যত মেয়ে পুরুষ মিলে সেখানে গান গাইছে,

মহা ধুমধাম ক'রে পূজোর যোগাড় হচ্ছে। ব্যাপার কি? একটু সন্ধান নিয়ে জানলুম যে, মায়ী কি জন্যে নারাজ হয়ে কাল রাত্রে এখান থেকে উঠে চার পায়ে দৌড় দিয়েছিলেন, এমন সময় সদাশিব পাঁড়ে তাঁকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে তাঁর একখানি পা জড়িয়ে ধরে। মা আর কিছুতেই ফিরবেন না, শেষকালে তিনি সদাশিবকে বললেন যে, তুই যদি আমার রোজ সেবা করিস, তবেই আমি থাকব, নইলে—

সদাশিবের কথায় তিনি ফিরে এসেছেন। আজ রাত্রি বারোটার সময় মহা ধুম ক'রে তাঁর ক্রোধ-শান্তির জন্যে পূজো হবে। মুন্সী নন্দাপ্রসাদ সদাশিবকে একটা মন্দির করবার টাকা দেবে ব'লে প্রতিশ্রুত :য়েছে। বুঝলুম যে, চৌপায়া-মূর্তির প্রবন্ধটা আরও কিছুদিন বাক্সে চাপা রইল।

এদিকে সুরেশের প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়ার পর থেকে আমার শিষ্যদ্বয়ের :সাহ দিন দিন বাড়তে শুরু করল। বিশ্বনাথ "বৈদিক যুগের ালীপূজা" নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে নিয়ে এল। সেটা ছাপাও হয়েছিল। রোজ তারা শহর ঢুঁড়ে যত সব মূর্তি তুলে নিয়ে এসে আমার াড়িতে পুরতে লাগল। বাড়িটা একটি ভাঙা মূর্তির আস্তাবল হয়ে উঠল। আমার বসবার ঘর, রান্নাঘর, খাবার ঘর, এমন কি শোবার ঘরের খাটখানি ছাড়া আর সমস্ত জায়গায় মূর্তি—ভাঙা মূর্তি। সুরেশ আর বিশ্বনাথ নিত্য নূতন প্রবন্ধ লিখে আনে, তাদের প্রবন্ধ লেখার ঠেলায় আমার প্রত্নচর্চা প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে উঠল।

সেদিন শরীরটা ভাল ছিল না ব'লে সন্ধ্যের সময় কোথাও যাই নি। রাত্রি প্রায় দশটার সময় শোবার যোগাড় করছি, এমন সময় বিশ্বনাথ ও সুরেশ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির।

সুরেশ বললে, সার্, কাজ হাসিল, চৌপায়া-মায়ীকে নিয়ে এসেছি।

আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, কোথায়—কোথায় ?

বাইরে গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে।

গরুর গাড়ির নাম শুনে আমি একটু দ'মে গেলুম।

সুরেশ আবার বললে, কিছু ভয় নেই সার্। মুসলমানের গাড়ি, তাও দেহাতি ; কি কাজে শহরে এসেছিল, আজ রাতেই ফিরে যাবে

তাদের কথা শুনে একটু আশ্বস্ত হওয়া গেল, তারপর চারজনে মিলে চৌপায়া-মায়ীকে কোন রকমে নিয়ে গিয়ে শোবার ঘরে রাখা হ'ল।

পরদিন সকালে বিশ্বনাথ এসে বললে যে, কাল সারারাত জেগে সে চৌপায়া সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছে, কোন কাগজে ছাপিয়ে দিতে হবে।

আমি বিশ্বনাথকে ব'লে দিলুম, দেখ, সামনে পরীক্ষা ; এখন কয়েক মাস প্রবন্ধ লেখ-টেখা ছেড়ে দিয়ে পড়াশোনায় মন দাও গে।

বিশ্বনাথ মনমরা হয়ে চ'লে গেল।

সেদিন নিমক-মণ্ডিতে গিয়ে যে দৃশ্য দেখেছিলুম, তা কখনও ভুলব না। মূর্তিটা যেখানে ছিল, সেখানে একটা বিরাট গর্ত হাঁ ক'রে রয়েছে আর তারই চারিদিকে পল্লীর যত লোক ঘিরে ব'সে বুক চাপড়াচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, হা মায়ী—হা মায়ী—

সকলের মুখে একটা ত্রস্ত ভাব, কি যেন কি একটা ভয়ানক সর্বনাশ উপস্থিত হয়েছে।

ফোটোগ্রাফগুলো তখনও ডেভেলপ করা হয় নি ব'লে সেখানে আ৺ বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা হ'ল না।

চৌপায়ার প্রবন্ধ বেরিয়ে গেল। হাতে আপাতত কোন কাজ নেই। মনে করছি, এবার কিছুদিন বিশ্রাম নোব ; এই রকম একটা সময়ে কোথা থেকে অনাসৃষ্টির অনিদ্রা-রোগ এসে আমায় বড় কাতর ক'রে

ফেললে। সারারাত বিছানায় প'ড়ে এপাশ ওপাশ করতে হয়। শেষ-রাত্রে ঘুম আসে, একেবারে বেলা নটার আগে সে ঘুম ভাঙে না।

একদিন, রাত্রি তখন প্রায় দেড়টা, কিছুতেই ঘুম আসছে না। নানা রকমের বিদকুটে চিন্তায় মাথা গরম হয়ে উঠেছে। শুয়ে থাকা অসম্ভব মনে হওয়ায় বিছানা ছেড়ে উঠে বাতিটা জ্বালিয়ে ফেললুম। তারপর মাথায় একটু হিমসাগর তেল মালিশ করব মনে ক'রে খাট থেকে যেমন নামতে গিয়েছি, আর দেখি, সর্বনাশ!

বেশ স্পষ্ট দেখলুম যে, আমার প্রধান সাকরেদ সুরেশচন্দ্রের সেকালের বরাহ কুলুঙ্গি থেকে নেমে একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

চোখের সামনে দিয়ে যেন একসঙ্গে দশ-বারোটা তারাবাজি খেলে গেল। চোখ দুটো বেশ ক'রে রগড়ে আবার চেয়ে দেখলুম। বরাহ-অবতার আমার দিকে একবার আড়নয়নে চেয়ে একটু মুচকি হেসে ঘাড়টা অন্য দিকে ফিরিয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

শুয়ারের মুখে মানুষের হাসি যে কি রকম মানায়, তা যে না দেখেছে তাকে সে কথা বোঝানো যাবে না। ভয়ে আমি খাটের এক কোণে স'রে গেলুম। কিন্তু একটু পরেই দেখি, বরাহ-অবতার খাড়া হয়ে আমার খাটের ওপরে দুটি পা তুলে দিলেন।

ব্যাপার ক্রমেই সঙিন হয়ে উঠছে দেখে আমি একটু সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে বললুম, বাবা বরাহ-অবতার, দীনের ওপর আজ এ কি অনুগ্রহ আপনার?

আমার কথা শেষ হতে না হতে বরাহ মহাশয় তর্জন ক'রে উঠলেন, চোপ রও ইউ শুয়ার, আমায় বরাহ বলা! বরাহ তুই, তোর—

ওঃ বাবা! এ আবার কথা কয় যে! কুমোরের চরকির মতন মাথা ঘুরতে লাগল। ঢোঁক গিলতে গিয়ে দেখি, গলার মধ্যে যেন করাতের গুঁড়ো ঠাসা। নেমে গিয়ে যে এক ঢোঁক জল খাব, তারও উপায় নেই, বরাহ মহাশয় পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম, তবে আপনি কে?

বরাহ বললেন, সেইটে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই এত কষ্ট ক'রে ওই কুলুঙ্গি থেকে নেমে এসেছি। তুমি কাগজে আমার ছবি ছাপিয়ে তার নীচে বরাহ লিখেছ কেন? জান, আমি কে?

আমি হাতজোড় ক'রে বললুম, আজ্ঞে, আপনি ভুল করছেন, সে প্রবন্ধ আমি লিখি নি। কলেজের একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া লিখেছে, তার নাম সুরেশ চক্রবর্তী। তার বাড়িটা দেখিয়ে দোব?

তোমার ভরসা না পেলে সুরেশের সাধ্যি কি যে আমায় অপমান করে! দেখবে, আমি কে?

এই কথা ব'লে সে তড়াক ক'রে লাফ মেরে হাত পাঁচেক দূরে ছটকে গেল। আর একটু হ'লেই তার পায়ের চাঁট লেগে আমার দেড়শো টাকার আয়নাখানাই চুর হয়ে যেত।

আমি বললুম, আজ্ঞে, আপনার চেহারা দেখে তো বরাহ ব'লেই মনে হয়েছিল, কিন্তু হালচাল দেখে মনে হচ্ছে, আপনি ষাঁড়—

ষাঁড় নয়, বৃষ। শুনবে আমার আওয়াজ?

এই ব'লে সে মিনিটখানেক ধ'রে একটি ছোট্ট হাঁক ছাড়লে।

আমার মনে হ'ল, যেন ঘরের মধ্যে দুটো মানোয়ারী জাহাজ খানিকক্ষণ পাল্লা দিয়ে গলা সেধে নিলে। গলার আওয়াজের ধমক সামলে উঠতে না উঠতে বৃষ-অবতার বললেন, দেখবে আমার গুঁতোর জোর?

এই ব'লেই সে ছুটে গিয়ে ঘরের দেওয়ালে একটা ঢুঁ মারলে। তার ঢুঁর জোরে সমস্ত বাড়িখানা কেঁপে উঠল।

ঘরের মধ্যে আরও শতখানেক মূর্তি সাজানো ছিল, ঘরখানা কেঁপে উঠতেই মূর্তিগুলো খিলখিল ক'রে হেসে এক অদ্ভুত ভাষায় কথা-বলাবলি করতে লাগল।

তারা একটু চুপ করলে বৃষ মহাশয় বললেন, আমার কি ইচ্ছে করছে জান?

আজ্ঞে না।

আমার ইচ্ছে করছে যে, তোমার নাকে এমনই জোরে একটা ঢুঁ লাগাই। অনেকদিন গুঁতোগুঁতি করা হয় নি।

বৃষের প্রস্তাব শুনে আমি কেঁদে ফেলে বললুম, দোহাই আপনার। ওই ইচ্ছেটি সম্বরণ করুন। আপনাকে খুশি করবার জন্যে যা করতে বলবেন, তাই করব।

আমার চোখের জল দেখে বোধ হয় ষাঁড়ের প্রাণটা একটু নরম হ'ল। সে বললে, আচ্ছা, আজ ঘুমোও। আমি একটু চিন্তা ক'রে দেখে যা ব্যবস্থা হয় তাই করব।

এই ব'লে সে এক লাফে কুলুঙ্গিতে চ'ড়ে বসল।

আমি বললুম, একটা বালিশ দোব কি?

সে কোন কথা না ব'লে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ল।

তখন প্রায় সকাল হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে বাইরে একটু ঠাণ্ডা বাতাসে এসে দাঁড়ালুম। গা দিয়ে তখনও কালঘাম ছুটছে। সকাল হতে না হতে স্নান ক'রে একেবারে সুরেশের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তাকে বললুম, ওহে, আমার দেশ থেকে কয়েকজন

লোক আসবেন, মূর্তিগুলো দিন কতক তোমার এখানে রাখবার সুবিধে হবে?

সুরেশ বললে, তার ওখানে রাখবার সুবিধে হবে না। তবে সে আশ্বাস দিয়ে বললে যে, বিশ্বনাথের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিশ্চয় এ বিষয়ের একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলবে।

দুপুরবেলা সেদিন আর কলেজে যাওয়া হ'ল না, পেটে চারটি ভাত পড়তে না পড়তেই চোখ ঝিমিয়ে এল। কিন্তু ঘুমিয়েই কি নিশ্চিন্ত হবার জো আছে! ঘুমোতে না ঘুমোতে স্বপ্ন দেখি, বৃষ মহাশয় আমার নাকটি তাক ক'রে ছুটে আসছে, আর অমনই ধড়মড় ক'রে উঠে বসি।

দুপুরটা তো এই ক'রে কাটল। সন্ধ্যের সময়ও বাড়ি থেকে বেরোতে পারলুম না, যদি সুরেশ ও বিশ্বনাথ এসে আমাকে না পেয়ে ফিরে যায়! কিন্তু কোথায় বা বিশ্বনাথ, আর কোথায়ই বা সুরেশ! অনেক রাত অবধি তাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে খেয়ে-দেয়ে যখন গিয়ে শুলুম, মাথার কাছের ঘড়িটাতে তখন এগারোটা বাজল। সেদিন আর বাতি নেবানো হবে না ঠিক ক'রে বাতিটা জ্বেলেই চোখ বুজে প'ড়ে রইলুম।

বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল, কিসের একটা আওয়াজ শুনে চটকা ভেঙে গেল। দেখি, বিশ্বনাথের বৈদিক যুগের কালী তাক থেকে নেমে ঘড়িটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন।

কালীকে নামতে দেখে তো আমার আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হবার উদ্যোগ করলে। তিনি খানিকক্ষণ ঘড়ির দিকে চেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা কি হে?

আজ্ঞে, ওটা ঘড়ি।

দেখলুম, বৈদিক যুগের কালীর মেজাজটা বৃষের মতন অত কড়া নয়।

তিনি আর কোন কথা না ব'লে ঘরের মধ্যে এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সে রাত্রে আর কোন উৎপাত হয় নি বটে, কিন্তু উৎপাতের ভয়ে সারারাত্রি জেগে থাকতে হয়েছিল।

পরদিন কলেজে সাত দিনের ছুটি চেয়ে এক দরখাস্ত দিলুম। কলেজের ছুটি মঞ্জুর হ'ল। দু-তিন দিন কেটে গেল, অথচ মূর্তিগুলোকে সরাবার কোন বন্দোবস্ত করতে পারলুম না। এদিকে রোজ রাতে তারা তাক থেকে নেমে এসে ঘরময় নৃত্য করে। মধ্যে মধ্যে বৃষ মহাপ্রভু আমার নাকের ওপর ঢুঁ লাগিয়ে গুতোগুঁতির শখ মেটাতে চায়। রাত্রে ঘুম হয় না, দিনে বা যদি একটু ঘুম হয়, তা স্বপ্ন দেখতে থাকি যে, মূর্তিগুলো সব আকাশে উড়তে আরম্ভ করেছে; আর মধ্যে মধ্যে গোঁত খেয়ে আমার মাথার ওপর পড়বার উপক্রম করছে। এর ওপরে সুরেশ ও বিশ্বনাথ এমন ডুব মারলে যে, বাড়িতে গিয়েও তাদের পাত্তা পাওয়া মুশকিল হ'ল। বিপদের কথা কাউকে বলবারও জো নেই। আত্মহত্যা করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই, এমন অবস্থা দাঁড়াল।

বিপদ যখন আসে, তখন সে তার সমস্ত বন্ধু-বান্ধবকেও ডেকে নিয়ে আসে। একে আমার এই বিপদ, তার ওপরে আমার বাড়িওয়ালা জোয়ালাপ্রসাদ এসে একদিন বললে, তার বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, দেহাত থেকে তার কজন জাতভাই এসে সেখানে থাকবে।

মূর্তিগুলো যখন বাড়িতে এনে পুরেছিলুম, তখন বাড়ি ছাড়ার কথা একবারও মনে হয় নি। এখন এগুলো বার করি কি ক'রে?

যা থাকে কপালে মনে ক'রে চুপচাপ ব'সে রইলুম। ওদিকে বাড়িওয়ালা রোজ এসে কড়া তাগাদা দিয়ে যায়, শেষকালে আমি তার সঙ্গে দেখা করা পর্যন্ত বন্ধ ক'রে দিলুম।

সেদিন বোধ হয় শনিবার ; কলেজ বন্ধ। সারারাত্রি বৃষ মহাপ্রভুর খোশামোদ ক'রে রাত কাটিয়ে সকালবেলা উঠে দুটি কাপ চা খেয়ে সবে বসেছি, এমন সময় সুরেশ ও বিশ্বনাথ এসে হাজির। তাদের দেখে তো আমার সর্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠল। আমি টেবিল চাপড়ে চীৎকার ক'রে বললুম, রাস্কেল, এই তোমাদের গুরুভক্তি !

তারা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, দিন কতকের জন্যে কজন বন্ধু মিলে বিন্ধ্যাচল বেড়াতে গিয়েছিল। আজ সকালে ফিরেছে। এখানে এসেই তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

আমি তাদের সমস্ত ব্যাপার খুলে বললুম, বাবা, তোমাদের গুরুকে যদি প্রাণে বাঁচাতে চাও, তা হ'লে শিগগির একটা উপায় কর, নইলে—

ঠিক এই সময় তিন-চারজন লোক আমার বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। তাদের মধ্যে একজন বললে, শিশিরবাবু কার নাম ?

আমার, কি চাই আপনার ?

আপনার বাড়িওয়ালা আপনার নামে নালিশ করেছিল। আমরা কোর্টের পেয়াদা, আমরা আপনার জিনিসপত্র রাস্তায় নামিয়ে দোব। তারপর আপনার যেখানে ইচ্ছে সেখানে সেসব নিয়ে যেতে পারেন। এই আদালতের হুকুম।

কাছারির লোকের সঙ্গে বাক্যব্যয় করা বৃথা। তারা তখুনি কাজে লেগে গেল। দশ-বারোটা মুটে মিলে আমার জিনিসপত্র রাস্তায় নামাতে লাগল। পাথরের মূর্তিতে গলি ভ'রে উঠল।

পেয়াদা দেখে সুরেশ "একটু আসি" ব'লে স'রে পড়েছিল, বিশ্বনাথ তখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে। এমন সময় ছুটতে ছুটতে সুরেশ এসে বললে, সার্, সর্ব্বনাশ হয়েছে, পালিয়ে আসুন।

ব্যাপার কি ?

ব্যাপার পরে শুনবেন।—ব'লে সে আমার হাত ধ'রে একেবারে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা পর্দা-ঢাকা এক্কায় তুলে বললে, জোরসে চালাও।

সুরেশের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সে বললে, সর্বনাশ হয়েছে, রাস্তায় চৌপায়া-মায়ীর মূর্তি দেখে কে গিয়ে নিমক-মণ্ডিতে খবর দিয়েছে, সেখানকার লোকেরা লাঠি নিয়ে এদিকে ছুটে আসছে, আমি দেখে এলুম।

অ্যাঁ, বল কি?

আমার মাথার ভেতর কেমন করতে লাগল, ব'সে থাকতে পারলুম না; সেইখানেই শুয়ে পড়লুম।

ওদিকে নিমক-মণ্ডির লোকেরা মার-মার ক'রে এসে চৌপায়া-মূর্তি তুলে নিয়ে চ'লে গেল। শহরের গুণ্ডারা সেই সুবিধেয় আমার সমস্ত জিনিসপত্র লুঠে নিলে। তারা যেখানে সেখানে বাঙালীদের দেখ-মার ক'রে বেড়াতে লাগল।

মধ্যে মধ্যে বিশ্বনাথ আর সুরেশ খবর আনতে লাগল। এক-একটি সংবাদ যেন এক-একটি কামানের গোলা। তারা এসে বললে, সার্, বদমাইসগুলো আপনাকে খুন করবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইতিমধ্যে পুলিসের সঙ্গে এক জায়গায় বদমাইসদের একটা বড় রকমের দাঙ্গাও হয়ে গেল। সন্ধ্যে নাগাদ শহরে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। অনেক বাঙালী শহর ছেড়ে নৌকো ক'রে লম্বা দিলেন।

সন্ধ্যে অবধি সুরেশদের বাড়িতে থেকে, হিন্দুস্থানীর পোশাক প'রে আমি সেই রাত্রেই কলকাতা পালিয়ে এলুম।

কলকাতায় এসেও নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। সেখান থেকে ওয়ারেন্ট এসে আমায় ধ'রে নিয়ে গেল। মূর্তি চুরি করার অপরাধে

আমার বিরুদ্ধে মস্ত মামলা রুজু হ'ল। বিচারের ফলাফলটা আর শুনে কাজ নেই, তবে এইটুকু শুনলেই হবে, চাকরি ক'রে যা কিছু পুঁজি করেছিলুম, মকদ্দমার খরচ চালাতে তা বেরিয়ে গেল, উপরন্তু চাকরিটিও গেল।

চাকরি আবার পেয়েছি। দু-পয়সা পুঁজিও হয়েছে, তবে সাহিত্যচর্চা আর করছি না। সুরেশ আর বিশ্বনাথের নাম এখন দেশের সবাই জানে। তারা দুজনেই "প্রত্নতত্ত্ববারিধি" উপাধি পেয়েছে।

পথে-বিপথে

পথের ধারে গাছতলায় প'ড়ে ছিলুম, রোগের ঘোরে। আমার পাশ দিয়ে যাত্রী চলেছিল দলে দলে, বিরামহীন। সবাই চলেছে একই উদ্দেশ্যে, নাসিকে কুম্ভ-স্নান করতে। শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল, আমি যেন একটা বিরাট মানুষ-নদীর পাড়ে প'ড়ে প'ড়ে জীবন-মৃত্যুর লহরী শুনছি। এই বিশাল জীবনস্রোত আবার কোন্ মহাজীবনে গিয়ে বিলীন হবে—নানা চিন্তায় সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

বোধ হয় দু দিন এমনই ভাবে প'ড়ে ছিলুম; হঠাৎ কানের কাছে আওয়াজ এল, এই, ওঠ্।

মাথাটা তুলে দেখলুম, একটা লোক, মাথার ঝাঁকড়া চুল মুখের ওপর ঝুলে পড়েছে, তার ভেতর দুটো চোখ জলজল ক'রে জলছে, যেন ঝোপের ভেতর বাঘের চোখ। আমার ঘটিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার চোখে চোখ পড়তেই সে আপনা-আপনি বললে, এই যে চোখ চেয়েছে! না, আয়ু আছে দেখছি।

তারপর একটু এগিয়ে এসে আমায় বললে, নে, এই দুধটুকু মেরে দে। যা, খুব বেঁচে গেছিস।

অনেকদিন পরে মাতৃভাষা কানে যেন অমৃতবর্ষণ করলে। আমি কোন রকমে উঠে ব'সে তাকে বললুম, কে তুমি?

সে একটু হেসে বললে, এই তোমারই মতন একজন। ভিড়ের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিলুম, দেখলুম, রাস্তার ধারে প'ড়ে মরছ, তাই একটু অপেক্ষা করছিলুম। মড়া পোড়াবার শখটা এখনও যায় নি কিনা! দুধটুকু খেয়ে ফেল, জোর পাবে।

দুধটা বোধ হয় সে নিজে খাবার জন্তে যোগাড় করেছিল। কিন্তু তখন আর আমার বিচার করবার অবসর ছিল না, তার হাত থেকে ঘটিটা নিয়ে এক চুমুকে দুধটুকু শেষ ক'রে ফেললুম। সে আমার হাত থেকে ঘটিটা আবার নিয়ে নিলে।

দুদিন নিরম্বু উপবাসের পর পেটে দুধ পড়তে শরীরটা যেন একটু সুস্থ বোধ হতে লাগল। একটু পরেই সে আমার একখানা হাত ধ'রে বললে, এই, ওঠ, একটু চ'লে বেড়া, সব সেরে যাবে।

তার স্পর্শে কি ছিল জানি না। আমার মনে হ'ল, যেন আমার শরীরের ভেতর দিয়ে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ খেলে গেল। কিছুক্ষণ আগে যে আমি পাশ ফিরতে পারছিলুম না, সেই আমি উঠে বেড়াতে লাগলুম। লোকটা ঘটি হাতে নিয়ে আমার চলাফেরা লক্ষ্য করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পায়চারি ক'রে আবার গাছতলায় আমার কম্বলে এসে বসলুম। লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, সে একবার আমার দিকে আর একবার তার হাতের শূন্য ঘটিটার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাইতে লাগল।

হয়তো দুধের দামটা লজ্জায় চাইতে পারছে না মনে ক'রে আমি তাকে কাছে ডেকে বললুম, তোমার উপকার চিরকাল মনে থাকবে বন্ধু, দুধটুকু না পেলে হয়তো এইখানেই আমায় মরতে হ'ত। আমার কাছে এই কম্বলটা আছে, এইটে নাও।

আমার কথা শুনে সে দাঁত খিঁচিয়ে বললে, রেখে দাও তোমার কম্বল। দেড় পয়সার এক কম্বল বেচতে গিয়ে শেষকালে পুলিসের খপ্পরে পড়ি আর কি!

এই ব'লে আমার পাশে কম্বলে সে ধপ ক'রে ব'সে ঘটিটা মাটিতে নামিয়ে রাখলে।

আমাদের সামনে দিয়ে জলস্রোতের মত লোকের স্রোত ব'য়ে চলেছে। একদল যাত্রী চলেছিল কোলাহল করতে করতে, তাদের পেছনে একটা উলঙ্গ ছেলে, হাতে একটা বড় কলা। আমি তাদের দেখছি, এমন সময় লোকটা টপ ক'রে আমার পাশ থেকে উঠে গিয়ে ছেলেটার হাত থেকে কলাটা কেড়ে নিয়ে আর এক দিকে চ'লে গেল।

ছেলেটা হতভম্বের মতন কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে কেঁদে উঠল। তার মা তার চীৎকার শুনে পেছন ফিরে টপ ক'রে তাকে কোলে তুলে নিয়ে আবার চলতে শুরু করলে।

লোকটার কাণ্ড দেখে আমি তো অবাক! একটু পরে সে মুখ চোকাতে চোকাতে ফিরে এসে বললে, জলযোগ করা গেল।

আমি তাকে বললুম, এটা কি রকম হ'ল? ঐটুকু ছেলের হাত থেকে—

আমার কথা শেষ না হতেই সে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বললে, চুপ কর্, ছেলেমানুষের একটা কলা গেছে, এখুনি তার বাপ-মা তাকে দশটা কলা দিয়ে শান্ত করবে। আমায় কে দেবে?

সেদিন আর আমার যাওয়া হ'ল না। লোকটাও সারারাত আমার পাশে প'ড়ে ঘুমোতে লাগল। সকাল হতে সে আমায় বললে, কোথায় যাবি?

নাসিকে, কুম্ভমেলায়।

চ, তোর সঙ্গে যাই।

আবার চলার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলুম। একদিন অবিশ্রান্ত চলার পর আমরা দুজনে ঠানায় এসে পৌঁছলুম। ঠানা ছোট্ট শহর, যাত্রীরা এখানকার ধর্মশালায় একদিন বিশ্রাম ক'রে আবার চলবে। যাত্রীর ভিড়ে ধর্মশালা আগেই ভ'রে গিয়েছিল, আমাদের সেখানে স্থান

হ'ল না। আমরা রাস্তার ধারে কম্বল বিছিয়ে এক জায়গায় আস্তানা করলুম।

ঠানায় দু-তিনটে সদাব্রত খোলা হয়েছিল, আমরা এক জায়গায় খেয়ে এসে শুয়ে পড়লুম। শরীর ক্লান্ত ছিল, পড়তে না পড়তে ঘুম। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিলুম, সশরীরে স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। স্বর্গের রাস্তার দু দিকে বড় বড় স্ফটিকের প্রাসাদ, তার ভেতর থেকে নাচ-গানের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও কোন গোলমাল নেই। রাস্তা পরিষ্কার ঝকঝক করছে। রাস্তায় কিন্তু একটি লোকের মুখ দেখতে পেলুম না। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে রাস্তার ধারের এক বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম। একটি ছোট ছেলে হাসতে হাসতে পথ বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডাকলুম, সে কাছে এসে বললে, কি?

তোমার নাম কি?

আমার নাম সন্তোষ।

আচ্ছা, উর্বশীর বাড়িটা কোথায় বলতে পার?

মাসী! মাসী তো এখানে আসে নি।

মহা ফাঁপরে প'ড়ে গেলুম। বিশ্বের প্রেয়সীর যে আবার একটি বোনপো আছে, তা তো আমার জানা ছিল না। তাকে কি বলব ভাবছি, এমন সময় সে বললে, তোমার দাড়ি কোথায় গেল?

দাড়ি! দাড়ি আমি রাখি না।

বালকের মুখে বিস্ময়ের একটা ছায়া এসে পড়ল; দেখতে দেখতে তার অমন সুন্দর হাসিমাখা সরল মুখখানা গোমরা-মুখো বিজ্ঞ বৃদ্ধের মত হয়ে গেল। সে কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে চেয়ে যে দিক থেকে আসছিল, সেই দিকেই ছুট দিলে।

আমি তো অবাক! হঠাৎ যে তার কি হ'ল, তা ভেবে ঠিক করতে

পারলুম না। ব'সে ব'সে তারই কথা ভাবছি, এমন সময় ছেলেটি একটা লোক নিয়ে এসে আঙুল দিয়ে আমায় দেখিয়ে দিলে। লোকটার মুখে যেমন দাড়ি, তেমনই গোঁফ। সে আমায় প্রশ্ন করলে, আপনার দাড়ি নেই কেন?

কামাই ব'লে।

প্রশ্ন হ'ল—কবে এখানে আসা হয়েছে?

আজ।

ওঃ, আপনি এখানকার নিয়ম-কানুন জানেন না বুঝি? স্বর্গে দাড়ি কামাবার হুকুম নেই। দেবরাজ ইন্দ্র থেকে আরম্ভ ক'রে সবাই এখানে দাড়ি রাখতে বাধ্য।

আমি বললুম, আজ্ঞে, ভবিষ্যতে আর কামাব না, আপনি উর্বশীর ড়িটা চেনেন কি?

আমার প্রশ্ন শুনে লোকটা কটমট ক'রে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর গম্ভীর গলায় বললে, এই করতে এখানে আসা হয়েছে বুঝি?

লোকটার মুরুব্বিয়ানা আমার প্রথম থেকেই ভাল লাগছিল না। কি করব, নতুন জায়গা ব'লে সবই সহ্য করতে হচ্ছিল; কিন্তু আর পারা গেল না, আমি বললুম, তবে কি স্বর্গে এসেছি তোমার ঐ দাড়িওয়ালা মুখ দেখতে?

তারপরে উভয়ে হাতাহাতি। হঠাৎ সে এমন এক প্যাঁচ আমায় মারলে যে, আর সামলাতে পারলুম না। সেখান থেকে একেবারে মর্ত্যে এসে দড়াম ক'রে প'ড়ে গেলুম। ঝাঁকুনির চোটে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখি, আমার সঙ্গী আমায় ঠেলছে। চোখ চাইতেই সে আমার একখানা হাত ধ'রে একেবারে টেনে তুলে বললে, চ'লে আয় দিকিন।

তারপর সে আমাকে টানতে টানতে ছুট দিলে।

আমি বললুম, ব্যাপার কি?

সে চেঁচিয়ে এক ধমক দিয়ে বললে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিস নি।

টানতে টানতে সে আমায় এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলে। গিয়ে দেখি, সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। সে ভিড় ঠেলে আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। সেখানে একটা মৃতদেহ প'ড়ে রয়েছে, মড়াটা ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছে, আর তার সর্বাঙ্গে মাছি ভনভন করছে। ব্যাপারটা যে কি, তা ভাল ক'রে বোঝবার আগেই সে মড়ার মাথার দিকটা তুলে ধ'রে আমাকে বললে, নে, তোল্ ওদিকটা।

তার এই আদেশের মধ্যে এমন একটা সুর ছিল যে, আমি আর কোন প্রশ্ন করতে পারলুম না। আস্তে আস্তে মড়ার পা দুটি তুলে ফেললুম। মড়াটাকে তুলতেই চারদিকের লোকেরা নাকে কাপড় দিয়ে স'রে গেল। আমার সঙ্গী গটগট ক'রে এগিয়ে চলল, আর আমি মড়ার দুই পা মাথায় নিয়ে তার পেছনে যেতে লাগলুম।

শহর ছাড়িয়ে ক্রমে আমরা একটা জঙ্গলময় জায়গায় এসে পড়লুম। এই লোকটার কাণ্ড দেখে প্রথমে আমার ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গিয়েছিল, কিছুক্ষণ চলার পর সে ভাবটা কেটে গেলে আমার অত্যন্ত বিরক্তি ধরতে লাগল। একে শরীর অবসন্ন, তার ওপর কোথাকার এই পচা মড়া; ইচ্ছে হচ্ছিল, মড়াটা ফেলে দিয়ে লোকটাকে বেশ ক'রে ঘা দুই-চার দিয়ে চ'লে যাই।

চলতে চলতে হঠাৎ সে ব'লে উঠল, মানুষ মড়ার চেয়ে জ্যান্ত মানুষকেই বেশি ডরায়।

আমি বললুম, কেন?

শুনলুম, এই লোকটার ওলাউঠো হয়েছিল। দুদিন ধ'রে সে পথের ধারে প'ড়ে ছটফট করেছে, কেউ তার মুখে এক গণ্ডুষ জলও দেয় নি। আর যাই সে মরেছে, মাছির মত পালে পালে লোক এসে মড়া ঘিরে দাঁড়িয়েছে! কি মজা বল্ দেখিন!

এর মধ্যে মজাটা কোথায়, তাই ভাবতে লাগলুম। মনে হ'ল, দু-দিন আগে আমিও পথের ধারে মরতে বসেছিলুম।

অনেকক্ষণ চলার পর আমরা একটা স্বল্পতোয়া নদীর ধারে মড়া নামালুম। আমার সঙ্গী বললে, তুই এখানে মড়াটা আগলে ব'স্, আমি গাঁয়ে গিয়ে একটা কুড়ুল যোগাড় ক'রে আনি।

আমার সঙ্গী আমাকে রেখে গাঁয়ের দিকে চ'লে গেল। আমি মড়া আগলে ব'সে ভাবতে লাগলুম আমার সঙ্গীর কথা। নদীর ওদিকে দূরে একটা উঁচু পাহাড়ের পিঠের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে সূর্য ওপারে নেমে যেতে লাগল। নদীর এক দিকে নিবিড় বন, সন্ধ্যারাণীর আঁচলের পরশ লেগে সেই বিশাল বন জেগে উঠেছে। তারই আওয়াজ বাতাসে ভেসে এসে আমার কানে লাগতে লাগল—ঝম ঝম ঝম। আমার মনে হচ্ছিল, আমার সঙ্গী সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে বোধ হয় এমন একটা কিছু কাণ্ড বাধিয়েছে, যাতে সমস্ত জঙ্গলটা চীৎকার ক'রে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। হঠাৎ মড়াটার মুখের ওপর আমার চোখ পড়ল—ইস!

এতক্ষণ তার মুখ দেখি নি। কি বীভৎস সে দৃশ্য! মৃত্যুর মধ্যে জীবনের যে পরিপূর্ণতা, যে সৌন্দর্য ও শান্তি আছে, এ মুখে তার চিহ্ন-মাত্রও নেই। অতৃপ্ত তৃষ্ণার যন্ত্রণা সেই পচা ধসা মুখ থেকে তখনও মিলিয়ে যায় নি। আমি আর সেখানে বসতে পারলুম না, উঠে একটু দূরে গিয়ে বসলুম।

ক্রমে অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল। এত অন্ধকার যে, নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। আমার সঙ্গীর দেখা নেই, ব'সে ব'সে ভাবছি, কখন সে আসবে! মনের মধ্যে হঠাৎ কে যেন বললে, সে কি আর ফিরবে?

তাই তো! সে যে রকম লোক, তার পক্ষে তো কিছু বিচিত্র নয়! তারপর? এই অন্ধকার রাতে এই পচা মড়া নিয়ে আমি কি করব?

ভেতর থেকে কে যেন এক ঠেলা দিয়ে আমায় তুলে দিয়ে বললে, পালা পালা, তুই কি পাগল হয়েছিস?

আমি তড়াক ক'রে উঠে পড়লুম। কিন্তু অন্ধকার। কি ভীষণ অন্ধকার! এত অন্ধকার আমি কখনও দেখি নি। সেই অন্ধকার ঠেলে আমি শহরের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না। আমার মনে হতে লাগল, সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন লক্ষ লক্ষ অশরীরী আত্মা সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে, বিষাক্ত সাপের গর্জনের মত ফোঁস ফোঁস ক'রে আমার চারিদিকে তারা যেন কি বলাবলি করছে! তারা আমাকে সেই মড়াটার দিকে ঠেলে নিয়ে চলল। আমার শরীরে শক্তি নেই, অবসন্ন শরীরটাকে তারা সেইখানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে। আমি অসহায়ের মত মড়ার মাথাটার কাছে ব'সে পড়লুম।

অন্ধকারে আমি চুপচাপ ব'সে আছি, মাঝে মাঝে অনিচ্ছা সত্ত্বে মড়াটার দিকে চাইতে হচ্ছে। তার সমস্ত দেহের মধ্যে সাদা দাঁতগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ ঘড়ঘড়ে ধরা গলায় সে যেন ব'লে উঠল, জল, একটুখানি জল!

আমি ছুটে গিয়ে নদী থেকে গণ্ডুষ ক'রে জল এনে তার মুখে দিতে লাগলুম।

মড়ার মুখে কত গণ্ডুষ জল দিয়েছি, তা মনে নেই। একবার নদী থেকে ফিরে এসে দেখি, আমার সঙ্গী ফিরে এসেছে। তার সঙ্গে দুজন

লোক, তাদের মাথায় এক এক বোঝা কাঠ চাপানো, আমার সঙ্গীর হাতে একটা লণ্ঠন। আমাকে দেখে সে বললে, মরা মানুষ কি আর জল খায় রে পাগলা!

আমার সর্বাঙ্গ তখন থরথর ক'রে কাঁপছিল, আমি তার কথার কোন জবাব দিতে পারলুম না, ব'সে পড়লুম।

তারা তিনজনে মিলে চিতা সাজিয়ে মৃতদেহ তুলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে। আমার সঙ্গী তার সঙ্গের লোক দুটোকে বললে, তোরা যা, কাল সকালে তোদের লণ্ঠন পৌঁছে দোব।

তারা চ'লে গেলে সে বললে, ওরা কি আসতে চায়!

আমি আর থাকতে পারলুম না। বললুম, তোমার মতন শখ আর কার আছে বল? রাস্তার মড়া তুলে এনে রাত-দুপুরে এই ফ্যাসাদ না বাধালে আর চলছিল না, না?

লোকটা আমার কথা শুনে ফ্যাঁৎ ক'রে একটা আওয়াজ করলে। সেটা হাসি, না কান্না—কিসের শব্দ, অন্ধকারে তা বুঝতে পারলুম না।

দুজনে চুপচাপ ব'সে আছি। আমাদের সামনে ধুধু ক'রে চিতা জ্বলছে। হঠাৎ সে আমায় একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, এই, চিতার ওপর লাফিয়ে পড়তে পারিস?

না বাবা, অত শখ আমার নেই।

আর যদি তোকে জোর ক'রে ওই চিতায় ফেলে দিই?

আমার আর সহ্য হ'ল না। আমি বললুম, দেখ, এক ঘটি দুধ খাইয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছ। আর যদি বেশি ঘাঁটাও, তা হ'লে ঠ্যাং দুটো ধ'রে একটি আছাড়ে সাবাড় ক'রে ওই চিতায় ফেলে দোব।

সত্যি?—ব'লে লোকটা লাফিয়ে উঠল। তারপরে নির্বিকারভাবে বললে, দে ভাই, দে, দেখি তুই কত বড় পালোয়ান!

খামকা একটা লোককে মেরে পোড়াব কি? আচ্ছা মুশকিলেই পড়া গেল! চুপ ক'রে ব'সে রইলুম, আর সে আমার চারদিকে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে ঘুরে বলতে লাগল, দে, ঠ্যাং ধ'রে আছাড় দে।

একবার মনে হ'ল, দোষ নাকি শেষ ক'রে? খানিকক্ষণ সেই ভাবে চেঁচামেচি ক'রে সে বললে, দূর, কাপুরুষ কোথাকার!

তারপর গজর গজর করতে করতে সে আমার কাছ থেকে দূরে স'রে গিয়ে বসল। কিন্তু তার শ্লেষ আমার সর্বাঙ্গে যেন বিষের দাহন ছিটিয়ে দিলে। আমি তার কাছে গিয়ে বললুম, কই, আমায় চিতায় ফেলে দাও তো, দেখি তুমি কত বড় বীরপুরুষ!

আমার কথা শেষ হতে না হতে সে টপ ক'রে আমায় কোল-পাঁজা ক'রে তুলে চিতার দিকে ছুটল। আর একটু হ'লেই আমায় চিতায় ফেলে দিয়েছিল আর কি! আমি দু হাতে তার গলা চেপে ধ'রে জোড়া পায়ে বুকে চাড়া দিয়ে তার কবল থেকে কোনও রকমে ছটকে বাইরে প'ড়ে গেলুম।

এর পরে আর সেখানে থাকা চলে না। আমি বললুম, বাস্, এই পর্যন্ত। আমি চললুম।

সে চুপ ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। চিতার আলো তার মুখের ওপর প'ড়ে তার মুখখানা ঠিক সেই মড়াটার মতন দেখাচ্ছিল। আমি সেদিকে আর চাইতে পারলুম না। কোনও কথা না ব'লে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে শহরের দিকে এগিয়ে চললুম। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই সে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলে। আমি মনে করলুম, বুঝি জ্যান্ত মানুষকে পোড়াবার শখটা না মিটিয়ে সে আমায় ছাড়বে না।

কিন্তু এবার সে বললে, রাগ করলি ভাই? আয়।

যাওয়া হ'ল না। ফিরে এসে আবার চিতার কাছে গিয়ে বসতে হ'ল। মড়াটার আধখানা তখন পুড়ে গিয়েছে। আমার সঙ্গী চিতার ওপরে গোটা-দুয়েক মোটা মোটা কাঁচা কাঠ চাপিয়ে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ফিরে এসে বললে, তোর নাম কি রে?

রামদয়াল বাঁড়ুজ্জে। তোমার নাম?

হরিহর দত্ত। তোর বাড়ি কোথায়?

কলকাতা।

অ্যাঁ! সে চমকে উঠে বললে, কি বললি? কলকাতা? বাগবাজার জানিস—বাগবাজার?

কলকাতার ছেলে আর বাগবাজার জানি না!

তুই কতদিন বাড়িছাড়া?

আমি অনেকদিন বাড়ি ছেড়েছি, প্রায় পনরো বছর হবে।

আমার সঙ্গী বললে, আমার বাড়িও কলকাতা। ভারি ডানপিটে ছেলে ছিলুম আমরা, বুঝলি? বাগবাজারের ছেলে, জানিস তো কি রকম?

তা আর জানি না! হাতে হাতেই তার প্রমাণ পাচ্ছি।

সে বললে, দেখ্, জ্যান্ত মানুষকে আমি ডরি না। এই মরা মানুষেই আমাকে দেশছাড়া করেছে।

কি রকম?

শুনবি তবে? আচ্ছা, তা হ'লে আর দুখানা কাঠ চিতেয় চাপিয়ে দিয়ে আয়।

দুখানা কাঠ চিতার ওপরে চাপিয়ে তার পাশে এসে বসলুম। সে বলতে লাগল, ছেলেবেলা থেকেই ডানপিটে ছিলুম, ভারি ডানপিটে। আমার বাবা কিন্তু আমার চেয়েও বেশি ডানপিটে ছিলেন। তিনি

আমার মত ডানপিটে ছেলের পিঠে রোজ নিয়ম ক'রে ছুটো তিনটে ডাণ্ডা ভাঙতেন। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে, অত পরিশ্রম সহ্য হবে কেন? তাই অকালে তাঁকে মারা যেতে হ'ল। আমি বাবাকে বলতুম বাবা, আমার জন্যে তুমি অত পরিশ্রম ক'রো না। আহা! বাপের মন কিনা, তাতে বোঝ মানবে কেন? তিনি ভাবতেন, ছেলে আমার কিছু বোঝে না। একদিন বাবাকে বুঝিয়ে বললুম, দেখ বাবা, তোমার মা কাছে শুনেছিলুম যে, তোমার ঠাকুরদাদা গাঁজা আর মদ খেতেন, আর তোমার বাবা খেতেন গাঁজা। তুমি কিছু খাও না, আমিও যদি একটা বিড়িও না খাই, তা হ'লে তো বংশের নাম ডুববে। বাস্, আর যাবে কোথা! সেদিন প্রায় ঘণ্টা ছুয়েক ধ'রে আমাকে পিটিয়ে তাঁর হাত-পা এলিয়ে পড়ল। সেই ত্যালবেলে হাত-পা আর সোজা হ'ল না। দিন দশেক এই ভাবে কাটবার পর তিনি মারা গেলেন। মরবার সময় আমায় কাছে ডেকে বললেন, হরে, এমন কাজ আর করিস না বাবা।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে বললুম, বাবা, তুমি স্বর্গে থেকে দেখো, এবার থেকে তোমার সব কথা শুনে চলব। কিন্তু তুমি একটি দিনের জন্যেও আমার কথা শুনলে না, ছুঃখুটা আমার চিরদিনের জন্যে র'য়ে গেল।

বাবার ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছিল, কিন্তু আমার কথা শুনে তিনি হেসে ফেললেন। তাঁর প্রাণটা বোধ হয় জিবের ডগায় এসে ওত পেতে ব'সে ছিল, সেই হাসির ফাঁকে টপ ক'রে সেটা লাফিয়ে বেরিয়ে গেল আর বাবার মুখে সেই হাসিটুকু লেগে রইল।

মা অনেকদিন আগেই পালিয়েছিলেন। বাড়িতে বাবার এক খুড়ী ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমাদের বাড়ির বাইরের দিকটায় খানকয়েক দোকানঘর ছিল, তারই ভাড়াতে আমাদের ছুজনের কো

রকমে দিন কাটতে লাগল। তা দিদিমণিকে বেশিদিন বাঁচতে হয় নি। বাবা মারা যাবার বছরখানেকের মধ্যেই তিনিও স'রে গেলেন।

বেড়ে দিনগুলো কাটছিল, এমন সময় শহরে পেলেগ এল। পুলিস ঢেঁড়া দিতে লাগল, বোম্বাইসে আদমী এলেই থানায় খবর দিতে হবে। গোয়ালে আগুন লাগলে যেমন হয়, ঠিক সেই রকম ভাবে শহর থেকে লোক পালাতে লাগল। এই সময় আমাদের পাড়ার দীনে গয়লা পেলেগে মারা গেল। দীনু ঘোষের লোকজন সবাই পালিয়েছিল, যারা কলকাতায় ছিল, তারাও সে সময় এমন ডুব মারলে যে, তাদের পাত্তাই পাওয়া গেল না। মরা বাড়িতে পচে আর কি! শেষকালে আমি, অবিনাশ, জগবন্ধু আর বিশ্বনাথ—এই চারজন মিলে সেই মড়া পুড়িয়ে এলুম। সেই থেকে পাড়ায় কেউ মরলেই আগে আমাদের চারজনের ডাক পড়ত। শেষে শহরসুদ্ধ লোক আমাদের চিনে গেল। কায়েতের ছেলে আমি, লোকে আমায় 'মুড়িপোড়া-বামুন' ব'লে ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিলে। আমি ভাবলুম, ভালই হ'ল। বামুন হতে গিয়ে বিশ্বামিত্রের মতন তপস্বীকেও নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল, আর আমি কি রকম ফাঁকতালে বামুন হয়ে গেলুম!

দিনগুলো বেশ কাটছে। নিজে হাতে রাঁধি-বাড়ি খাই, সপ্তাহে একটা দুটো মড়া পোড়াই, আর তারই জেরে দুটো একটা নেমন্তন্ন লেগেই আছে। জ্যান্ত মানুষের চেয়ে মড়ার সঙ্গেই আমাদের মেলামেশা বেশি চলতে লাগল। কবিরা নাকি বলে, তেমন ভাবে ভালবাসলে সে ভালবাসার প্রতিদান পাওয়া যাবেই যাবে। আরে, কবির কথা বেদ-বাক্য। এই দেখ্ না, জ্যান্ত মানুষকে ভালবাসতুম না, বাসতুম মড়াকে। শেষকালে সেই মড়াই আমাকে বুঝিয়ে দিলে, জ্যান্ততে আর মড়াতে কোন তফাত নেই।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় আমরা চারটিতে পাড়ার এক রকে ব'সে গল্প করছি, এমন সময় একটি বুড়ো লোক এসে আমাদের বললে, বাবা, আমার মেয়েটি কলেরায় মারা গেছে। বিধবা অবস্থায় ছেলেবেলায় তার একটি সন্তান হয়েছিল ব'লে পাড়ার কোন লোক তাকে ফেলতে চাইছে না। তোমাদের নাম শুনে এসেছি, ভদ্রলোকের মেয়েকে কি শেষে মুদ্দোফরাশে ছোঁবে?

বৃদ্ধের চোখ দিয়ে টসটস ক'রে জল পড়তে লাগল। অবিনাশ ছিল আমাদের দলের সর্দার। সে বৃদ্ধকে আশ্বস্ত ক'রে বললে, সে কি কথা! আমরা রয়েছি যখন—চল হে, সে কি কথা!

আমরা উঠলুম। বৃদ্ধ এ গলি সে গলি অনেক ঘুরিয়ে আমাদের একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়িটা অতি পুরাতন। বোধ হয় শহরের পত্তন হবার আগে সেখানে তাঁতীদের আড্ডা ছিল। বাড়িটা যেন রাস্তাটাকে দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে। বাড়ির ভেতরের অবস্থাও সেই রকম। অন্ধকার। উঠনে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলেছে। আমাদের একটা এঁদো ঘরে বসিয়ে ভেতরে চ'লে গেল। বাড়ির ভেতরে কান্না বা কোন রকমের শব্দ নেই, সব চুপচাপ, মাঝে মাঝে দুটো একটা লোক ঢুকছে, কি বেরুচ্ছে মাত্র। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ব'সে থাকবার পর সেই বৃদ্ধ বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, আসুন।

আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলুম যে, উঠনে মড়া নামানো হয়েছে। আর বাক্যব্যয় না ক'রে খাট কাঁধে তুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেল। খানিকটা পথ এগিয়েছি, এমন সময় বৃদ্ধ বললে, আপনারা এগিয়ে যান, আমরা পান-সিগারেট কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

আমরা চলেছি হনহন ক'রে নিমতলার দিকে। বৃদ্ধ আমাদের অনেক

পেছিয়ে পড়েছে, তাকে আর দেখতেই পাচ্ছি না। একবারে শ্মশানে গিয়ে দেখা হবে মনে ক'রে আমরা আর তার জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই চলেছি। রাত অনেক হয়ে গিয়েছে, পথে লোকজন গাড়িঘোড়া বিরল হয়ে এসেছে। এমন সময় ফুটপাথের ওপর থেকে একটা পাহারাওয়ালা আমাদের বললে, এই বাবু, খাড়া রহো।

আমরা দাঁড়ালুম, কেয়া হায়?

পাহারাওয়ালা খটখট ক'রে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

সে বললে মূর্দাসে খুন নিকালতা কাহে?

আমরা তো অবাক! খুন কি রে বাবা!

দেখি, সত্যিই খাট চুঁইয়ে টপটপ ক'রে রাস্তায় রক্ত পড়ছে।

অবিনাশ পাহারাওয়ালাকে বুঝিয়ে দিলে, লোকটার দেহে আজ সকালে বড় রকমের একটা অস্ত্র করা হয়েছিল, তাই থেকে রক্ত ঝরছে।

পাহারাওয়ালা তার কথা শুনে আমাদের ছেড়ে দিলে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আমি বললুম, কি হে, ব্যাপার কি?

বিশ্বনাথ বললে, ব্যাপার কি বুঝতে পারছ না? চুপচাপ চ'লে এস, এখন চেঁচামেচি করলে ফ্যাসাদ বাড়বে বই কমবে না।

চারজনে ফুর্তি ক'রে শহর কাঁপিয়ে চলেছিলুম, সব ফুর্তি যে কোথায় মিলিয়ে গেল, তার আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। ভয়ে আমাদের তালু শুকিয়ে উঠতে লাগল, প্রতি পদেই পায়ে পা আটকে যায়, না পারি চলতে, না পারি চেঁচাতে। ঘাটের কাছে এসে শ্মশানে না ঢুকে গঙ্গার ধার দিয়ে সোজা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা নির্জন স্থানে আমরা মড়া নামালুম। তারপরে আস্তে আস্তে ওপরকার চাদরখানা তুলে দেখি, মড়াটাকে একেবারে মাদুর দিয়ে মুড়ে সেলাই ক'রে দেওয়া হয়েছে। আমরা কোন রকমে একদিককার দড়ি ছিঁড়ে ফেলে দেখি,

একটি স্ত্রীলোক, তার মুণ্ডুটা দেহ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। তার রক্ত তখনও গরম; বোধ হয়, আমাদের ডেকে এনে নীচে বসিয়ে রেখে তারপর খুন করা হয়েছে। আমরা তখনই চাদর ঢেকে দিয়ে পরামর্শ করতে লাগলুম, কি করা যায়?

অবিনাশ বললে, আমাদের যদি এখনই পুলিসে ধরে, তা হ'লে নিশ্চয় ফাঁসি হবে।

জগবন্ধু বেচারা তো কেঁদেই অস্থির, অ্যাঁ, ফাঁসি! অবিনাশ বললে, এটাকে এখানে ফেলে রেখে আমরা চারজনে চারদিকে সটকে পড়ি। হাঙ্গামা মিটলে তারপরে দেশে ফেরা যাবে। নয়তো এই পর্যন্ত।

বিশ্বনাথের ট্যাঁকে সাতটা টাকা, গোটা দশেক বিড়ি আর একটা ছুরি ছিল। ছুরিখানা সে রাখলে, আর সেই টাকা আর বিড়ি চারজনে ভাগ ক'রে নিয়ে আস্তে আস্তে চার দিকে স'রে পড়লুম। সেই যে সরেছি, বাস্, আর ফিরি নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তাদের কি হ'ল?

কে জানে? তবে অবিনাশ কাবুলের মন্ত্রী হয়েছে, আমির তাকে খুব খাতির করে। সুবিধে হ'লে একবার কাবুল যেতে হবে।

আমি বললুম, অন্য বন্ধুরা বোধ হয় এতদিনে বাড়িতে ফিরেছে?

সে বললে, কারও খোঁজ পাই নি। একটি কাবুলী একবার আমায় বলেছিল যে, তাদের দেশে একজন বাঙালী বাবু আছে, সে সেখানকার মন্ত্রী। আমি তখনই বুঝে নিলুম, ঠিক এ আমাদের অবিনাশ। ছেলেবেলা থেকে কাবুলের মন্ত্রী হবার দিকে তার ভারি ঝোঁক ছিল কিনা। রাস্তায় কাবুলী দেখলেই তাকে ধ'রে তার সঙ্গে সে পাঞ্জা লড়ত।

তা তুমি আর ফিরলে না কেন?

ফিরি কি ক'রে? এরা কি আর বাড়ি ফিরতে দিলে? যেদিন থেকে বাড়ি ছেড়েছি, সেদিন থেকে আর হাঁফ ছাড়বার ফুরসুৎই পাই নি।

আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করলুম না। ভাবতে লাগলুম এই লোকটার কথা, তার কাজের কথা আর আমার বিপুল অবসরের কথা—

নিজের চিন্তার স্রোতে অনেকদূর ভেসে গিয়েছিলুম, চমক ভাঙতেই দেখি, আমার সঙ্গী নিবন্ত চিতার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি উঠে তার কাছে যেতে সে আমায় বললে, ঘটিটা তো সেই রাস্তায় ফেলে আসা হয়েছে, চল্, হাতে ক'রে জল এনে চিতা নিবিয়ে চ'লে যাই।

আমরা গণ্ডুষ ক'রে জল এনে এনে যতদূর সম্ভব চিতা ঠাণ্ডা ক'রে গ্রামে গিয়ে লণ্ঠন ফিরিয়ে দিয়ে যখন শহরের দিকে অগ্রসর হলুম, তখন উদয়গিরি-চূড়ার শিখর রাঙা হয়ে উঠেছে।

পথের মাঝে আমার সঙ্গী বললে, তুই নাসিকে কি করতে যাবি?

কুম্ভ-স্নান করতে।

আমি যাব গোদাবরীর ধারে পঞ্চবটী বনে। কবিগুরু বাল্মীকির মানসকন্যা সীতার পায়ের ধূলোয় সেখানকার মাটি পবিত্র হয়ে আছে। সেই পবিত্র মাটিতে এই অপবিত্র পায়ের চাট্টি ধূলো ঝেড়ে দিয়ে আসব—

বলতে বলতে হঠাৎ সে থেমে বললে, বড় কষ্ট হ'ল তোর, কিছু মনে করিস নি ভাই।

আমি তার কথার কোন জবাব দিলুম না। দুজনে নির্বাক হয়ে চলতে লাগলুম। আমরা যেখানটায় ডেরা করেছিলুম, সেখানে গিয়ে দেখি, ঘটি ও কম্বল অদৃশ্য হয়েছে। সেদিন স্নান ক'রে খেয়ে রাস্তার ধারে প'ড়ে দুজনে সমস্ত দিনরাত ঘুমানো গেল। পরদিন সকালে উঠে নাসিকের দিকে যাত্রা করলুম।

আমাদের সঙ্গে বিরাট জনস্রোত চলেছে, লোক-চলার আর বিরাম নেই। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, বালক বালিকা, শিশু—সমস্ত ভারতবর্ষটাই যেন গড়িয়ে চলেছে তীর্থ করতে। চলতে চলতে আমরা মনমদে এসে পৌছলুম। আমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল, সঙ্গীকে বললুম, দাদা, একটা বেলা এখানে থেকে গেলে হ'ত না?

সে বললে, বেশ, আমার তো আর ট্রেন ধরার মত পুণ্যি করা নয় যে, অমুক তারিখে পাঁচটা সতয়ো মিনিটে নদীতে ডুব মারতে না পারলে আর স্বর্গে যাওয়া হবে না!

ঠিক হ'ল, একটা বেলা সেখানে কাটিয়ে যাব।

মনমদে সদাব্রত কিংবা ধর্মশালা কিছুই নেই, এখানে যাত্রীরা বড় একটা কেউ দাঁড়ায় না। আমরা খুঁজে খুঁজে এক মারাঠী যুবকের বাড়িতে আশ্রয় নিলুম। আমাদের আশ্রয়দাতা তরুণ, সে তার তরুণী ভার্যাকে নিয়ে সেখানে বাস করে। দুটি চালাঘর—একটিতে রান্না হয়, অন্যটিতে থাকা। ঘরে জিনিসপত্র খুবই কম, দেখলেই মনে হয় যে, তারা বড় গরিব।

আমাদের স্নান শেষ হ'লে আমাদের প্রিয়দর্শন আশ্রয়দাতা এসে বললে, স্টেশনে ব্রাহ্মণের দোকান আছে, রুটি ভাত যা চাইবেন পাবেন।

বলে কি! অনেকদিন পরে গৃহস্থের বাড়িতে খাব—এই চিন্তায় মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল, কিন্তু যুবকের কথায় আমরা দুজনে একেবারে ব'সে পড়লুম। স্টেশনে যে খাবার দোকান আছে, সে কি আমরা জানি না! যুবকের কথা শুনে আমার সঙ্গী অম্লানবদনে বললে, আবার স্টেশনে কে যাবে? তোমার স্ত্রীকে চাট্টি চাল চড়িয়ে দিতে বল।

তার কথা শুনে যুবকের হাসি এক নিমিষে মিলিয়ে গেল। সে কিছুক্ষণ বিমর্ষ মুখে থেকে বললে, দেখ, আমাদের এখানে খেলে তোমাদের জাত যাবে, আমার ও আমার স্ত্রীর বাপ-মায়ে বিয়ে হয় নি। তাদের হাতে তোমরা খাবে?

আমার সঙ্গী বললে, শিগগির ভাত চড়িয়ে দাও, আমরা এখুনি ঘুরে আসছি।

আমার সঙ্গী ঘর থেকে আমায় টেনে রাস্তায় বার করলে, তারপর লক্ষ্যহীনের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। চলতে চলতে একবার সে বললে, আহা, বেচারীরা বড় গরিব।

আমি বললুম, গরিব, কিন্তু লোক ভাল।

কিন্তু তোদের সমাজ এদের বাইরে ঠেলে রেখে দিয়েছে। কারা ঠকেছে বল্ দিকিন? ঘরোয়া মামলার মত দুই তরফই মারা যাচ্ছে।

রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় সে আমায় দাঁড় করালে। সামনে খানিকটা পরিষ্কার জমির চারদিকে তারের বেড়া, মাঝখানে ছোট্ট একটা একতলা বাড়ি, বোধ হয় সেখানে রেল-কোম্পানির কোন কর্মচারী থাকে। ফাঁকা জমিতে দুটো খোঁটায় দুটো গরু বাঁধা, তারা ঘাস খাচ্ছে। আমার সঙ্গী কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে টপ ক'রে তার ডিঙিয়ে ভেতরে লাফিয়ে পড়ল, তারপর গরু দুটোকে খোঁটা থেকে খুলে দরজা দিয়ে রাস্তায় বার ক'রে নিয়ে এল। আবার এক নতুন ফ্যাসাদের উপক্রম দেখে আমি গুটিগুটি সেখান থেকে স'রে এগিয়ে পড়ছিলুম, কিন্তু সে গরু দুটোর গলার দড়ি দু হাতে ধ'রে ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসে বললে, একটাকে ধর্।

আমি বললুম, এ আবার কি হবে?

রাস্তায় আসতে আসতে যে ফাঁড়ি দেখেছি, সেখানে এ দুটো জমা দিতে হবে কিনা—

বা রে! পরের গরু বাড়িতে বাঁধা রয়েছে, আর তুমি—

হ্যাঁ, খাঁটি দুধ খেতে হ'লে মাঝে মাঝে এ রকম খরচ করতে হয়।

কাজটা যে অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সে তর্ক করতে গেলে হয়তো আবার অন্য বিপদ হতে পারে ভেবে আর বাক্যব্যয় না ক'রে একটা গরুকে ধ'রে নিয়ে চললুম। ফাঁড়ির কাছে এসে আমার হাত থেকে গরুর দড়িটা নিয়ে সে দু হাতে দুটো গরু টানতে টানতে ভেতরে ঢুকে গেল। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম, এ রকমের লোকের সঙ্গে আর কদিন কাটালে নির্ঘাত জেলে যেতে হবে। ইতিমধ্যে সে বেরিয়ে এসে বললে, যাক, আট আনা পাওয়া গেছে, চল্।

আমাদের আশ্রয়দাতার বাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখি, ভাত হয়ে গেছে। অনেকদিন পরে বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। যাবার সময় আমার সঙ্গী সেই যুবকটির হাতে আধুলিটা দিতে গেল, কিন্তু সে কিছুতেই তা নেবে না, শেষকালে সে তার স্ত্রীকে ডেকে বললে, মা, তোমার ছেলে তোমায় প্রণাম করছে, নাও তো লক্ষ্মী।

মেয়েটি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে একখানা হাত বাড়াতেই সে টপ ক'রে আধুলিটা তার হাতে ফেলে দিয়েই আমাকে বললে, চল্।

সমস্ত দিনরাত অবিশ্রান্ত চলার পরদিন সন্ধ্যের সময় আমরা নাসিকে এসে পৌঁছলুম। সমস্ত ভারতবর্ষের লোক, যে যেখানে আছে, স্নান করতে এসেছে, কোন সম্প্রদায় আর বাকি নেই—গৃহী, সন্ন্যাসী, উদাসী, চোর, জোচ্চোর, ডাকাতে পথ পরিপূর্ণ। কুম্ভমেলা যে না দেখেছে, সে হিন্দুকে দেখে নি। স্বর্গলাভের জন্যে হিন্দু কি রকম

অকাতরে সৎ অসৎ সমস্ত কাজই করতে পারে, প্রয়োজন হ'লে কেমন অকাতরে পরের প্রাণ পর্যন্ত নিতে পারে, এখানে প্রতি পদেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যেদিন নাসিকে গিয়ে পৌছলুম, তার পরের দিন সকালে স্নান। লক্ষ লক্ষ যাত্রী গোদাবরীর তীরে আড্ডা করেছে, পুলিস ও স্বেচ্ছাসেবক মিলে কোন দিক সামলাতে পারছে না। নদীতে সামান্যই জল, যেখানে খুব গভীর সেখানেও এক কোমরের বেশি নয়। নদীর বুকে বড় বড় কালো পাথর জল ছাড়িয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক নরনারী সেই পাথরের ওপরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। বড় বড় নামজাদা সন্ন্যাসী শিষ্য-পরিবৃত হয়ে ব'সে আছেন, কেউ বা সদাব্রত খুলেছেন, কোথাও ধর্ম-উপদেশ হচ্ছে, কোথাও বা তুরীয়ানন্দের ধোঁয়ায় মর্ত্যে মেঘের সৃষ্টি হচ্ছে। কোন কোন সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে জলস্রোতের মত অবিশ্রান্ত অশ্লীল গালাগালির স্রোত বেরিয়ে শ্রোতা ও দর্শকদের মনে যুগপৎ ভীতি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করছে। যে সন্ন্যাসী যত বেশি গালাগালি দিচ্ছে, সেখানেই ভিড় তত বেশি, সে কটা দেখবার জিনিস।

আমরা অনেক মারামারি ক'রে নদীর বুকের ওপর একখানা প্রকাণ্ড পাথরের এক কোণে একটু আশ্রয় পেলুম। সারারাত ঘুমোবার উপায় নেই, ঘুমোলেই অন্য ব্যক্তি এসে আমাদের ঠেলে জলে ফেলে দিয়ে সেই স্থানটুকু অধিকার ক'রে বসবে। কোন রকমে শুয়ে ব'সে রাত কাটাতে হ'ল।

সকালবেলা উঠে যাত্রীরা কোমর-জলে নেমে দাঁড়াল, সময় এলেই ডুব দিতে হবে। পুলিসের লোক জলে স্থলে বড় বড় ডাণ্ডা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্নান আরম্ভ হ'লে কেউ যেন বেশিক্ষণ জলে না থাকে। আমি ও আমার সঙ্গী দুজনে তাদের সঙ্গে জলে নেমে অপেক্ষা করতে

লাগলুম। হঠাৎ সেই বিশাল জনসঙ্ঘ চেঁচিয়ে উঠল, জয় জয় মায়ী—

তারপরে টপাটপ ডুবের পালা। আমি ডুব দিতে যাচ্ছি, এমন সময় আমার সঙ্গী টপ ক'রে ধ'রে ফেললে।

আমি বললুম, কি ?

সে বললে, দাঁড়িয়ে মজা দেখ্ না, এত লোকের সঙ্গে স্বর্গে গেলে সেখানে টেঁকতে পারবি ?

আমি তার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করতে লাগলুম। সে আবার বললে, এদের সঙ্গে তুইও কি পাগল হ'লি ?

আর সময় ছিল না, পুলিসের লোক তখুনি আমাদের জল থেকে তুলে দিয়ে অন্য লোকদের স্নানের জায়গা ক'রে দিলে। কোমর-জল থেকেই আমাদের উঠতে হ'ল।

জল থেকে উঠে আমি অনেক দূরে অপেক্ষাকৃত একটু নির্জন জায়গায় গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। দুঃখে ক্ষোভে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছিল। আমার সঙ্গী সমস্ত দিন চুপচাপ আমার পাশে ব'সে রইল। সন্ধ্যের পর সে আমাকে তুলে নদীর ধারে নিয়ে গেল। স্নান ক'রে এক জায়গায় খেয়ে আমরা এক সন্ন্যাসীর আস্তানায় গিয়ে বসলুম। সন্ন্যাসীর চারিদিকে বিস্তর লোক গোল হয়ে ব'সে গিয়েছে। আর তার মুখ দিয়ে অনর্গল গালাগালির স্রোত বেরুচ্ছে। সবাই বললে, ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ।

আমরা তার কাছে গিয়ে বসতেই সে আমাদের অশ্লীল ভাষায় একটা গালাগালি দিয়ে তার কাছে যেতে বললে। আমি ব'সে রইলুম, আমার সঙ্গী হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে কোন দ্বিধা না ক'রে সন্ন্যাসীর গালে বিরাট একটা চপেটাঘাত কষিয়ে দিলে। সেই চড়ের শব্দে কি

মেশানো ছিল বলতে পারি না, সেখানে যত লোক ব'সে ছিল সবাই আবিষ্টের মত জনড় হয়ে ব'সে রইল। সন্ন্যাসী চড় খেয়ে মাথা ঘুরে প'ড়ে গিয়েছিল, কিন্তু বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গীর মাথা লক্ষ্য ক'রে তাঁর দেড় হাত লম্বা চিমটেখানা মারলে ; আমার সঙ্গী বাঁ হাতে চিমটেটা ধ'রে তার নাকে এক ঘুষি বসিয়ে দিলে, সন্ন্যাসী একেবারে ঘুরে মাটিতে দড়াম ক'রে প'ড়ে গেল।

সন্ন্যাসী ভূতলশায়ী হওয়ামাত্র চারিদিক থেকে "মার্ মার্" শব্দে সকলে তাকে তেড়ে চলল। তারপর জুতো, লাঠি, ঘুষি আর চিমটে— আমার মনে হ'ল, তার একখানি হাড়ও আর আস্ত নেই। সন্ন্যাসীর শিষ্যেরা তাদের গুরুকে তুলে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেল। ;ড়য় লোকেরাও তাদের পেছন পেছন যেতেই সুযোগ বুঝে আমি মৃতপ্রায় সঙ্গীকে তুলে নিয়ে এক দিকে দৌড় দিলুম ; অনেকদূর ছুটে এসে তাকে মাটিতে নামিয়ে রাখলুম। তার মাথা থেকে পা—সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়ছিল। নদী থেকে জল এনে তার মাথায় দিতে লাগলুম। বোধ হয় দু ঘণ্টা পরে সে চাইলে। আমি সারারাত ব'সে তার সেবা করলুম।

সকালবেলা সে ধড়ফড় ক'রে উঠে আমার একখানা হাত চেপে ধ'রে অনুনয়ের সঙ্গে বললে, চল্, এখান থেকে চ'লে যাই।

আবার চলা শুরু হ'ল। দিন দুয়েক গ্রামের পথে চ'লে আমার সঙ্গী জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ ধরলে। আমার ইচ্ছে ছিল, অজন্তার দিকে যাব। সে বললে, চল্, সাতারায় যাই, সেখান থেকে ফিরে অজন্তায় যাব।

চলতে হ'ল, তারই সঙ্গে চললুম। তার কথার মধ্যে এমন একটা কি ছিল, যা আমি কিছুতেই অমান্য করতে পারছিলুম না।

চলেছি তো চলেইছি। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ভেতর দিয়ে সরু পথ। আমাদের চারিদিকে নীচে ওপরে বিশাল অরণ্য, তারই মধ্যে আমরা দুজন যাত্রী অনির্দিষ্ট যাত্রায় এগিয়ে চলেছি। সমস্ত দিন রোদের মুখ দেখতে পাই না, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড়ের মাথাগুলো দিনরাত মেঘে ঢেকে আছে। রাত্রে গাছের ওপর ব'সে অজানা জানোয়ারের বিকট ডাক শুনে আঁতকে উঠি, সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করি, সে বলে, শেয়াল ডাকছে। সকাল হ'লে আবার চলি।

তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, সমস্ত বনটা মুখরিত। আমার মনের মধ্যেও নানা চিন্তার ঢেউ উঠছিল। কোথায় চলেছি, কেন চলেছি? কোথা থেকে ধূমকেতুর মত এই লোকটা এসে আমার এই নির্ঝঞ্ঝাট জীবনটাকে এমনভাবে আলোড়িত করলে? আমার জীবনের সঙ্গে কেমন ক'রে এর জীবনের ধারা এসে মিশল? আর কতদিন সে আমায় এমন ক'রে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে? কেন আমি তার সঙ্গে এমন ক'রে ঘুরে মরছি? আমার সমস্ত অন্তরটা বিদ্রোহের সুরে বলতে লাগল, কেন? কেন? কেন?

আমি তাকে বললুম, সাতারায় গিয়ে আবার ফ্যাসাদ বাধাবে তো?

আমার কথা শুনে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দু হাতে আমার দু কাঁধ ধ'রে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সন্ধ্যের আবছায়ার ভেতর দিয়ে দেখলুম, তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। কিছুক্ষণ সেই ভাবে থেকে সে বললে, আচ্ছা, তুই যা, আমি চললুম।

এই ব'লে সে হনহন ক'রে পাহাড়ের ওপর উঠে যেতে লাগল।

আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। ক্রমে তার দেহখানা আমার চোখে ছোট্ট হয়ে আসতে লাগল। তারপর যে অদ্ভুত যাদুকর ধরণীর বুকে সেই

বিশাল পাহাড়, বন, নির্ঝরিণী ফুটিয়ে তুলেছে, মাথার ওপরে যে চিররহস্যময় নীল চাঁদোয়া উড়িয়ে দিয়েছে, সে তার অদ্ভুত তুলির আর একটা আঁচড়ে সেই অদ্ভুত মানুষটাকে পাহাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে। পশ্চিমঘাটের বিরাট অরণ্যের মধ্যে আমি একা দাঁড়িয়ে রইলুম।

তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি।

অন্ধকারের অন্তরালে

আজ তিন দিন হ'ল লীলা জ্বরে শয্যাগত হয়ে আছে; মুখে তার জল দেবার লোক নেই।

কলকাতার একটা বিশ্রী পল্লীর তেতলার একখানা ঘরে তার বাসা। বাড়িতে আরও দশ-বারোটা হতভাগিনী বাস করে। এদের সঙ্গে লীলার চোখের পরিচয় আছে মাত্র, মুখের আলাপ নেই।

কয়েক বছর আগে বর্ষার এক ঘনঘটাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় লীলা তার প্রতিবাসী রমেশের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে এই ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। সেই থেকে আজ অবধি এইখানেই তার দিন কেটেছে। লীলার মনে দম্ভ ছিল যে, তার চারপাশের এই সব অভাগিনীদের চেয়ে সে ঢের উঁচু। তারা কত বার কত ছলে তার সঙ্গে ভাব করতে এসেছে, কিন্তু বারে বারেই ঘৃণায় সে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রতি রাত্রে তাদের বীভৎস প্রমত্ত লীলা তার দেহ-মনকে কণ্টকিত ক'রে তুলেছে; তার জন্মগত সংস্কার প্রতিদিনই এদের অভিসম্পাত হেনেছে, মৃত্যু কামনা করেছে।

চারিদিকের এই বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে লীলা অভেদ্য প্রেমের দুর্গ তৈরি ক'রে বাস করছিল, কিন্তু কয়েক মাস আগে তার প্রেম ও শ্রদ্ধাকে পদাঘাত ক'রে তার প্রণয়ী অন্তর্ধান করেছে।

শৈশবেই লীলার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু প্রেমের আস্বাদন পাবার অনেক আগেই তাকে বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসতে হয়।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বাপ-মা ও অভিভাবকেরা একে একে তার চোখের সামনে একাদশী, থান-ধুতি ও নিরাভরণতার যবনিকা টেনে

দিয়ে সংসারের নানা অশুচিতা থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় একদিন পাহাড়ে-নদীতে বান ডাকার মত তার নের দুকূল ছাপিয়ে উঠল। লীলার চিত্ত-বন অভূতপূর্ব গীত গন্ধ ম্পন ও মর্মর-ধ্বনিতে ভ'রে উঠল। তার হৃদয়ের এই নূতন অনুভূতির থা একজন কাউকে জানাতে পারে, এমন একজন বন্ধু যদি তার কেউ াকত! এতদিনে লীলার মনে হ'ল, পৃথিবীতে তার সবই আছে, কিন্তু কউ নেই। এই চিন্তা লীলার জীবনে যেন একটা বিষম ভারের মত চপে বসল। তার অভিভাবকেরা দেখলেন যে, সে রীতিমত থান-াপড় পরছে, দু বেলা নিয়মিত রামায়ণ পড়ছে, সাবিত্রীর উপাখ্যান াড়তে পড়তে তার চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠছে। কিন্তু তার অন্তরের ন্তধারার স্রোতে সে যে কোন্ সত্যবানকে নিয়ে জীবনতরী ভাসিয়েছে, কথা কেউ জানতে পারলে না।

এই সময়ে একদিন সদ্যস্নাতা সিক্তবসনা লীলাকে ঘাটের পথে মেশ প্রেম-নিবেদন করলে। লীলা তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে াপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে এল, কিন্তু কাউকে কিছু বললে না। তারপরে প্রতিদিন রমেশের অনুনয় আর প্রেমের অভিনয় চলতে াগল।

প্রেমে বিচারশক্তির উপদ্রব থাকে না। লীলাও নির্বিচারে রমেশকে ালবেসে ফেললে। তারপরে একদিন ভাদ্র মাসে খুব ভোরবেলা লীলা রমেশের সঙ্গে নৌকোয় চ'ড়ে কূল ছেড়ে অকূলে ভেসে পড়ল।

লীলার বাড়ির লোকেরা প্রথমে মনে করেছিল যে, স্নান করতে গিয়ে স স্রোতে ভেসে গিয়েছে। তার মা ভাই-বোনেরা সকলে তার জন্যে াঁদতে আরম্ভ করলে। লীলার বাবা পার্বতীচরণ জেলে ডেকে সমস্ত দিন জাল ফেলে তার দেহ খুঁজে বেড়ালেন। সন্ধ্যের পর হতাশ

হয়ে তিনি যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন পরিজনদের কান্না থেমে গিয়েছে পার্বতীচরণ মনে করলেন, হয়তো লীলার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে একটু পরেই তাঁর স্ত্রী অভয়াকালী তাঁকে সংবাদ দিলেন, লীলা সমুদ্রে ডুবেছে, সমাজের কোন জাল দিয়েই তাকে আর তোলা যাবে না

পার্বতী তাঁর তিন ছেলে, ছোট মেয়ে সুরবালা ও স্ত্রীকে ব'ে দিলেন, লীলার নাম এ বাড়িতে যেন আর কেউ মুখে না আনে।

দিন যায়। ভাই-বোনেরা একে একে সকলেই তাদের দিদিে ভুলতে লাগল। কেবলমাত্র মাঝে মাঝে নিশীথরাত্রে বিপথগামিন তনয়ার কুশল কামনায়, জননী অভয়াকালীর চোখ থেকে দু ফোঁট অশ্রু নীরবে গড়িয়ে পড়ত।

রমেশ যে লীলাকে ভালবাসত না, তা নয়। সেও লীলার সে বাড়িঘর ছেড়ে এসে এইখানে তাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মত বা করছিল। লীলার মত সেও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ছেলে। লীলাকে নিে প্রথমে কিছুকাল বেশ সুখেই তার দিন কেটেছিল, কিন্তু তার ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট আরম্ভ হ'ল। দারিদ্র্যে জীবনের সম মাধুর্য নষ্ট করে। তাদের দুজনের সম্বন্ধকে লালসা, প্রেম অথবা যে কো আখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, এতদিন সে সম্বন্ধে কোন আঘাত লাগে নি, সুখেই তারা দিন কাটাচ্ছিল; কিন্তু দারিদ্র্য এসে তাদে জীবন থেকে মাধুর্যের সেই আবরণটুকু তুলে নিলে। তখন প্রতি কথা তাদের মধ্যে ঝগড়া, রাগ, অভিমান ও কথাবন্ধ শুরু হ'ল।

এই রকম ক'রে দিন কাটছিল। এমন সময় একদিন রমেশ লীলা হাতে গোটা পঞ্চাশেক টাকা এনে দিয়ে বললে, এই টাকাগুলো রাখ আমি দিন সাতেকের জন্যে রাণীগঞ্জে যাচ্ছি চাকরির চেষ্টায়। চাকরি পেলেই তোমায় নিয়ে যাব।

অন্য সময় হ'লে লীলা রমেশকে কোথাও যেতে দিত না। কিন্তু দারিদ্র্যের কশাঘাতে তখন সে জর্জরিত; চাকরি না করলেই নয়, তাই সে আগ্রহের সঙ্গে রমেশকে পাঠিয়ে দিলে।

মাস দুয়েক আর রমেশের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। লীলা চঞ্চল হয়ে উঠল। তারপরে একদিন রমেশের কাছ থেকে চিঠি এল। রমেশ লিখেছে, রাণীগঞ্জে সে চাকরি পায় নি। সেখানে তার একজন আত্মীয় তাকে ধ'রে একেবারে দেশে নিয়ে চ'লে এসেছে। কলকাতায় সে যে আর কখনও যেতে পারবে, এমন ভরসা নেই।

রমেশের এই চিঠি প'ড়ে লীলা চোখে অন্ধকার দেখলে। পুরুষের এই হীনতার কথা সে ইতিপূর্বে অনেকের মুখে শুনেছে, উপন্যাসেও পড়েছে; কিন্তু তার নিজের জীবনে এমন ক'রে তা উপলব্ধি করতে হবে, তা যে সে স্বপ্নেও ভাবে নি।

লীলা ভাবতে আরম্ভ করলে, কি করবে সে? কেমন ক'রে সে জীবিকা অর্জন করবে? তাদের বাড়ির অন্যান্য অধিবাসিনীদের মতন হীন বৃত্তি অবলম্বন করতে সে তো কিছুতেই পারবে না। তবে সে কি করবে?

এমনই ক'রে ভয়ে ভাবনায় অনাহারে অর্ধাহারে তার দিন কাটতে লাগল। পঞ্চাশটি টাকা কয়েক মাস বাড়িভাড়া আর ঝিয়ের মাইনে দিতেই খরচ হয়ে গেল। শেষকালে না খেয়ে খেয়ে সে শয্যা নিলে।

আজ তিন দিন জ্বরের ঘোরে সে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে। খিদের জ্বালায় দু দিন সে পচা ভাত গিলেছে, কিন্তু কাল থেকে তার পেটে কিছুই পড়ে নি। বাড়ির অন্য মেয়েরা তার ঘরে ঢুকত না। প্রথমে যখন লীলা এ বাড়িতে আসে, তখন তাদের মধ্যে দু-চারজন

তার সঙ্গে ভাব করতে এসেছিল, কিন্তু তার হাবভাব দেখে তারা সেই যে চ'লে গিয়েছিল, আর তার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।

জ্বরে লীলা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। একবার একটু জ্ঞান হওয়ায় তার মনে হ'ল, কে যেন তার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সেই অবস্থাতেই তার মনে হ'ল, তবে কি সে ফিরে এল? এ নিশ্চয় সেই, তা না হ'লে এত আদর ক'রে কে তার কপালে হাত বুলিয়ে দেবে?

প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে একবার সে চোখ খুলে ওপরের দিকে চেয়ে দেখলে, তার পাশের ঘরের নলিনী মাথার কাছে ব'সে রয়েছে। তাকে চোখ চাইতে দেখে নলিনী বললে, লীলা, একটু হাঁ কর তো ভাই।

লীলার তখন আর চিন্তা করবার শক্তি ছিল না। সে হাঁ করতেই নলিনী তার গলায় একটা ছোট্ট গেলাসে ক'রে খানিকটা ওষুধ ঢেলে দিলে। ওষুধটুকু গিলে ফেলে লীলা আবার আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়ল। নলিনী তার মাথায় জলপটি দিয়ে বাতাস করতে লাগল।

লীলার যে এই অবস্থা হয়েছে, তা সেই বাড়ির কেউ জানত না। একেই সে কারুর সঙ্গে মিশত না, তারপরে রমেশের সেই চিঠি পাওয়া অবধি সে ঘর থেকে বার হওয়াই এক রকম বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

নলিনী কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছিল যে, রমেশ আর লীলার ঘরে আসছে না। লীলা যে রমেশের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, এ কথা তারা সকলেই জানত। রমেশ আসছে না দেখে সে ব্যাপার অনেকটা বুঝে নিয়েছিল। এরকম সে অনেকবার দেখেছে। তার নিজের জীবনেও এমনই একটা ঘটনা চিরদিনের দাগার মত আঁকা আছে। লীলার প্রতি সহানুভূতিতে তখুনি তার মনটা কানায় কানায় ভ'রে উঠেছিল, কিন্তু তবুও সে সাহস ক'রে তার কাছে যেতে পারে নি।

একদিন নলিনীর মুখে মদের গন্ধ পেয়ে লীলা তাকে অপমান ক'রে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর সে আর তার ঘরে ঢোকে নি।

লীলাদের বাড়ির একজন ঝি সকালবেলা সকলের বাজার ক'রে দিয়ে যেত। তারই মুখে নলিনী লীলার অসুখের কথা শুনে তার কাছে এসে দেখে যে, সে জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে। নলিনী তখন থেকেই তার শুশ্রূষা আরম্ভ ক'রে দিলে। তার কাছে তখন যে লোকটা আসত, সে ডাক্তার। নলিনী তখুনি তাকে ডেকে এনে লীলার চিকিৎসা আরম্ভ ক'রে দিলে।

প্রায় পনরো দিন অক্লান্ত চেষ্টা ক'রে নলিনী লীলাকে সারিয়ে তুললে। এবার কিন্তু লীলা আর নলিনীকে তার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলে না। তার সহস্র রূঢ় ব্যবহারের প্রতিদানে নলিনী যা দিয়েছে, সেজন্যে তার প্রতি শ্রদ্ধায় লীলার মনটা নুয়ে পড়ল। সে তার জীবনের সমস্ত কথা নলিনীর কাছে খুলে ব'লে ভবিষ্যতের পথে চলবার জন্যে হাতখানি তার হাতে তুলে দিলে।

সমাজের সমস্ত রাস্তাই তখন লীলার কাছে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই তার চোখের সামনে সে যে পথ দেখতে পেলে, সেই পথেই ঢুকে পড়ল। এতদিন যে সৌধশিখরে ব'সে অবজ্ঞায় এদের দিকে সে দৃকপাতও করত না, অকস্মাৎ আকাশের প্রাসাদের মতন তার সেই সৌধ মনেই মিলিয়ে গেল। লীলা মনে প্রাণে অনুভব করলে, যাদের সে এতদিন ঘৃণা করেছে, সে তাদেরই একজন।

লীলার নূতন জীবন আরম্ভ হ'ল। নিত্য সন্ধ্যায় হাসি, গান, ফুর্তি ও আমোদের লহরী ছুটল। প্রতিদিন নূতন প্রণয়ীর আগমন। চেনা নেই, শোনা নেই, যার সঙ্গে কখনও চোখের দেখা পর্যন্ত নেই, তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয়। যে আসে, তারই মুখে সেই একই কথা—তোমায়

ভালবাসি। প্রতিদানস্বরূপ তাকেও বলতে হয়—তোমায় ভালবাসি। না বললে ব্যবসা চলে না। এই অভিনয়ের জন্তেই সে পয়সা নিয়েছে। সমস্ত রাত্রি মদ আর মাতালের হুল্লোড়, তারপর সকালবেলা মস্তিষ্কের অবসাদ আর আত্মার অনুতাপ।

লীলার মাঝে মাঝে মনে হ'ত, এ জীবন থেকে কোনও রকমে যদি মুক্তি পেতুম! মাঝে মাঝে সে স্বপ্ন দেখত, এই ঘৃণিত জীবনযাত্রা পরিত্যাগ ক'রে আবার সে তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়েছে। আর সে কখনও বাড়ি ছেড়ে বেরুবে না। শত সহস্র রমেশ পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেও সেদিকে সে ফিরেও চাইবে না। সুখের আতিশয্যে ঘুম ভেঙে গিয়ে সে দেখত, তার পঙ্কিল বিছানায় প'ড়ে আছে। তার মনে হ'ত, হায় রে দুরাশা! সমস্ত জীবনের বিনিময়ে দু দিন—দুটি দিনের জন্তে যদি সে তার বাবা-মা ভাই-বোনদের স্নেহনীড়ে ফিরে যেতে পারত!

বছর তিন-চার এমনই ক'রে কাটল। অত্যাচারে লীলার অনভ্যস্ত শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়তে লাগল। নানা রকমের রোগ এসে তার দেহকে আশ্রয় করলে। শেষকালে একদিন সে শয্যা নিলে।

এক মাস দু মাস তিন মাস কেটে গেল, লীলার রোগ আর সারে না। দু দিন ভাল থাকে তো চার দিন অসুখে পড়ে। অসুখের জন্তে তার ঘরে লোক আসাও ক'মে যেতে লাগল। একদিন শরীরটা একটু ভাল থাকলে সে তার রোগজীর্ণ দেহটাকে কোন রকমে চকচকে ক'রে নিয়ে নূতন গ্রাহকের প্রতীক্ষায় বারান্দায় গিয়ে বসত। তার সেই গলিত দেহখানারও জন্তে খদ্দেরের অভাব কোন দিনই হ'ত না। ভগ্নদেহ নিয়ে সারারাত্রি তাদের সঙ্গে হুল্লোড় ক'রে আবার সে শয্যা নিত।

অনেক কাল রোজগার বন্ধ থাকায় লীলার হাতে যা কিছু অর্থ ছিল, তা সবই ফুরিয়ে গেল। নলিনী তাকে দিন কতক সাহায্য করলে। কিন্তু সে বা আর কতদিন তার খরচ যোগাবে! সে তার বাবুকে ব'লে লীলাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে।

লীলা হাসপাতালে গেল। সেখানে হরেক রকমের রুগী আসে, তাদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তারা সাত আট দশ দিন থাকে, রোগ সেরে গেলে আবার চ'লে যায়। কিন্তু লীলার অসুখ আর সারে না। ক্রমেই সে নিজের জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়তে লাগল। সেখানে একলাটি শুয়ে শুয়ে তার কত কথাই মনে হ'ত! সে ভাবত, আর যদি না বাঁচি তো বেশ হয়। সংসারের ভারস্বরূপ হয়ে এই রোগজীর্ণ দেহ বহন ক'রে আর তো চলতে পারি না। বেঁচে থাকলে হয়তো আরও কত রকমের দুর্দশায় পড়তে হবে। তার চেয়ে এইখানেই যদি জীবনের বোঝা নামিয়ে দিতে পারি। কখনও বা আশা-কুহকিনী তার কানে ভবিষ্যতের আর একটু সুখময় জীবনের গান শুনিয়ে যায়, সে সর্বান্তঃকরণে বেঁচে ওঠবার জন্যে প্রর্থনা করে।

হাসপাতালে প্রায় তিন মাস কেটে গেল, কিন্তু লীলার অসুখ কিছুতেই সারল না। একদিন তাকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, তার যক্ষা হয়েছে। বাড়িতে গিয়ে ভাল ক'রে খাওয়া-দাওয়া করলে অসুখ সারতে পারে। হাসপাতালে থেকে আর কোনও লাভ নেই।

সকালবেলা হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে লীলা বাইরে এসে দাঁড়াল। বাইরের লোকজন গাড়িঘোড়া ও কোলাহল কানে যেতেই তার মনে হ'ল, এতদিন সে যেন খাঁচায় বন্ধ ছিল। মুক্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে হাসপাতালের দেওয়াল ধ'রে রাস্তার লোক-চলাচল দেখতে লাগল।

কয়েক মিনিটের জন্যে লীলা তার নিজের অস্তিত্বের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, হাসপাতাল থেকে তার ছুটি হয়ে গেছে, এখান থেকে চ'লে যেতে হবে।

কোথায় যাবে সে? কোথায় তার আশ্রয় আছে? পৃথিবীতে এমন কোন স্থান আছে, যেখানে জীবনের এই গোনাগুনতি দিন কটা সে শান্তিতে কাটাতে পারে? একবার তার বাড়ির কথা মনে হ'ল। সেখানে কি তার আশ্রয় মিলবে না? দুর্বল মস্তিষ্কে সে আর ভাবতে পারছিল না। ধীরে ধীরে সে তার কলকাতার বাসার দিকে পা চালিয়ে দিলে।

নলিনী মধ্যে মধ্যে কখনও বা নিজে গিয়ে কখনও বা তার বাবুকে দিয়ে লীলার সংবাদ নিত। লীলা যে আর বেশি দিন বাঁচবে না, সে সংবাদ সে পেয়েছিল। সেদিন সকালবেলা একেবারে লীলাকে সামনে দেখে সে চমকে উঠল। এতখানি পথ হেঁটে তার ওপরে তেতলা অবধি সিঁড়ি ভেঙে লীলা হাঁপাচ্ছিল, নলিনী তাড়াতাড়ি তাকে ধ'রে বসিয়ে বললে, আগে একটু খবর দিতে হয়, আমি নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করতুম। লীলা বললে, কাল রাতে তারা বললে, আমায় চ'লে যেতে হবে, আর আজ সকালে বিদায় করলে। খবর দিই কি ক'রে?

নলিনীর ঘরে সেদিন নানা রকমের খাবারের আয়োজন হচ্ছিল। লীলা জিজ্ঞাসু নয়নে তার দিকে চাইতেই নলিনী বললে, আজ যে বিজয়া, বন্ধুবান্ধব আসবে, একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে তো ছাড়তে পারি না।

একটু থেমে নলিনী আবার বললে, আজকের দিনে এসে বড় ভাল করেছিস।

লীলা বললে, কিন্তু ভাই, আমার তো খাওয়া হবে না। আমি যে এখুনি চ'লে যাব।

নলিনী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবি? বাড়িতে?

নলিনী অবাক হয়ে লীলার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার মুখ দিয়ে আর কোন প্রশ্ন বেরুল না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটবার পর লীলা বললে, নলিনী, ভাই, তুই আমার অনেক উপকার করেছিস। আর-জন্মে নিশ্চয় তুই আমার মায়ের পেটের বোন ছিলি। আমায় দুটো টাকা ভিক্ষে দে। জানিস তো আমার কাছে একটা পয়সাও নেই।

লীলার কথা শুনে নলিনীর চোখ দুটো জলে ভ'রে উঠল। সে কথা না ব'লে কিছুক্ষণ লীলার মুখের দিকে চেয়ে ব'সে থেকে, উঠে গিয়ে পাঁচটা টাকা এনে তার হাতে দিয়ে বললে, এই নে।

লীলা বললে, এত টাকা কেন দিচ্ছিস ভাই?

নলিনী বললে, আসবার ভাড়াটাও রেখে দে। কি জানি, যদি দরকার হয়।

বেলা এগারোটার সময় নলিনীর চাকর এসে লীলাকে রেলগাড়ির একটা কামরায় বসিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

লীলা যখন তাদের স্টেশনে এসে নামল, তখন শরতের বেলা প্রায় প'ড়ে এসেছে। স্টেশন থেকে তাদের বাড়ি প্রায় দু মাইল দূরে। বাড়ি পৌঁছতে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠবে, পথ চলতে কষ্ট হবে, মনের মধ্যে এই সব চিন্তা হওয়া সত্ত্বেও সে স্টেশনের বাইরে বেরুতে পারছিল না। তার ভয় হচ্ছিল, যদি কেউ তাকে চিনে ফেলে!

অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত সে সেই জনবিরল স্টেশনের একটি কোণে ব'সে রইল। তারপর সেখান থেকে উঠে মুখখানা বেশ ক'রে কাপড়ে ঢেকে বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিলে। একে পথ অন্ধকার, তার ওপরে বৃষ্টি হয়ে কাদা হয়েছিল। অনেকদিন গ্রামপথে চলা

অভ্যেস না থাকায় পদে পদে তার পা পিছলে যেতে লাগল। সন্ধ্যের সময় রোজ রোজ তার জর আসত, জরে তার মাথা টিপটিপ করছিল, পদে পদে পা আটকে যেতে লাগল, তবুও মনের জোরে সে অগ্রসর হতে লাগল। পথের মাঝে একদল ছেলে সিদ্ধি খেয়ে জটলা করছিল। লীলা তাদের পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতেই একজন ঠাট্টা ক'রে তাকে কি বললে। সেই অন্ধকারেও লীলা মুখ দেখে তাকে চিনতে পারলে। তাদেরই পাড়ার ছেলে সে। লীলা যখন বাড়ি থেকে চ'লে যায়, সে তখন শিশু ছিল।

লীলার এসব কথা ভাববার অবসর ছিল না। তার মাথার মধ্যে তখন অন্য রকম ভাবনার ঝড় বইছিল। হঠাৎ চৌধুরী-বাড়ির ঠাকুর-বিসর্জনের বাজনা তার কানে এসে লাগল। মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে সে এগিয়ে চলল।

আর একটু গেলেই লীলাদের বাড়ি; এ মোড়টা ঘুরলেই হয়। লীলার বুকের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ধড়ফড়ানি শুরু হ'ল। সদরদরজা দিয়ে তার ঢোকা হবে না। সে বেড়া গ'লে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপরে পা টিপে টিপে খিড়কির পুকুরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তার চারিদিকটা ভাল ক'রে দেখে কম্পিতচরণে তার মার শোবার ঘরের জানলার নীচে এসে হাঁপাতে লাগল।

বাড়িতে ছেলেমেয়েরা কেউ নেই। সকলেই প্রতিমা-বিসর্জন দেখতে গিয়েছে। লীলা দেখতে পেলে, তাদের ঠাকুরঘরের দরজাটা খোলা রয়েছে, ভেতরে আলো জ্বলছে।

সেখানে দাঁড়িয়ে লীলা ভাবছিল, এমন সময় কার গলার আওয়াজ পেয়ে ছুটে সে ঠাকুরঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে। ঘরের

ধ্যে কেউ ছিল না, শুধু একটা প্রদীপ জলছিল। লীলা গলবস্ত্র হয়ে াদের গৃহদেবতাকে প্রণাম ক'রে সেইখানে ব'সে রইল।

কতক্ষণ সেই ভাবে ব'সে আছে, তার কোন জ্ঞানই লীলার ছিল না। ঠাৎ দরজা খোলার শব্দ শুনে তার চমক ভাঙল। বিগ্রহের দিক থকে মুখ ফিরিয়ে সে দেখলে, তার মা একখানা রেকাবি হাতে নিয়ে াড়িয়ে আছেন। রেকাবিখানা মাটিতে রেখে বিস্ময়াবিষ্ট অভয়াকালী জজ্ঞাসা করলেন, কে?

লীলার মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না। একবার দুবার ঢাক গিলে সে শুধু বললে, মা!

অভয়াকালী এগিয়ে এসে একবার ভাল ক'রে তার মুখখানা দেখে নয়ে বললেন, কে, লীলা?

লীলা বললে, হ্যাঁ মা, আমি এসেছি তোমার কাছে থাকব ব'লে। যামায় তাড়িয়ে দিও না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা।

দেখতে দেখতে মায়ের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। তিনি জিজ্ঞাসা রলেন, এতদিন কোথায় ছিলি?

কলকাতায়।

তবে যা শুনেছি, সব সত্যি?

লীলা এ কথার কোন জবাব দিলে না। সে শুধু কাঁদতে কাঁদতে ললে, আমায় তাড়িয়ে দিও না মা।

অভয়কালী বললেন, সে কি ক'রে হবে? তোমার জন্যে আমরা কাথাও মুখ দেখাতে পারি না। সুরবালার তেরো বছর বয়স হ'ল, খনও তার বিয়ে হচ্ছে না। আমি যদি তোমায় রাখি, তা 'লে তোমার বাবা আমাকে আর তোমাকে দুজনকেই খুন ক'রে ফলবে।

লীলা বললে, কিন্তু মা, আমি তো আর বেশিদিন বাঁচব না। ডাক্তার ব'লে দিয়েছে, বড় জোর আর ছ মাস বাঁচব। এই কটা দিন তোমার কাছে থাকি মা।

এই ব'লে লীলা দু হাত দিয়ে তার মার পা জড়িয়ে ধরলে। অভয়াকালী এতক্ষণ স্থির ছিলেন, কিন্তু আর তাঁর চোখের জল শাসন মানলে না। এতদিন তিনি কতবার মেয়ের মৃত্যুকামনা করেছেন; আজ ভগবান তাঁর সেই কামনা সফল করতে উদ্যত দেখে বেদনায় তাঁর বুক উথলে উঠল। তাঁর ইচ্ছে করছিল, ডাক ছেড়ে চীৎকার ক'রে হৃদয়ের বোঝা কতকটা লাঘব করেন, কিন্তু চীৎকার করবার জো নেই।

তিনি স্নেহে লীলার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

বাইরে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, কই গো, তোমরা কোথায় গেলে সব?

অভয়াকালী তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটায় খিল লাগিয়ে দিয়ে এসে ফুঁ দিয়ে বাতি নিবিয়ে দিলেন। একটু পরে বললেন, তোর বাবা।

লীলা ভয়ে তার মার কোলের কাছটিতে ঘেঁষে বসল।

অভয়কালী তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, তোর গাটা যে বড় গরম মা!

লীলা বললে, রোজ জর হয়, জর আর ছাড়ে না মা।

অভয়াকালীর চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে অশ্রু লীলার সর্বাঙ্গে ঝ'রে পড়তে লাগল। তিনি ফিসফিস ক'রে মেয়েকে বললেন, তুই যা মা। যেখানে ছিলি সেখানে থেকে আমায় চিঠি লিখিস, আমি তোকে টাকা পাঠিয়ে দোব।

লীলা আবার বললে, কিন্তু মরবার সময়ে যে তোমাকে দেখতে পাব না মা!

অভয়াকালী আর সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর বুকের মধ্যে এতক্ষণ ধ'রে পুঞ্জে পুঞ্জে যে আবেগ জমা হয়ে উঠছিল, কোন দিক দিয়ে তাকে মুক্তি দিতে না পারায় তাঁর শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। একবার তিনি লীলাকে জড়িয়ে ধ'রে তার মাথায় চুমু খেলেন। লীলা মনে করলে, এবার বোধ হয় মার মনে দয়া হয়েছে। কিন্তু তখনই তিনি কাঁপতে কাঁপতে মূর্ছিত হয়ে মেঝের ওপরে প'ড়ে গেলেন।

লীলা অনেকক্ষণ অন্ধকারে চুপ ক'রে ব'সে থেকে একবার ডাকলে, !

মূর্ছিতা মাতার কানে মেয়ের সে আকুল আহ্বান পৌঁছল না। লীলা তাঁকে নাড়া দিয়ে আবার ডাকলে, মা!

এবারও কোন সাড়া নেই।

বাইরে পার্বতীচরণ হাঁক দিলেন, গিন্নী কোথায় গেল গো, এদের যে মিষ্টিমুখ করাতে হবে!

লীলা তার মার দেহখানা আঁকড়ে ধ'রে চুপ ক'রে ব'সে রইল। কিছুক্ষণ সেই ভাবে ব'সে থেকে লীলা আবার ডাক দিলে, মা!

এবারেও কোন সাড়া নেই।

লীলা মূর্ছিতা মায়ের পায়ে মাথাটা একবার লুটিয়ে দিয়ে উঠে হাতড়ে হাতড়ে এসে দরজাটা খুলে ফেললে। তারপর ঠাকুরঘর থেকে :বরিয়ে এসে রাত্রির অন্ধকারের অন্তরালে মিলিয়ে গেল।

মতিলাল

পাঠক! একবার মনশ্চক্ষু উন্মীলন করুন। কল্পনানেত্রে দেখুন আজিকার এই প্রাসাদ-কণ্টকিত কলকাতা শহরের বুকে প্রায় সদর-রাস্তার ওপরেই একখানা খোলা মাঠ। মাঠখানা রাস্তা থেকে দেখা যায় না। চারপাশে গোটাকয়েক বড় বড় বাড়ি তাকে যেন ধনীদের শ্যেনচক্ষুর দৃষ্টি থেকে আগলে রেখেছে। রাস্তা থেকে বোঝাই যায় না যে, এখানে এত বড় একটা মাঠ একেবারে মাঠে মারা যাচ্ছে। মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে চারপাশে চাইলে মনে হবে, বড় বড় বাড়ির মাঠমুখো জানলাগুলো যেন অবাক হয়ে এই খোলা জায়গাটুকুর শ্যামল সৌভাগ্যের দিকে চেয়ে আছে।

এই ময়দানটি ছিল আমাদের ছেলেবেলার লীলাভূমি। আমরা প্রায় গুটি-কুড়িক ছেলে প্রতিদিন এখানে খেলতে আসতুম—শহরের নানা দিক থেকে।

মাঠের এক দিকে প্রকাণ্ড প্রাসাদের মতন একখানা বাড়ি। এ বাড়ির একটি ছেলে ছিল আমাদের বন্ধু। তাদেরই ছিল এই মাঠ একদিন বিকেলে, আমরা তখন খেলায় উন্মত্ত, এমন সময় বাড়ির মধ্যে কান্নার রোল উঠল। আমরা খেলা ফেলে ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকলুম। বন্ধু বললে, দেনার দায়ে তাদের সমস্ত সম্পত্তি আটকা পড়েছে। তার পরে প্রতিদিন পাওনাদারেরা এসে ঝাড়, লণ্ঠন, খাট, পালং বের ক'রে নিয়ে যেতে লাগল। সবার শেষে একদিন তারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেল পশ্চিমের কোন এক শহরে। কিন্তু যাক, সে আর এক কথা।

হাইকোর্টে মামলা চলতে লাগল বছরের পর বছর ধ'রে, আর আমরা একদল লক্ষ্মীছাড়া ছেলে সেই বিরাট প্রাসাদ ও তারই সংলগ্ন এই মাঠখানা নিরুপদ্রবে ভোগ করতে লাগলুম।

বিকেলে স্কুলের ছুটির পর মাঠে ফুটবল খেলা শুরু হ'ত। আমাদের মধ্যে দুটি দল ছিল। একদল ছিল খেলোয়াড়, আর একদল ছিল গাইয়ে-বাজিয়ে। গাইয়ে-বাজিয়ের দল খেলার সময় এক দিককার গোল-পোস্টের কাছে ব'সে থাকত। খেলা শেষ হয়ে গেলে তাদের মধ্যে একজন বলটিকে কোলে নিয়ে বাজাতে বসত আর গান শুরু হ'ত। খেলোয়াড়ের দল তখন গাইয়ে-বাজিয়েদের ঘিরে গোল হয়ে বসত। দু দলই ছিল দু দলের গুণের কদরদান আর দু দলের মধ্যে যোগসূত্র ছিল পাঁচ নম্বরের একটি ফুটবল, যেটি ছিঁড়ে গেলে কিংবা যার ভেতরকার হাওয়া ক'মে গেলে দু দলেরই ফূর্তি হ'ত একদম মাটি।

মতিলাল ছিল শেষের দলের অর্থাৎ গাইয়ে-বাজিয়ে দলের লোক। কিন্তু মাঠের সভার রীতিমত সভ্য হয়েও আমাদের ধরন-ধারণের সঙ্গে তার চাল-চলনের ঠিক মিল ছিল না। তার কথাবার্তা, হালচাল সব কিছুর মধ্যেই পাকা সংসারীর একটা ছাপ ফুটে উঠত। সে ছিল, যাকে সোজা কথায় বলে, কাজের লোক। আমরা ছিলুম লেখাপড়ায় একেবারে সেরা ছেলে। প্রত্যেক পরীক্ষায় কে কত নীচে থাকতে পারে, আমাদের মধ্যে প্রতি বৎসর তারই প্রতিযোগিতা চলত। ছুটি জিনিসটাকে বরাবর আমরা ছুটি ব'লেই মান্য করতুম। কিন্তু মতিলাল ছিল ঠিক তার উল্টো। লেখাপড়ায় সে ভাল ছেলে না হ'লেও ভাল হবার চেষ্টা সে করত। একমাত্র সরস্বতীপুজোর দিন ছাড়া বছরের প্রতিদিন নিয়ম ক'রে রুটিন-মত সে পড়াশোনা করত। ইংরেজী শেখবার প্রতি তার ছিল অসাধারণ ঝোঁক। তার বাবা ও ঠাকুরদাদা দুজনেই

ছিলেন ডেপুটি। সে বলত যে, তার জন্যেও হাকিমের চেয়ার খালি প'ড়ে রয়েছে, বি. এ. পাস ক'রে এখন গুটিগুটি সেখানে গিয়ে বসতে পারলে হয়।

মতিলাল মাঠে আসত একেবারে সন্ধ্যে ঘেঁষে। স্কুলের ছুটিং প্রত্যহ সে গড়ের মাঠের দিকে যেত। প্রতিদিন নিয়ম ক'রে এই বায়ুসেবন করতে যাবার স্পৃহা যে বায়ুরোগেরই একটি বিশেষ লক্ষণ, এ কথা উল্লেখ করলে মতিলাল বলত, গড়ের মাঠের দিকে কি হাওয়া খেতে যাই রে! ওদিকে মেম-সাহেবদের পেছু পেছু ঘুরলে অনেক ভাল ভাল Idioms and Phrases শিখতে পারা যায়।

সাহেব-মেমেরা যে কি অযাচিতভাবে মুক্তকণ্ঠে Idioms Phrases ছড়াতে ছড়াতে পথে বিচরণ করে, মধ্যে মধ্যে মতিলালের মুখে তারই দু-একটা উদাহরণ শুনে আমাদের মনে হ'ত, ইংরেজী ভাষাটা আমাদের আর শেখা হ'ল না। কারণ তা শিখতে যা অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তা একমাত্র মতিলালেরই আছে এবং তার জন্যে অনুপ্রেরণা আসছে ভবিষ্যতের সেই হাকিমী-পদ থেকে, যে অনুপ্রেরণা আমাদের মধ্যে কারুরই ছিল না।

মতিলালের দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে। কিন্তু পিতা ও পিতামহের সঙ্গে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের জেলায় জেলায় ছেলেবেলা থেকে ঘুরে তার পূর্বত্বটুকু সম্পূর্ণরূপে খ'সে গিয়েছিল। কথাবার্তা বলত সে পরিষ্কার, আর তার কণ্ঠটি ছিল মন-মাতানো। তা ছাড়া গানের সংগ্রহও ছিল তার বিস্তর। সেসব গান তখনও কারুর মুখে শুনতে পেতুম না, এখনও পাই না।

পাঠক, দৃষ্টি আর একটু প্রসারিত করুন। মাঠের আর এক কোণে কতকগুলো ভাঙা ঘর। এক সময়ে বোধ হয় সেখানে গোয়াল ছিল।

এখানটায় রীতিমত জঙ্গল। মানুষ-ভর উঁচু উঁচু বুনো কচুগাছ হঠাৎ-বড়লোকের মত অত্যন্ত কদর্যভাবে নিজেদের সমারোহ জাহির করতে ব্যস্ত। এদের মাঝে পাঁচ-ছটা উঁচু নারকোলগাছ মাথার ওপরে চিরশ্যাম ডালি নিয়ে দিনরাত তাদের ঝর্ঝর রাগিণীতে বোধ হয় সেই বাড়িরই পুরনো গাথা গেয়ে যেত।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যের পরে এই জঙ্গলটার ঠিক পেছন দিকে চাঁদ উঁকি দিত। জঙ্গলের পরেই ছিল একখানা বাড়ি। এই বাড়ির একটা আলসে-বিহীন খোলা ছাত মাঠের দিকে বার করা ছিল। যেন দেওয়ালের কঠোর আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বাড়িরই খানিকটা মাঠের দিকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

নারকোলগাছগুলোর পেছন থেকে চাঁদ উঁকি দেওয়ার কিছু পরেই সেই খোলা ছাতে এসে দাঁড়াত একখানি চাঁদমুখ। এরা ছিল যেন দুই সখী। চাঁদের সাড়া পেলে চাঁদমুখ আর কিছুতেই ঘরে থাকতে পারত না।

সে ছিল তরুণী। উজ্জ্বল গৌর ছিল তার দেহের বর্ণ। কিছুক্ষণ চাঁদের দিকে চেয়ে থেকে সে আকুলভাবে মাঠের দিক চাইত। মাঠের মধ্যে কি যে ছিল তার ধ্যানের বস্তু, কে যে তার কামনার ধন, তা আমরা কেউ জানতুম না। জানবার চেষ্টাও কোন দিন করি নি। অনেকক্ষণ সেই ভাবে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে আবার সে ঘরে ফিরে যেত।

যেদিন এই ব্যাপার হ'ত, সেদিন আর আমাদের গান মোটেই জমত না। তরুণী ছাতের ধারে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নির্মলের হাতে ফুটবলের ওপর তবলার বোল তার অজ্ঞাতেই থেমে যেত। মতিলালের কণ্ঠ ধীরে ধীরে কখন যে বাতাসে মিলিয়ে যেত, তা আমরা

বুঝতেই পারতুম না। আমরা অনিমেষ নয়নে সেই তরুণীর দিকে চেয়ে থাকতুম। তারপরে ধীরে ধীরে যখন তার মূর্তি ছাতের এক কোণে মিলিয়ে যেত, তখন আমাদের মনের পটে ফুটে উঠত এক-একটি ভাবমূর্তি, আর উঠত ছোট্ট সেই সভাতলে দীর্ঘশ্বাসের ঝড়। এর পরে কথা কি গান কিছুই জমবে না বুঝেই আমরা যে যার বাড়ির দিকে রওনা হতুম।

কৈশোরের কল্পনা-সাগরে আমাদের জীবন-তরণী যখন এই ভাবে টলমল করছে, তখন চাঁদ এসে ধরলে তার হাল, আর লক্ষ্য হ'ল চাঁদমুখ। চাঁদের সঙ্গে তার সঙ্গিনীর দলও এল। চিত্রা আসতে লাগল তার বিচিত্র রূপ ধ'রে, শ্রবণা এল নৃত্যের তালে দ্যুলোকে ভূলোকে মাদল বাজিয়ে, ভদ্রা তার বিরহের গাথা অশ্রুধারে ঢেলে দিতে লাগল। স্বাতী ও অনুরাধা খেলতে লাগল লুকোচুরি, আর সবার শেষে ফল্গু যেত হৃদয়-দোলায় দোল দিয়ে। এদের পাল্লায় প'ড়ে কোথায় গেল পড়াশোনা আর কোথায় গেল কি! বাইরের সংসারটা হয়ে পড়ল একটা অত্যন্ত অনাবশ্যক ও অবাস্তব জিনিস। নিজের মনের মধ্যে একটা বিরাট কল্পনার রাজ্য তৈরি ক'রে তারই সিংহাসনে মশগুল হয়ে ব'সে রইলুম। আমাদের হালচাল দেখে প্রতিবেশীদের রসনা হয়ে ৺ সংবাদপত্রের চাইতেও তীক্ষ্ণ, আর অভিভাবকদের নির্যাতন করবার শক্তি দেখে জেলের কর্তৃপক্ষও হ'ত লজ্জিত। কিন্তু আমাদের সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আমরাও বলতুম, হে ভগবান, এরা যে কি করছে, তা এরা বুঝতে পারছে না, তুমি এদের মার্জনা ক'রো।

একদিন—সেদিন এই চাঁদ আর ছাতের কোণের সেই চাঁদমুখ অনেকক্ষণ ধ'রে আমাদের মনের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ঝড় তুলে সবেমাত্র অস্ত গিয়েছে। এমন সময় নির্মল বললে যে, একটি মেয়েকে সে

ভালবাসে। মেয়েটির বাড়ি তার মামার বাড়ির পাশেই। মামাদের সঙ্গে তাদের খুব ভাব। সেইখানেই সেই কিশোরীর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। কিন্তু পরিচয় এখন দু পক্ষ থেকেই গভীর প্রেমে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে মিলনের কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ মেয়েটির নাকি কোন্ এক জমিদারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে একেবারে ঠিক হয়ে গিয়েছে।

নির্মলের এই কাহিনীটি যে ডাহা মিথ্যে কথা, তা বুঝতে আমাদের কারুরই বাকি রইল না, কিন্তু কারুর মুখ দিয়েই তার একটি প্রতিবাদ বেরুল না, কারণ ঘটনাটি মিথ্যা হ'লেও সেই ইতিহাসের মধ্যে এমন একটা শাশ্বত সত্য ছিল, যা সমস্ত অসত্যকে ছাপিয়ে একটি অখণ্ড সত্যের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রতিভাত হ'ল।

নির্মলের কাহিনী শেষ হতে না হতে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসগুলো পড়বার আগেই সত্যকুমার তার নিজের জীবনের একটা প্রেম-কাহিনীর বর্ণনা করলে। সত্যর পর বিমল, এমনই ক'রে আবহাওয়াটা এমনই সংক্রামক হয়ে উঠল যে, আমিও কল্পনা থেকে নিজের জীবনের অমনই একটা কাহিনী তৈরি ক'রে ব'লে দিলুম।

সকলেই নিজের নিজের কাহিনী বললে বটে, কিন্তু মতিলাল কেবল দীর্ঘনিশ্বাসই ফেললে, বললে না কিছুই। তাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে আমাদের মনে হ'ল যে, তারও নিশ্চয়ই একটা প্রেম-কাহিনী আছে। শুধু আছে নয়, তার মূলে কিছু সত্য আছে ব'লেই সেটা সে প্রকাশ করতে চায় না। আমরা তাকে চেপে ধরলুম, বলতেই হবে।

মতিলালও কিছুতেই বলবে না। আপত্তি তার যতই দৃঢ় হতে থাকে, আমাদের সন্দেহও ততই ঘনীভূত হয়। শেষকালে অনেক বলা-কওয়ার পর অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সে প্রকাশ করলে যে, তাদের

বাড়ির দোতলার ছাতের গায়েই আর একজনদের ছাত একেবারে লাগানো। এই বাড়িরই একটি মেয়ের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়েছে। তাকে সে ভালবেসেছে, প্রতিদানও পেয়েছে। তাকে সে বিয়ে করবেই, এতে যা হয় হবে।

মতিলালের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু আমরা সকলেই মনে মনে স্বীকার করলুম যে, এর মধ্যে মিথ্যের আমেজ একটুকুও নেই। চাঁদ ও চাঁদমুখ মতিলালের মত ছেলের মনেও প্রভাব বিস্তার করেছে জেনে মনে হতে লাগল, যেন সে আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে। মনে আছে, তার পরদিন থেকে সে গড়ের মাঠে Idioms ও Phrases শিখতে যাওয়া বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি মাঠে আসতে আরম্ভ করলে। আর চাঁদমুখের চর্চা করবার জন্যে গানের পরে আরও আধ ঘণ্টা আড্ডার সময় বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

এই রকম কিছুদিন যায়। দিন কয়েক মতিলালের দেখা নেই। তার বাড়ি কেউ চেনে না, কাজেই খোঁজ পাবারও উপায় নেই। ইতিমধ্যে একদিন সে আমাদের কাছে খুব গোপনে প্রকাশ করেছিল যে, তাদের মিলনের পথে দু-একজন লোক বাধা দেবার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে রেখেছিল যে, তাকে না পেলে সে আত্মহত্যা করবে।

মতিলালের অদর্শনে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছি, এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, তার সাংঘাতিক অসুখ, বুঝি এ যাত্রা আর বাঁচে না।

মতিলালের অসুখের খবরটা যে কেমন ক'রে কোথা দিয়ে এসে পৌছল, তা মনে নেই। খোঁজ পড়ল, তার বাড়ি কোথায়! কিন্তু কেউই তার বাড়ি চেনে না। ঠিক হ'ল, তার স্কুলে গিয়ে বাড়ির

ঠিকানাটা জেনে আসা হবে। সে আবার পড়ত এক অদ্ভুত স্কুলে। স্কুলটির নাম ছিল—সর্বমঙ্গলা ইনষ্টিটিউশন। তার বাবার একজন চেনা লোক সেই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, সেই সুবাদে মতিলালকে সেখানে ভর্তি হতে হয়েছিল। ইস্কুলটি ছিল নির্মলের বাড়ির কাছেই। নির্মল বললে যে, কাল সেখানে গিয়ে সে মতিলালের ঠিকানা জেনে আসবে।

পরদিন নির্মল মতিলালের ঠিকানা জেনে নিয়ে এল। আমরা জন চার-পাঁচ খেলা ফেলে মতিলালের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লুম।

গলির গলি তস্য গলি ঘুরে ঘুরে প্রায় সন্ধ্যের সময় আমরা তার বাড়ি আবিষ্কার করলুম।

হরি! হরি! এই বাড়িতে মতিলাল থাকে! সে একটা খোলার বাড়ি। পঞ্চাশ রকমের লোক হরদম বাড়ির মধ্যে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। যাকেই মতিলালের কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সেই বলে, জানি না। নির্মল নিশ্চয় ভুল ঠিকানা এনেছে সাব্যস্ত ক'রে আমরা ফিরব ফিরব মনে করছি, এমন সময় একটি লোককে ওষুধের শিশি হাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞাসা করা গেল, হ্যাঁ মশায়, মতিলাল থাকে এই বাড়িতে?

সন্ধান পাওয়া গেল। এই বাসাতেই মতিলাল থাকে বটে। লোকটি আমাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। কতকগুলো এঁদো-পচা নর্দমা ও আঁস্তাকুড় পেরিয়ে একটা নীচু ঘরে গিয়ে আমরা ঢুকলুম। ঘরের এক কোণে খাটে একটা স্যাঁতসেঁতে বিছানায় মতিলাল প'ড়ে আছে। খাটের কাছে দু-তিনজন লোক মাটিতে ব'সে গল্প করছে। এক কোণে মাটির পিলসুজের ওপরে প্রদীপ জ্বলছে। আমরা গিয়ে খাটের ওপরে বসতেই মতিলাল অদ্ভুত এক রকম দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলুম, মতিলাল, কেমন আছিস ভাই?

মতিলাল চীৎকার ক'রে উঠল, হামারা সর্বাঙ্গমে বেশ করকে গঙ্গামৃত্তিকা আর তুলসীপাতা বাটকে লেপকে লেপকে দেও, জল যাতা হ্যায়।

মতিলালের মুখে এই রকম হিন্দী কথা শুনে তো আমরা কজনেই হেসে ফেললুম। কিন্তু সে আবার তখুনি চেঁচিয়ে উঠল, কেয়া! হামারা দুর্দশা দেখকে তোম্‌লোক হাসতা হায়? নির্দয় কাঁহাকা—

হাসি মিলিয়ে গিয়ে চোখ অশ্রুতে ভ'রে উঠল। মতিলালের দিকে চেয়ে দেখি, তার চোখে আর সেই অদ্ভুত দৃষ্টি নেই, চাহনি বেশ স্বাভাবিক। অতি ক্ষীণস্বরে একবার সে ব'লে উঠল, Oh, how helpless!

কথাগুলো ব'লেই সে চোখ বুজে ফেললে।

রোগ কিংবা রোগী সম্বন্ধে আমাদের কারুরই কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু তবুও মনে হ'ল যে, মতিলালের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সেখানে যে লোকগুলি ব'সে ছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল, মতিলালের বাড়িতে অসুখের খবর দেওয়া হয়েছে কি?

তারা বললে, না, এখনও জানানো হয় নি, বিকারটা তো আজ দুপুর থেকে শুরু হ'ল কিনা।

তাদের কাছ থেকে মতিলালের বাপের ঠিকানা জেনে নিয়ে তখুনি তাঁকে 'তার' ক'রে দিলুম—'তার' পাওয়া মাত্র চ'লে আসবেন, মতিলালের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলুম যে, মতিলালের এক দূরসম্পর্কের কাকা কলকাতায় থাকেন এবং মতিলাল তাঁরই তত্ত্বাবধানে থাকে।

যা হোক, সেদিন 'তার' ক'রে রাত্রে বাড়ি ফেরা হ'ল। পরদিন বিকেলবেলা গিয়ে দেখি, মতিলালের বাবা এসে পড়েছেন, খুব ধুম ক'রে

চিকিৎসা শুরু হয়ে গেছে। ভদ্রলোক আমাদের দেখে ভারি খুশি হলেন। আমাদের খেলার মাঠের কাছেই একখানা বাড়ি খালি ছিল। সেই বাড়িটা ঠিক ক'রে মতিলালকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তার মা ও অন্য ভাইবোনেরা দু-এক দিনের মধ্যেই এসে পড়লেন। আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যের সময় গিয়ে তাকে দেখে আসতে লাগলুম।

মতিলালের সে যাত্রা পরমায়ু ছিল। দেড় মাস রোগযন্ত্রণা ভোগ ক'রে সে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হতে লাগল। তার বাবা ফিরে গেলেন বিহারের সেই শহরে, কর্মস্থলে। মা ও অন্য ভাইবোনেরা কলকাতাতেই র'য়ে গেলেন। ঠিক হ'ল যে, এবার থেকে তাঁরা কলকাতাতেই থাকবেন। স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটির সময় মতিলালেরা যাবে বাবার কাছে, আর পূজো ও বড়দিনের ছুটির সময় বাবা আসবেন তাদের কাছে।

মতিলাল সেরে উঠে আবার স্কুলে যেতে আরম্ভ করলে। কিছু-দিনের মধ্যেই আড্ডায় নিয়মিত হাজিরাও পড়তে লাগল। কিন্তু ছাতের কোণে সেই চাঁদমুখের উদয় হ'লেই সে আর বসত না, কোনও রকম ছুতো ক'রে পালিয়ে যেত। চাঁদমুখ দেখে স'রে পড়বার কারণটা আমাদের কাছে যতই সে ঘুরিয়ে বলুক না কেন, আমরা ঠিক বুঝতে পারতুম, চন্দ্রবদনের প্রতি তার আকস্মিক এই যে বিতৃষ্ণা, এর মূলে আছে দোতলার ছাতের সেই প্রেম-কাহিনী। আমরা সভায় নিজেদের যে প্রেম-কাহিনীর বর্ণনা করেছিলুম, তার মধ্যে অন্তত বাড়িঘরগুলো ছিল সত্যি, কিন্তু মতিলাল অতখানি গৌরচন্দ্রিকার পর এমন একটি গল্প ছাড়লে যে, তার মধ্যে সত্যের রেশটুকু পর্যন্ত নেই। খোলার বাড়ির দোতলার ছাতের কথা নিয়ে তার অসাক্ষাতে আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে খুব হাসির ধুম প'ড়ে যেত। হয়তো মতিলালের কানে

কোন সূত্রে কিছু পৌঁছেছিল। তাই সে ইদানীং চাঁদের সঙ্গে চাঁদমুখের উদয় দেখলেই পালিয়ে যেত।

কিন্তু একদিন সত্যিই বাঘ এল। মতিলালের বাবা বিহারের যে শহরে তখন হাকিমি করছিলেন, সেই শহরের একজন উকিল ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু। উকিল বন্ধুটির দু-তিন পুরুষ ধ'রে এখানে বাস। তাঁর বাবা ও ঠাকুরদাদা সে অঞ্চলে বেশ বিষয়-আশয়ও ক'রে গিয়েছেন। তাঁদেরই একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়ে মতিলালেরা সেখানে থাকত। বাড়ির পাশে বাড়ি হওয়ায় দুই পরিবারের মধ্যে সদ্ভাবও ছিল খুব। জগবন্ধুবাবুর স্ত্রী কিছুদিন থেকে নানা রকম অসুখে ভুগছিলেন। সেখানকার ডাক্তার-কবিরাজেরা কিছু করতে না পারায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসবার কথা চলছিল। জগবন্ধু মতিলালকে লিখলেন, একটা বাড়ি ভাড়া করবার কথা। বাড়ির জন্যে বেশি কষ্ট পেতে হ'ল না। তাদের বাড়ির পাশেই একখানা বাড়ি খালি ছিল। সেই বাড়িখানা জগবন্ধুবাবুদের জন্যে ঠিক করা হ'ল।

জগবন্ধুবাবুর পরিবার খুব বড় নয়। তাঁর বৃদ্ধা মা পুত্রবধূর সঙ্গে এলেন, আর এল মুমূর্ষু মায়ের সেবার জন্যে কৃষ্ণা একাদশীর অস্তমান চন্দ্রের পাশে শুক্লা চতুর্দশীর পূর্ণশশীর মতন তাঁর একমাত্র বিধবা মেয়ে হিমানী।

জগবন্ধুবাবুর স্ত্রীকে মতিলাল মাসীমা ব'লে ডাকত। যেদিন তাঁরা এসে পৌঁছলেন, সেদিন থেকে মতিলালের আর বিশ্রাম নেই। এই ডাক্তারের বাড়ি ছোটা, এই ডাক্তারখানায় যাওয়া, ঝি-চাকরের ব্যবস্থা করা, বাজার করা, রোগীর সেবা করা, একাই সে একশো হয়ে উঠল।

আমরা তাদের বাড়িতে গেলে মতিলালের মা হিমানীর মার

উদ্দেশ্যে বলতেন, গেল জন্মে মতিলাল বোধ হয় ওরই ছেলে ছিল। ছেলেটা এই সেদিন ব্যারাম থেকে উঠেছে, আবার না পড়লে বাঁচি।

মতিলালের সঙ্গে সঙ্গে হিমানীদের বাড়িতে আমাদের গতিও অবারিত হয়ে উঠল। হিমানীর বাবার অগাধ কাজ। তাই তিনি সব সময়ে রুগ্না স্ত্রীর কাছে থাকতে পারতেন না। দশ-পনরো দিন অন্তর শনিবার দেখে তিনি কলকাতায় আসতেন আর রবিবার সন্ধ্যের সময় ফিরে যেতেন।

মাস কয়েক ধ'রে ডাক্তার, কবিরাজ, অবধূত ক'রে কিছুতেই হিমানীর মার অসুখ সারল না। এতদিন তবুও তিনি উঠতে হাঁটতে পারছিলেন, কোথাকার এক দিগ্‌গজ কবিরাজ এসে দুটি তিনটি গুলির আঘাতে ভদ্রমহিলাকে একেবারে বিছানায় পেড়ে ফেললে।

আবার ডাক্তারি শুরু হ'ল। পঞ্চাশ রকমের ওষুধ, মালিশ—ঘণ্টায় দু-তিন বার ক'রে। তার ওপরে পনরো মিনিট অন্তর জ্বরের তাপ দেখা। খাতায় চৌকো ঘর কেটে তাতে জ্বরের নকশা করা, ইত্যাদি ব্যাপারে কাজ বেড়ে গেল চারগুণ। আমি আর নির্মল এসে হিমানী ও মতিলালকে সাহায্য করতে লাগলুম।

কিন্তু আমাদের সেবা ও ডাক্তারদের চিকিৎসা সমস্ত ব্যর্থ ক'রে দিয়ে হিমানীর মা স্থির মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল।

সেদিন বোধ হয় পূর্ণিমা। সকাল থেকেই রোগিণীর অবস্থা খারাপ। ঠিক হ'ল যে, আমি আর নির্মল রাত্রি একটা অবধি জাগব, তারপরে হিমানী ও মতিলাল বাকি রাতটুকু জাগবে। হিমানীর ঠাকুরমা রাত্রির পর রাত্রি পুত্রবধূর শিয়রে জেগে ব'সে থাকতেন, এতে তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না। তবে তিনি ওষুধপত্র কিছু খাওয়াতে

পারতেন না। পাছে ভুল ক'রে মালিশের ওষুধ খাইয়ে দেন, এইজন্যে আমাদের কারুকে থাকতেই হ'ত।

সে রাত্রি আমি আর নির্মল একটা অবধি জেগে মতিলালকে তুলে দিতে গিয়ে দেখি, বিছানায় সে নেই। আমি আর নির্মল শুতুম ছাতের ওপরে একটা ছোট্ট ঘরে। হাওয়া পাবার জন্যে হয়তো সে আমাদের বিছানায় গিয়ে শুয়েছে মনে ক'রে ছাতে গিয়ে দেখি যে, এক কোণে মতিলাল ও হিমানী দাঁড়িয়ে আছে।

হিমানী কাঁদছিল। তার মা যে আর বেশি দিন নেই, এই কথা বোধ হয় সে বুঝতে পেরেছিল। দেখলুম, সে ঘাড় হেঁট ক'রে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদছে আর মতিলাল গুনগুন ক'রে কি ব'লে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

আমরা সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি, তা তাদের দুজনের একজনও টের পায় নি। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটবার পর হিমানী সেই অশ্রুসিক্ত আঁচলখানা গলায় জড়িয়ে হাঁটু গেড়ে মতিলালকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল, আর মতিলাল হিমানীর মুখখানা তুলে ধ'রে তার অধরোষ্ঠে গভীর চুম্বনের দাগ এঁকে দিলে।

চাঁদের আলোতে মতিলালের মুখখানা ঝকঝক করছিল। তারই দেহের ছায়া হিমানীর মুখের ওপর পড়ায় তার মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। অবর্ণনীয় সেই আলো ও আবছায়ার খেলা। দক্ষালয়ে যাবার আগে সতী যখন মহাদেবের পায়ে মাথা ঠেকিয়েছিলেন, অভিমান-অপগত প্রিয়তমার প্রসন্ন মুখ দেখে ভোলানাথ বোধ হয় এমনই বিহ্বল হয়েছিলেন। মৃত্যু যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সংহারের দেবতা মহেশ্বর সেদিন নিজেই তা দেখতে পান নি।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে মতিলাল আমাদের দেখতে পেয়ে হিমানীকে

কি বললে। তারপরে আমাদের সঙ্গে কোন কথা না ব'লেই তারা দুড়দুড় ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

পরদিন সকালবেলায় হিমানীর মা অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। সমস্ত দিন তাঁর আর জ্ঞান ফিরে এল না। সন্ধ্যেবেলা আমি ও নির্মল একবার বাড়ি ঘুরে এসে তাদের বাড়িতেই শুয়ে রইলুম। সেদিন আর কারুর ব্যস্ততা বা রাত জাগবার পালা নেই। রোগিণী সকলকেই অবসর দিয়েছেন। সকলেই শেষ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছে।

অনেক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে যাওয়ায় রোগীর ঘরের জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। ঘরের এক কোণে একটি বাতি জ্বলছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ, নিঝুম। সেই নিষ্ঠুর নিস্তব্ধতার মধ্যে রোগিণীর অন্তিম নিশ্বাস, জীবনগাথার শেষ রাগিণী তালে তালে ধ্বনিয়ে উঠছে।

জানলায় মুখ দিয়ে ভেতরে দেখলুম, মুমূর্ষুর শিয়রে ব'সে আছেন হিমানীর বৃদ্ধা পিতামহী, আর তাঁর দু পায়ের দু ধারে ব'সে হিমানী ও মতিলাল।

সেই দৃশ্য মনে পড়লে আজও আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার মনে হতে লাগল, যেন রোগিণীর মাথার কাছে রুদ্রভৈরব তার গৈরিক নিশান নিয়ে এসে াড়িয়েছে, আর পায়ের কাছে মন্মথ তার মকরকেতন ওড়াচ্ছে। ংহার ও সৃষ্টির দুই দেবতায় মিলে উৎসব ক'রে সেই পুণ্যবতীকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আস্তে আস্তে সেখান থেকে স'রে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে হিমানীর মা মারা গেলেন। দিন দুয়েক পরে তার বাবা এসে তাদের নিয়ে চ'লে গেলেন।

সেবার ছিল আমাদের প্রবেশিকা পরীক্ষা। দিন কয়েক বই নিয়ে বসা গেল। পরীক্ষার পর মতিলালেরা কলকাতার বাসা তুলে দিয়ে তার বাবার কর্মস্থলে চ'লে গেল।

মাস কয়েক মতিলালের আর কোন খবর পাই নি। পরীক্ষায় পাস ক'রে আমরা কলেজে ঢুকলুম। মতিলালও পাস করলে, কিন্তু সে আর কলকাতায় ফিরে এল না। সেবার পূজোর ছুটির মধ্যে একদিন মতিলালের ছোট ভাই যতিলাল আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। যতিলাল বললে, মা তোমায় একবার ডেকেছেন, আজই যাবে।

খবর নিয়ে জানলুম যে, তারা কলকাতায় মাসখানেকের জন্যে একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে আছে। এখানে এসেই আমাকে খবর দিয়েছে।

মাঠের আড্ডা তখনও পুরোদমে চলেছে। সেদিন আর মাঠে না গিয়ে মতিলালদের ঠিকানায় গিয়ে হাজির হওয়া গেল। মতিলালের মা তো আমায় দেখেই কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। তাঁর চোখে জল দেখে আমি চমকে উঠলুম, তবে কি মতিলাল নেই! তবুও জিজ্ঞাসা করলুম, মতিলাল কোথায়?

মা বললেন, আজ দু মাস হ'ল সে কোথায় চ'লে গিয়েছে, সেই থেকে তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

কথাটা শুনে একেবারে দ'মে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়েছিল নাকি?

তিনি বললেন, ঝগড়া হয় নি। সেই হিমানী ছুঁড়ীকে তোমার মনে আছে? তাকে নিয়ে সে পালিয়েছে। তারা নিশ্চয় কলকাতাতেই কোনও জায়গায় আছে। তোমরা তাকে খুঁজে বের কর বাবা। আমার ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে এস, তা না হ'লে আমি বাঁচব না।

মতিলালের মার কাছ থেকে যতখানি সংবাদ সংগ্রহ করা গেল,

তার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, হিমানীর মার মৃত্যুর বোধ হয় মাস দুয়েক পরেই তার বাবা আর একটি তরুণীর পাণিপীড়ন করেছেন। ইতিমধ্যে হিমানীর সঙ্গে কলকাতায় মতিলালের পত্র-ব্যবহার চলছিল। পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে যাবার কিছুদিন পরেই একদিন সকালবেলা দেখা গেল যে, মতিলাল ও হিমানী দুজনেই অন্তর্ধান করেছে।

তখুনি মাঠে গিয়ে সংবাদটা প্রচার করা গেল। তখন ফুটবল খেলা শেষ হয়ে গানের আসর বসেছে। মতিলালের কথা শুনে মাঠসুদ্ধ ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, জয়, মতিলালের জয়।

ঠিক হ'ল, পরদিন থেকে তার খোঁজ শুরু হবে।

দিন দশেক পাতিপাতি ক'রে খুঁজে মতিলালকে ঠিক ধ'রে ফেলা গেল। বেলেঘাটা অঞ্চলে একটা খোলার ঘর নিয়ে সে আর হিমানী বাস করছিল। হিমানীকে আমরা মতিলালের মতন নাম ধ'রেই ডাকতুম, কিন্তু এবার দেখার পরেই আমরা তাকে বউদি ব'লে ডাকতে আরম্ভ করলুম। আমার মুখে বউদি ডাক শুনে প্রথমে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সে সঙ্কোচ কাটিয়ে হিমানী এমন ব্যবহার করতে লাগল, যেন এই ডাকেই সে চিরদিন অভ্যস্ত।

পরামর্শ শুরু হয়ে গেল। অবিশ্যি আমাদের এই পরামর্শ-সভায় হিমানীও এসে বসল। প্রথমেই উঠল গ্রাসাচ্ছাদনের কথা। হিমানী ও মতিলালের কাছে যা ছিল, তা রেল ও গাড়িভাড়া, তার ওপরে নতুন সংসার পাতা, দু মাসের দু টাকা ক'রে ঘরভাড়া আর খাওয়ায় প্রায় সব নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। হিমানী হিসেব ক'রে বললে, মাসে দশটা টাকা হ'লে তাদের খাওয়া ও বাড়িভাড়া চ'লে যেতে পারে। আমি আর নির্মল দুজনে এই দশ টাকার ভার নিলুম। কারণ মতিলাল

বললে যে, বাড়িতে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। হিমানীকে ফেলে সে কি ক'রে বাড়ি যাবে ?

মনে হ'ল, সত্যিই তো। হিমানীকে ফেলে মতিলাল কি ক'রে বাড়ি যেতে পারে ?

কয়েকদিন পরে মতিলালের মার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। ছেলেকে দেখবার আশায় তিনি দিন গুনছিলেন। তাঁকে বললুম, আজ কলেজ থেকে বাড়ি ফেরবার সময় পথে মতিলালের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল।

মতিলালের মা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি বললেন, তাকে ধ'রে নিয়ে আসতে পারলি নি ?

বললুম, সে চেষ্টা অনেক করেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই সে এল না।

কি বললে সে ?

সে বললে, হিমানীকে ফেলে কি ক'রে আমি বাড়ি যাব ? আমার সঙ্গে যদি তাকেও তাঁরা স্থান দেন, তা হ'লে যেতে পারি।

আমার কথা শুনে তাঁর চোখ দুটো জলে ভ'রে উঠল। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন, তা কি ক'রে হবে বাবা? তোমরা তো লেখাপড়া শিখেছ, বুদ্ধিবিবেচনাও আছে। গেরস্তর সংসারে হিমানীকে কি ক'রে ঠাঁই দিই ?

মতিলালের মার পরে আরও অনেকের মার মুখেই এ রকম কথা শুনেছি বটে, কিন্তু কেন যে গেরস্তর সংসারে তাদের স্থান হতে পারে না, তা তখনও বুঝতে পারি নি, আজও বুঝতে পারি না।

তাঁর কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হতভাগা কোথায় আছে ?

বললুম, অনেক চেষ্টা ক'রেও তার ঠিকানাটা বার করতে পারলুম না। সে বললে, কলেজে গিয়ে এক সময় তোর সঙ্গে দেখা করব।

সেই ছুঁড়ীটা সঙ্গে আছে তো?

কথাটা শুনে ভারি হাসি পেল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ, আছে।

একবার তাকে কোন রকমে আমার কাছে ধ'রে নিয়ে আসতে পারিস?

চেষ্টা ক'রে দেখব।—ব'লে সেদিন তাঁর কাছে বিদায় নেওয়া গেল।

পরদিন বেলেঘাটার সেই প্রাসাদে আবার আমাদের পরামর্শ-সভা বসল। হিমানীকে ফেলে মতিলালের একলা বাড়িতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। অনিশ্চিত অদৃষ্ট-সাগরে তারই মুখ চেয়ে যে ভেলা ভাসিয়েছে, তাকে ফেলে কেমন ক'রে সে ঘরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ফিরে যাবে?

একদিন মতিলালের মাকে ব'লে ফেলা গেল, আচ্ছা, হিমানীকে স্থান দিতে আপনাদের আপত্তি কি?

কথাটা শুনে তিনি অদ্ভুত এক রকমের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সে দৃষ্টির অর্থ, ও, তোমরাও বুঝি ওই দলের?

কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, হিমানী কি সম্পর্কে আমাদের এখানে থাকবে? সে যদি মতিলালের সঙ্গে না গিয়ে অন্য কারুর সঙ্গে যেত, তা হ'লেও নয় কথা ছিল। আমার এখনও একটি ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় নি—

আবার কিছুক্ষণ পরে একটু শ্লেষের সঙ্গে বললেন, হিমানীর নিজের বাড়িতেই কি তার আর স্থান হবে? তোমরা তো তার শুভার্থী, একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা এই কথা শুনে হিমানী বললে, আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিলেও আমি যাব না।

মতিলাল বললে, তোরা আর মার কাছে যাস নি।

আমরা মতিলালের মার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ ক'রে দিলুম। পূজোর পরে কলেজ খুললে একদিন খোঁজ নিয়ে জানতে পরলুম যে, তাঁরা কলকাতা থেকে চ'লে গিয়েছেন।

মতিলাল দিব্যি সংসার করতে লাগল। সে সমস্ত দিন চাকরির সন্ধানে ঘোরে। সন্ধ্যের সময় মাঠে এসে জোটে। সন্ধ্যের পরে আমি আর নির্মল তার সঙ্গে বেলেঘাটার সেই প্রাসাদে গিয়ে ঘণ্টাখানেক গল্পগুজব ক'রে ফিরে আসি।

এমনই কিছুদিন যায়। মতিলাল ইতিমধ্যে একটি ছেলে-পড়ানোর কাজ জুটিয়েছিল। মাস দুয়েক পরে সে কাজটা আবার চ'লে গেল। পাঁচ টাকা ক'রে দু মাসের মাইনেতে তাদের জোড়া দুয়েক কাপড় হ'ল, তা ছাড়া আমাকে ও নির্মলকে একদিন হিমানী নেমন্তন্ন ক'রে মাংস রেঁধে খাওয়ালে।

বছরখানেক এই ভাবে কাটবার পর একদিন বিকেলে মতিলাল বললে, ওহে, বেড়ে একটা মতলব ঠাওরানো গিয়েছে।

মতিলালেরা যে জায়গাটায় থাকত, তার চারিদিকে ছিল ব্যবসাদার-আড়তদারদের বাস। এদের কারও কারও সঙ্গে তার খাতিরও জমেছিল। মধ্যে মধ্যে দু-একজনের খাতা লিখে, ইংরেজীতে চিঠি লিখে সে টাকাটা সিকিটা উপায়ও করত। মতলব ঠাওরানোর কথা শুনে আমরা মনে করলুম, তার মাথায় বুঝি কোন ব্যবসা-বুদ্ধি চেপেছে। সে বললে, দেখ, আমার অভাবে মা-বাবা ভাই-বোন সবাই কষ্ট পাচ্ছে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু একটি কাজ করলে তাঁরা হিমানীকে সুদ্ধ বাড়িতে স্থান দিতে কোন আপত্তি করবেন না। হিমানীরা আমাদের স্বজাত। আমি মতলব করেছি, তাকে বিয়ে ক'রে

একদিন হুম ক'রে দুজনে বাড়িতে গিয়ে হাজির হব। ছেলের বউকে তো আর বাপ-মা ফেলে দিতে পারবে না।

ঠিক মনে হ'ল, চাঁদমুখের প্রভাব মতিলালের সাংসারিক বুদ্ধিকে এখনও ম্লান করতে পারে নি। আমরা তাকে উৎসাহ দিলুম, লাগিয়ে দাও বিয়ে, আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।

আমাদের উৎসাহে হিমানী মতিলাল দুজনেরই উৎসাহ গেল বেড়ে। অনেকদিন পরে আবার একটা নতুন উত্তেজনা পেয়ে আমরা মেতে উঠলুম। মতিলাল কোথা থেকে পুরোহিত যোগাড় ক'রে আনলে। বরকর্তা ও কন্যাকর্তার শূন্য আসন শাস্ত্রের মন্ত্রে পূর্ণ হয়ে উঠল। টাকাকড়িরও বিশেষ অভাব হ'ল না। নির্মলের ছিল সোনার হাতঘড়ি, আর আমার ছিল সোনার বোতাম ও আংটি। তা ছাড়া দু-চারখানা বই ও হুকারের দোকানে চ'লে গেল।

শুভদিনক্ষণে হিমানীর সঙ্গে মতিলালের বিয়ে হয়ে গেল। মতিলাল তার বাবাকে চিঠি লিখলে, হিমানী এখন আমার স্ত্রী, আপনার পুত্রবধূ। তাকে গৃহে স্থান দিতে, আশা করি, আপনাদের কোন আপত্তি হবে না। আমরা শিগগিরই বাড়ি যাব।

দিন পনরো চ'লে গেল, কিন্তু মতিলালের চিঠির কোন জবাব এল না। চিঠির জবাব না আসাতে মতিলাল ও হিমানী দুজনেই মুষড়ে পড়তে লাগল। সেই কঠোর দারিদ্র্য বোধ হয় আর তাদের সহ্য হচ্ছিল না।

আরও দিন পনরো কেটে যাবার পরও যখন তার বাবার কাছ থেকে কোন উত্তর এল না, তখন একদিন মতিলাল বললে, না-ই আসুক জবাব, চল, বেরিয়ে তো পড়া যাক, তারপরে যা হবার তাই হবে।

আমরাও রাজি। বেনারস কলেজের সঙ্গে ফুটবলের ম্যাচ আছে

ব'লে বাড়ি থেকে তিন দিনের ছুটি নিয়ে একদিন রাত্রি সাড়ে নটার গাড়িতে মতিলাল ও হিমানীকে নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়া গেল।

যখন ট্রেন থেকে স্টেশনে নামলুম, তখন রাত্রি শেষ হতে বোধ হয় ঘণ্টাখানেক দেরি। ভোর হওয়ার পর একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রে মতিলালদের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করা গেল। শহর স্টেশন থেকে মাইল চার-পাঁচ দূরে। ঢিকোতে ঢিকোতে প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে গাড়ি গিয়ে তাদের বাড়ির কাছে পৌছল। বাড়ির দরজায় মতিলালের একটি বোন দাঁড়িয়ে ছিল। সে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে ছুটে বাড়ির ভেতরে চ'লে গেল।

হিমানীকে নিয়েই ভেতরে যাওয়া হবে কি না তারই পরামর্শ চলছে, এমন সময় বাড়ির মধ্যে মতিলালের বাবার চীৎকার শুনতে পাওয়া গেল। আমরা স্থির করলুম, আপাতত হিমানী গাড়িতেই ব'সে থাক্। ঝড়ের প্রথম ঝাপটাটা কেটে যাবার পর তাকে নিয়ে যাওয়া যাবে।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়া গেল। আগে নির্মল, তারপরে আমি, তারপরে মতিলাল। কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হতে হ'ল না। মতিলালের বাবা হনহন ক'রে বাইরের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। তাঁর পেছনে তার ভাইবোনের দল উৎসাহের আবেগে চঞ্চল হয়ে ছুটে আসছে, এই অবস্থায় দুই শোভাযাত্রায় সজ্ঘর্ষ বাধল। মতিলালের বাবা বললেন, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে, অমন ছেলের মুখদর্শন করতে চাই না।

ভদ্রলোককে আমরা বোঝাতে লাগলুম, কিন্তু তিনি সেসব কথা কানে না তুলে আমাদেরও গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁর এক কথা। হিমানীকে ছেড়ে চ'লে এস, আমি মেয়ে ঠিক করেছি, তাকে বিয়ে কর, তবেই এ বাড়িতে তোমার স্থান হবে।

মতিলাল এক ধারে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইল। পিতার সহস্র কর্কশ কথার একটি জবাবও সে দিলে না। ভাইবোনেরা একে একে তাদের বাবার পেছন থেকে এগিয়ে এসে তাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াল। সব-ছোটটি মতিলালের একটা আঙুল ধ'রে নাড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে।

ঘণ্টাখানেক ধ'রে অবিশ্রান্ত গালাগালি শোনার পর মতিলাল ধরা গলায় আমাদের বললে, চল, যাই।

আমরা ফিরলুম। তার বাবা চীৎকার ক'রে উঠলেন, দাঁড়াও, ওকে না ত্যাগ করলে আমার বিষয়ের একটি পয়সাও তোমাকে দোব না, মনে থাকে যেন।

কথাটা শুনে মতিলালের ম্লান মুখে একটুখানি হাসি ফুটে উঠল। অপূর্ব সে হাসি! তাঁর কথার কোন উত্তর না দিয়ে সে আমাদের বললে, চল, যাই, হিমানী অনেকক্ষণ একলা ব'সে আছে।

আমরা ধীরে ধীরে বাইরে এসে একে একে গাড়িতে উঠে বসলুম। মতিলালের ভাইবোনেরা বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল, তাদের সবার চক্ষুই অশ্রুভারাক্রান্ত। কারও মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে দড়াম ক'রে ওপরকার একটা জানলা খুলে গেল। জানলায় বোধ হয় মতিলালের মা এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু আমরা কেউ আর গাড়ি থেকে মুখ বাড়ালুম না।

কয়েক মুহূর্ত বাদে হিমানী ব'লে উঠল, ঠাকুরপো, ওই যে দেখছ বাড়িটা—যেটার দরজায় তালা লাগানো, ওইটে আমাদের বাড়ি।

তারপরেই মতিলালের দিকে ফিরে সে হাসতে হাসতে বললে, তাড়িয়ে দিলেন তো? তুমিও যেমন! কোন বাপ-মা কখনও এ রকম ছেলেকে ঘরে নিতে পারে? কি বল ভাই খুশি-ঠাকুরপো?

নির্মল খুব হাসত ব'লে হিমানী তাকে খুশি-ঠাকুরপো ব'লে ডাকত।

নির্মল বললে, আমি যদি বাপ হতুম, তা হ'লে নিশ্চয় পারতুম।

হিমানী আবার মতিলালের দিকে ফিরে বললে, দেখ, তুমি ও রকম মুখ ক'রে থাকলে আমার ভারি খারাপ লাগে। আমি কিন্তু এক্ষুনি কেঁদে ফেলব, তখন তোমরা তিনজনে মিলে আমাকে থামাতে পারবে না।

হিমানীর দুই চোখ অশ্রুতে ভ'রে উঠল। মতিলাল গাড়ি থেকে এবার মুখ বাড়িয়ে গাড়োয়ানকে বললে, এই, স্টেশনে চল।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করতেই মতিলাল হিমানীকে বললে, আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে ব'লে আমাদের কোন দুঃখ হয় নি। আমরা সমস্ত দুঃখকে তো বরণ ক'রেই নিয়েছি হিমানী।

হিমানীর চোখের জল এক নিমিষে অপসৃত হয়ে গেল। সে তার চোখ দুটোকে বড় বড় ক'রে বললে, তবে তুমি অমন মুখ ক'রে রয়েছ কেন?

মতিলাল বললে, আমার দুঃখ এই যে, আমাদের জন্যে বন্ধুরা মিছিমিছি বাবার কাছে কতকগুলো গালাগালি খেলে।

মতিলালের বাবার গালাগালিতে আমাদের মনের মধ্যে যতটুকু গ্লানি জমা হয়ে উঠেছিল, হিমানীর হাসির আঘাতে স্টেশনে পৌছবার আগেই তা উড়ে গেল। যেমন হাসতে হাসতে আমরা বেরিয়েছিলুম, পরদিন সকালে আবার তেমনই হাসতে হাসতে আমরা তাদের বেলেঘাটার সেই খোলার বাড়ির দরজায় গাড়ি থেকে নামলুম।

এই ব্যাপারের দিন দশ-বারো পরে একদিন বিকেলে মতিলালের বাড়িতে গিয়ে দেখি, নির্মল মুখখানি চুন ক'রে একখানা জলচৌকির

ওপরে ব'সে আছে। এক কোণে হিমানী দাঁড়িয়ে, তার মুখে হাসির রেখা তখনও মিলিয়ে যায় নি, আর মতিলাল গম্ভীর হয়ে খাটের ওপরে ব'সে।

ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারলুম, একটা কিছু হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি ?

নির্মল হিমানীর দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, জিজ্ঞাসা কর ওঁদের।

হিমানীকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে বউদি ?

হিমানী বললে, কি আবার হবে !

নির্মল ঝেড়ে-ফুঁড়ে ঠিক হয়ে বসতে বসতে বললে, আমরা এখানে আসি, ওঁদের সেটা ইচ্ছে নয়।

হিমানী ব'লে উঠল, দেখ খুশি-ঠাকুরপো, যা-তা ব'লো না বলছি, তা হ'লে এই পাখা-পেটা খাবে। আমি তাই বলেছি ?

নির্মল গম্ভীরভাবে বললে, তা না তো কি ? যা বলেছ, তার সরল অর্থ ওই।

হিমানী এবার আমার দিকে চেয়ে বললে, আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমিই বল—

আমি বললুম, ব্যাপারটা কি হয়েছে, খুলেই বল না ছাই ?

মতিলাল এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। এবার সে বললে, আচ্ছা, আমিই বলছি।

মতিলালের কথা শুনে নির্মল মুখ তুলে তার দিকে চাইলে। কিন্তু তার চোখ দুটো অশ্রুভারে তখনি নুয়ে পড়ল। সে অন্য দিকে মুখখানা ফিরিয়ে নিলে।

মতিলাল বললে, আমি আর হিমানী স্থির করেছি যে, তোমাদের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য নোব না।

এই অবধি ব'লে মতিলাল চুপ করলে। আমাদের কারুর মুখ দিয়েই আর কোন কথা বেরুল না, মতিলালও চুপ ক'রে রইল। হেমন্তের সন্ধ্যা তার অন্ধকারের সঙ্গে রাশি রাশি ধোঁয়া নিয়ে ছোট্ট সেই খোলার ঘরখানার ভেতরে এসে জমা হতে লাগল। তারই মধ্যে ব'সে ব'সে আমার মনে হতে লাগল, একদিন প্রখর দিবালোকে আমরা যে এই চারিটি বন্ধু পরস্পরের কাছাকাছি হয়েছিলুম, এই অন্ধকারের মধ্যে বুঝি সেই বন্ধনের গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গেল। অনেকক্ষণ এই ভাবে কেটে যাবার পর নির্মল ব'লে উঠল, বাতিটা জ্বাল বউদি।

হিমানী বললে, এই যে জ্বালি।

হিমানীর কণ্ঠস্বর ভারী। বেশ বুঝতে পারা গেল, অন্ধকারে সে কাঁদছিল।

বাতিটা জ্বালবার পর মতিলাল বললে, এর জন্যে তোমরা দুঃখ ক'রো না বন্ধু। আমি হিমানীর জন্যে ও হিমানী আমার জন্যে কতখানি ত্যাগ করেছে, আর একে অন্যের জন্যে কতখানি সহ্য করতে পারে, তা অভাবে না পড়লে তো বুঝতে পারব না। হিমানীকে পাওয়ার সুখ আমি সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করতে কিছুতেই পারছি না, যতক্ষণ না তাকে পাবার দুঃখটাও ভোগ করছি। এতে তোমরা ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না। হ'লে আমরা দুজনেই মর্মান্তিক দুঃখ পাব।

সেদিন এ সম্বন্ধে আর আমাদের কোন কথা হ'ল না। ব ফেরবার সময় সমস্ত পথটা মতিলালকে গালাগালি দিতে দিতে ফেরা গেল।

তখন মাসের শেষ, বাড়িভাড়া দেবার সময়। আমি আর নির্মল স্থির করলুম যে, চুপিচুপি তাদের ওখানে গিয়ে বাড়িওয়ালাকে ঘর-ভাড়াটা দিয়ে হিমানীর সঙ্গে দেখা না ক'রেই পালিয়ে আসব।

করা হ'ল যে, দুপুরবেলায় গিয়ে কাজটি সেরে আসতে হবে, কারণ সে সময় মতিলাল বাড়িতে থাকে না।

দুই বন্ধু দুপুরবেলা মতিলালের বাড়িতে গিয়ে সোজা একেবারে বাড়িওয়ালার ঘরে গিয়ে ওঠা গেল। বাড়িওয়ালা আমাদের প্রস্তাব শুনে হেসে বললে, তাঁরা তো কাল বাড়িভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চ'লে গেছেন।

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় গেল তারা? কেন গেল তারা?

বাড়িওয়ালা তার আন্দাজমত দু-একটা জায়গার নাম করলে। তখুনি দুজনে ছুটলুম সেখানে। বস্তির পর বস্তি পাতিপাতি ক'রে খুঁজে বেড়ালুম, কিন্তু মতিলাল ও হিমানীর কোন সন্ধানই পেলুম না।

মতিলাল কেন আমাদের ছেড়ে গেল? না হয় সে আমাদের সাহায্য না-ই নিত। এই নির্বান্ধব শহরে আমাদের চেয়ে বন্ধু সে কোথায় পাবে?

পরদিন থেকে আমি আর নির্মল মাঠে যাওয়া বন্ধ রেখে কলকাতা শহরে বস্তিতে বস্তিতে সেই পলাতক বন্ধু আর বান্ধবীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। এক মাস অবিশ্রান্ত চেষ্টা ক'রেও তাদের কোন সন্ধান না পেয়ে হতাশ হয়ে আবার একদিন সন্ধ্যেবেলায় মাঠে ফিরে এলুম।

মাঠের সেদিনকার অবস্থা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। সেখানে গিয়েই বুঝতে পারলুম, একটা বিষাদের ছায়া সেখানকার অনাবিল আনন্দকে ম্লান ক'রে ফেলেছে। ফুটবল খেলা বন্ধ, গানও বন্ধ, বন্ধুরা এক কোণে ম্লান মুখে ব'সে রয়েছে। মাঠের ঠিক মাঝখানেই দেখি, একটা

বড়গোছের হোগলার ঘর উঠেছে। এখানে সেখানে চারিদিকে লম্বা লম্বা গর্ত।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, যারা জমিটা কিনেছে, তারা বাড়ি তুলছে। মাস দুয়েকের মধ্যেই সেখানে বাড়ি তৈরি হবে।

চোখের সামনে প্রতিদিন একখানার পর একখানা ইট গেঁথে মিস্ত্রীরা সেখানে দালান তুলতে লাগল। বন্ধু-বান্ধবেরা একে একে আসা বন্ধ করতে লাগল, দেখতে দেখতে আমাদের কৈশোরের স্মৃতির পথে বিরাট প্রাসাদ তৈরি হয়ে গেল।

মাঠের আড্ডা উঠে যাওয়ার পর কিছুদিন আমরা এখানে সেখানে জমায়েৎ হতে লাগলুম, কিন্তু আড্ডা আর তেমন জমল না। বছর-খানেকের মধ্যেই আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লুম। তারপরে জীবনে কত বার চাঁদ উঠল, কত চাঁদমুখ দেখলুম, তার ঠিকানা নেই। অভিজ্ঞ সংসার দেখিয়ে দিলে, চাঁদে রয়েছে কলঙ্ক, আর চাঁদমুখ—যাক, সে কথা আর তুলে কাজ নেই।

মাঠের আড্ডা উঠে যাওয়ার বোধ হয় পনরো-বিশ বছর পরে নানা ঘাটের জল খেয়ে তখন এক মাসিক-পত্রের সম্পাদকীয় বৈঠকে বেশ কায়েমী হয়ে বসা গিয়েছে, এই সময় একদিন সন্ধ্যেবেলা সম্পাদক-মশায় একটি নতুন লোককে আড্ডায় নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তোমরা কবি *শশিশেখরের এত প্রশংসা কর, ইনিই সেই কবি* শশিশেখর।

ভদ্রলোক সভাস্থ সবাইকে নমস্কার ক'রে অতি সঙ্কুচিতভাবে ফরাশের একটি কোণে গিয়ে ব'সে পড়লেন। কবির চেহারাটি, যেমন সচরাচর হয়ে থাকে, অর্থাৎ মোটেই কবিজনোচিত নয়। মাথার চুল কদমছাঁটা, পরনে একখানা ময়লা ধুতি, অঙ্গে একটা আধ-ময়লা জামা,

সেটা না পাঞ্জাবি, না শার্ট, না কোট। পায়ের জুতোজোড়া ছেঁড়া, শততালি হ'লেও জুতোর মালিক যে শৌখিন তা জুতোর আকৃতি দেখলেই বুঝতে পারা যায়। মাথার চুল কতকগুলো পেকে গিয়েছে। বেশ বুঝতে পারা যায় যে, দুর্দশায় পেকে গিয়েছে। মুখের চেহারাও তার অঙ্গের জামা-কাপড়ের সামিল। দাড়ি-গোঁফ বোধ হয় মাসখানেক আগে কামানো হয়েছিল।

লোকটা খাটে ব'সে আসরের চারদিকে চেয়ে আমার দিকে একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার চোখের ওপর চোখ পড়তেই আমার মনে হ'ল, যেন মুখখানা কোথায় দেখেছি। যতই তার মুখের দিকে চাই, ততই মনে হয়, যেন এ মুখ পরিচিত। গৃহপ্রত্যাগত প্রবাসী ঘরে ফিরে তার বাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যেমন ক'রে তার হারানো রতন খুঁজে বেড়ায়, আমিও তেমনই স্মৃতির ধ্বংসস্তূপে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধুদের মুখগুলো খুঁজতে লাগলুম, কে—কে এই কবি শশিশেখর?

আড্ডা ভাঙবার কিছু আগে নবাগত কবি সকলকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলে। তারপরে গুটিগুটি আমার কাছে এসে বললে, আমায় চিনতে পারলে না তো?

চীৎকার ক'রে উঠলুম, মতিলাল!

মতিলাল বললে, হঁ্যা, চিনেছ।

মতিলালকে ধ'রে বসালুম। কিন্তু সেদিন তার বড্ড তাড়া ছিল ব'লে আর বসতে পারলে না। পরের দিন আসবে ব'লে সে চ'লে গেল।

পরের দিন তার অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে ব'সে রইলুম, কিন্তু সে এল না। তার পরের দিন আড্ডা ভাঙবার কিছু আগে মতিলাল এসে হাজির।

মতিলালকে কাছে বসালুম। সে ছদ্মনামে কবিতা লেখে। সকালে দৈনিক একখানা বাংলা কাগজে চাকরি করে। মাইনে পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু তিন মাস অন্তর এক মাসের মাইনে পায়। সন্ধ্যেবেলায় দু জায়গায় ছেলে পড়ায়, সেখান থেকে ত্রিশ টাকা পায়।

আড্ডা ভেঙে যাবার পর রাস্তায় এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, কোন্ দিকে যাবে?

মতিলাল উত্তর দিকের একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে, এই দিকে।

বললুম, চল, আমিও ওই দিকে যাব।

দুজনে পাশাপাশি অনেকক্ষণ ধ'রে নীরবে চলবার পর অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম, বউদি কোথায়?

মতিলাল একটু হেসে বললে, তাকে মনে পড়ে?

আর সামলাতে পারলুম না। ব'লে ফেললুম, রাস্কেল, ছোটলোক, বর্বর, অকৃতজ্ঞ! মনে পড়ে! আমাদের বন্ধুত্বের যা প্রতিদান তুমি দিয়েছ, তাতে তোমাদের কথা আর মনে না রাখাই উচিত।

রাগের ঝোঁকে তাকে আরও অনেক কথা ব'লে ফেললুম, কিন্তু সে একটি কথারও উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে সমস্ত শুনে গেল। আমার বক্তব্য শেষ হয়ে যাওয়ার পর ধরা গলায় মতিলাল জিজ্ঞাসা করলে, নির্মল কোথায়? কেমন আছে সে?

নির্মল! নির্মল চ'লে গিয়েছে, সে আজ পাঁচ-ছ বছরের কথা।

মতিলাল আর কোন প্রশ্ন করলে না। কিছুক্ষণ পরে আবার আমি জিজ্ঞাসা করলুম, বউদি কোথায়?

মতিলাল বললে, এখানেই আছে, দেখবে তাকে?

নিশ্চয়, কোথায়—কত দূরে তোমার বাড়ি?

মতিলাল বললে, বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে, সেই বাগবাজারের

গঙ্গার ধারে। আজ রাত্রি হয়ে গিয়েছে, কাল সন্ধ্যেবেলায় এসে তোমায় নিয়ে যাব।

সেদিনকার মতন বিদায় নেওয়া গেল। পরদিন সন্ধ্যের সময় মতিলাল এসে বললে, চল।

শহরের এক কোণে, বাগবাজারের গঙ্গার ধারে একখানা একতলা বাড়ি। পথটা অত্যন্ত সরু। দূরে দূরে গ্যাস জলছে। হেমন্তের শীতল আবহাওয়ায় উনুনের ধোঁয়াগুলো আটকা প'ড়ে পথের মধ্যে ভিড় ক'রে আছে। বিশ বছর আগে এমনই আর এক সন্ধ্যায় বেলেঘাটার সেই খোলার ঘরে হিমানীর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল।

ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র কিছুই নেই বললেই হয়। এক কোণে একটি ছোট বিছানা পাতা। সেখানে গলা অবধি চাদর ঢাকা দিয়ে কে শুয়ে রয়েছে। ঘরে ঢুকে মতিলাল বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, ওগো, চেয়ে দেখ কে এসেছে।

বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি, সেখানে হিমানী শুয়ে রয়েছে। তপ্তকাঞ্চনের মত রঙ তার একেবারে কালিবর্ণ, পরিপূর্ণ নিটোল অঙ্গ একেবারে কঙ্কালে পরিণত।

তার সেই মূর্তি দেখে আমি একেবারে শিউরে উঠলুম। একবার সন্দেহও হ'ল, নিশ্চয় এ অন্য আর কেউ।

হিমানী চোখ দুটো তুলে আমার দিকে চাইলে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, ঠাকুরপো! তোমাকে যে আর চেনা যায় না।

সেদিন অনেক রাত্রে মতিলালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরলুম। হিমানীর যক্ষ্মা হয়েছে। সে আর বাঁচবে না। মতিলাল বললে যে, তারও মুখ দিয়ে বার কয়েক রক্ত উঠেছিল; হিমানী যে তার আগেই যাচ্ছে, এইটেই তার মস্ত সান্ত্বনা।

পরদিন থেকে নিয়ম ক'রে তাদের ওখানে যেতে লাগলুম। সকাল-বেলা আমি যাবার পর মতিলাল বেরোয় খবরের কাগজে চাকরি করতে। বেলা বারোটার সময় সে কাজ সেরে ফিরলে পর আমি বাড়িতে ফিরি। বিকেলে আমি গেলে সে ছেলে পড়াতে যায়, সন্ধ্যের পর ফেরে। রাত্রি দশটা এগারোটা অবধি সেখানে থেকে আমি বাড়ি ফিরি।

হিমানীকে চিকিৎসা করছিল এক কবিরাজ। ডাক্তার দেখাতে বিস্তর পয়সা খরচ। খবরের কাগজের আপিস থেকে মাসে মাসে মাইনে পাওয়া যায় না। ছেলে পড়িয়ে যা ত্রিশ টাকা পাওয়া যায়, তাই তখন তাদের সম্বল। এই দুঃসময়ে মতিলাল আমার কাছে সাহায্য চাইলে, কিন্তু আমারও তখন দেবার কিছুই নেই। একদিন মতিলালকে আমরা সাহায্য করতে চেয়েছিলুম, সে তা নেয় নি। আজ সে সাহায্য চায়, কিন্তু তাকে দেবার কিছুই নেই। নির্মল ইহলোকে নেই, আমি আছি, কিন্তু সোনার বোতাম ও আংটি আর নেই।

মাসখানেক এই ভাবে কেটে গেল। হিমানী বেশ জানত, সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে। একদিন সন্ধ্যেবেলায় মতিলাল তখনও বাড়ি ফেরে নি। সমস্ত দিন টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ায় শীতটা বেশ জোরে পড়েছে। হিমানী ইদানীং আর নিজে নড়তে-চড়তে পারত না, তাকে পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়। একখানি শততালি দেওয়া লেপ তার অঙ্গে ঢাকা দিয়ে ধারগুলো মুড়ে দিচ্ছিলুম, এমন সময় ধীরে ধীরে সে বললে, ঠাকুরপো, তোমার হাতে এই সেবাটুকু পাব ব'লেই বোধ হয় এতদিন বেঁচে ছিলুম। আমার ওপরে আর রাগ নেই তো ভাই?

আমি বললুম, রাগ তোমার ওপরে কোনও দিনই ছিল না বউদি।

আর কোন কথা বলতে পারলুম না। হিমানী আরও কিছু শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বললুম, তোমার চিকিৎসা না হ'লেও, তবু তো তুমি আমাদের সেবা পেলে, একবার আমাদের কথা ভেবে দেখ।

হিমানী বললে, মরতে আমার বড্ড ভয় করছে ভাই। তোমরা যদি আগে যেতে, তা হ'লে আমার কোন ভয় ছিল না। আমায় সেখানে একলা থাকতে হবে। মা গিয়েছেন বটে, কিন্তু বাবা যখন ক্ষমা করেন নি, তখন মা কি ক্ষমা করবেন ?

কিছুক্ষণ পরে সে উৎসাহভরে ব'লে উঠল, কিন্তু খুশি-ঠাকুরপো আছে না সেখানে ? ও, তবে কোন ভাবনা নেই। সে ভারি অভিমানী, তা হোক, কই, তুমি তো অভিমান ক'রে থাকতে পার নি !

পৌষের মাঝামাঝি একদিন সকালবেলা হিমানী বললে, ঠাকুরপো, আজ ভাই বিদায়ের দিন। আজ আর আমার জ্বালা-যন্ত্রণা কিছু নেই। মনে হচ্ছে, আজই দিনশেষের সঙ্গে সঙ্গে—

হিমানী হাসিমুখে কথাটা আরম্ভ করেছিল, কিন্তু শেষ করবার আগেই তার দুই চোখ দিয়ে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তার হাত দুখানা আমার হাতের মধ্যে নিয়ে দেখলুম, বরফের মতন ঠাণ্ডা। নাড়ী—একেবারে শেষ অবস্থা।

তার জন্যে কয়েকদিন থেকে ঝি রাখা হয়েছিল। তার তদ্বিরে হিমানীকে রেখে আমি ছুটলুম মতিলালের সেই খবরের কাগজের আপিসে।

সেখানে গিয়ে দেখি, মতিলাল একটা চেয়ারে উবু হয়ে ব'সে বনবন ক'রে লিখে চলেছে। দু পাশে দুজন কম্পোজিটার দাঁড়িয়ে আছে। একখানা কাগজ শেষ হতেই একজন সেটা তার হাত থেকে এক রকম

টেনে নিয়ে চ'লে গেল। সেই ফুরসতে একবার মুখ তুলে আমাকে দেখে সে বললে, কি খবর?

বললুম, বউদির অবস্থা খুব খারাপ ব'লে মনে হচ্ছে। শিগগির চল, তোমাকে ডাকতে এসেছি।

মতিলাল ততক্ষণে আর একখানা কাগজ টেনে লিখতে শুরু ক'রে দিলে। তার কাণ্ড দেখে বললুম, কি, কথার জবাব দিচ্ছ না যে বড়?

মতিলাল হেসে লিখতে লিখতেই বলতে লাগল, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর মস্ত একটা ভুল ধ'রে ফেলা গেছে তারই একটা জবাব, আর জেনারেল ফ্রেঙ্কের সমরনৈতিক চালের আর একটা মারাত্মক রকমের ত্রুটি তার ওপরে খানিকটা মন্তব্য লিখতেই হবে, মনিবের হুকুম। আজকে কিছু পাবার আশা আছে, লেখাগুলো যদি শেষ না ক'রে যাই, তা হ'লে সে গুড়েও বালি পড়বে। তুমি বরং হিমানীর কাছে গিয়ে ব'স, আমি আসছি।

তখুনি আবার ছুটলুম হিমানীর কাছে। আমায় দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় গিয়েছিলে?

বললুম, এইখানেই গিয়েছিলুম একটু।

এদিকে বারোটা বেজে গেল, তবুও মতিলালের দেখা নেই। আমি ব্যস্ত হচ্ছি দেখে হিমানী বললে, সে ঠিক আসবে, আমার একটু কাজে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ কাটবার পর হিমানী হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, ঠাকুরপো, তুমি বাড়ি থেকে চট ক'রে ঘুরে এস। যাও, আজকে আর আমার অবাধ্য হ'য়ো না।

সেখান থেকে বেরিয়ে মতিলালের আপিসের দিকে ছুটলুম। সেখানে

গিয়ে দেখি, মতিলাল নেই। ঘণ্টাখানেক আগে সেখান থেকে বেরিয়ে গেছে।

নিজের বাসাতে এসে খেয়ে-দেয়ে যখন তাদের সেখানে গিয়ে পৌঁছলুম, তখন তিনটে বেজে গিয়েছে। গিয়ে দেখি, হিমানীকে একখানা লাল চওড়া পাড়ের শাড়ি পরানো হয়েছে, তার মাথায় একরাশ সিঁদুর, পায়ে আলতা, পা থেকে গলা অবধি ফুলে ঢাকা।

খাটের কাছে গিয়ে দেখি, হিমানীর একখানা হাত মতিলালের হাতে, দুটি চোখ স্থিরভাবে মতিলালের দিকে চেয়ে আছে, আর তার দুই গাল বেয়ে অবিরল অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

আমাকে দেখে মতিলাল বললে, এই বোধ হয় মিনিট পাঁচেক হ'ল, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে।

সেদিন দিনের আলো নিবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হিমানীর অঙ্গ হিম হয়ে গেল।

হিমানী মারা যাবার পরের দিন থেকে মতিলাল খবরের কাগজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সারাদিন ব'সে ব'সে কবিতা লিখতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মাস কয়েকের মধ্যে সে মোটা মোটা খানকয়েক খাতা কবিতায় ভরিয়ে ফেললে। আমি সেগুলোকে মাসিক-পত্রে ছাপাতে চাইলে সে বলত, না না, থাক্‌, ওগুলো অন্য দরকারে লাগবে।

শ্রাবণ মাস নাগাদ, অর্থাৎ হিমানী মারা যাবার মাস ছয়েক পরে একদিন রক্তবমি ক'রে মতিলাল বিছানায় এলিয়ে পড়ল। তার অবস্থা দেখে তক্ষুনি ডাক্তার ডাকা হ'ল। ডাক্তার দিন কয়েক দেখে বললেন, ওষুধে কিছু হবে না, বিদেশে নিয়ে গিয়ে দেখতে পারেন।

আমাদের একটি বন্ধুর সাঁওতাল পরগণার এক স্বাস্থ্যকর জায়গায় ছোট্ট একখানা বাড়ি ছিল। তাকে ব'লে-ক'য়ে মতিলালের জন্যে

বাড়িখানা যোগাড় করা গেল। কিন্তু শুধু বাড়ি হ'লেই তো চলবে না, অর্থও কিছু চাই।

মতিলাল বললে, আমার ওই কবিতাগুলো যদি বিক্রি করতে পার, তা হ'লে কিছু আসতে পারে।

কবিতার খাতা কখানা বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। কিন্তু কবিতার বই বিক্রি করতে এসেছি শুনে বইওয়ালারা তো হেসেই আকুল। সাত দিন প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে একজন বইগুলো নিয়ে দয়া ক'রে একশোটি টাকা দিলে। এ ব্যক্তি বইয়ের কারবার করার আগে সাহিত্য-চর্চা করত।

মতিলালকে গিয়ে যখন সংবাদটা দিলুম, তখন সে বললে, কেমন, বলেছিলুম কিনা, ওগুলো সময়ে ভারি কাজ দেবে।

বললুম, আরও শতখানেক চাই যে—

মতিলাল বললে, ওইতেই হবে, আর লাগবে না।

মতিলালকে নিয়ে যাওয়া গেল। সে স্থানটি জনবিরল। পুজো ও শীতের সময় দু-চারজন লোক আসে, অন্য সব সময়ে প্রায় সমস্ত বাড়িতেই তালা লাগানো থাকে। সে সময়টা সেখানে বর্ষা নেমেছিল। বিকেলে রোজ এক পসলা বৃষ্টি হয়ে চমৎকার আলো হ'ত। মতিলাল সেখানে দিন পাঁচেক বেশ রইল। ছ দিনের দিন থেকে তার রক্তবমি শুরু হ'ল। দিন দুয়েক অনবরত বমি ক'রে একেবারে অবশ হয়ে পড়ল।

তারপরে দিন দুয়েক প্রায় নির্বাক অবস্থায় কাটিয়ে একদিন সকালে সে কথা বলতে আরম্ভ করলে। ইদানীং সে বেশি কথা বলত না, কিন্তু সেদিন তার কথার পরিমাণ অস্বাভাবিক হয়ে উঠল। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলুম, কারণ হিমানী যেদিন মারা যায়, সেদিন সেও ওই রকম কথা বলতে আরম্ভ করেছিল।

বিকেলের দিকে সেদিন আর বৃষ্টি নামল না। মতিলাল বললে, আমায় বারান্দায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে পার ?

বাড়িতে একটা মালী ছিল। তাকে ডেকে খাটসমেত মতিলালকে বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হ'ল।

বাড়ির কিছু দূরেই ছিল এক শালবন। তারই মাথায় একখণ্ড কালো মেঘ এসে দাঁড়াল, আর তারই মধ্যে বিজলীর ছিনিমিনি খেলা চলতে লাগল। মতিলাল আমার সঙ্গে কোন কথা না ব'লে একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইল।

সন্ধ্যের একটু পরেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হ'ল। মতিলালকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে দরজা-জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দিলুম। দেখতে দেখতে প্রলয়ের নাচন শুরু হয়ে গেল। বাইরে আকাশ তার সম্পত্তি নিঃশেষ ক'রে দিতে চায়, আর ঘরের মধ্যে মতিলালের মহাপ্রাণ সেই জীর্ণ পঞ্জর ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। ঘর ও বাইরে সেই মহাপ্রলয়ের মধ্যে আমি একা হাঁপিয়ে উঠতে লাগলুম।

রাত্রি তখন প্রায় চারটে। বাইরে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, এমন সময় মতিলাল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, বেশ কাটানো গেল পৃথিবীতে, কি বল ভাই ?

এবার অশ্রুসংবরণ করা দুরূহ হ'ল। বললুম, তোমার মতন দুঃখ—

মতিলাল আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বললে, না না, দুঃখ আমি কিছুই পাই নি রে, আমাকে দুঃখ দেবার চেষ্টা সংসার করেছে বটে, কিন্তু তাতে আমার সুখের মাত্রা বেড়েই উঠেছে।

মতিলালের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে এল। আমি ঝুঁকে প'ড়ে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই একটুখানি হাসিতে তার মুমূর্ষু মুখখানা উজ্জ্বল

হয়ে উঠল। সেই হাসি আর একবার তার মুখে দেখেছিলুম, যেদিন তার বাবা তাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করবার ভয় দেখিয়ে হিমানীকে ছেড়ে বাড়িতে ফিরে আসবার কথা বলেছিলেন।

তখন বুঝতে পারি নি যে, সেই হাসিটুকুর অবকাশে তার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে। চীৎকার ক'রে ডাকলুম, মতিলাল!

বাইরে একটা ভোরের পাখি জবাব দিলে, পি-উ-উ।

তাড়াতাড়ি জানলাটা খুলে দিয়ে দেখি, মতিলালের মুমূর্ষু মুখের শেষ হাসিটুকুর মতন একটুখানি আলোর রেখা পূব-গগনে ফুটে উঠেছে।

শেষ